সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক

(তৃতীয় খণ্ড)

[হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)

এবং

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ)

এর

সাধনা ও কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস]

তরজমায়

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনর শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক
মূল : সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী
তরজমা : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ই. ফা. প্রকাশনা : ৯৬৩
ই. ফা. গ্রন্থাগার : ৯২২.৯৭

প্রকাশক
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

প্রকাশকাল
অগ্রহায়ণ ১৩৮৯
সফর ১৪০৩
ডিসেম্বর ১৯৮২

প্রচ্ছদ শিল্পী
এম. এ. কাইয়ুম

মুদ্রণে
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১

বাঁধাইয়ে
আবুল হোসেন এণ্ড সন্স
১, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন,
ইসলামপুর, ঢাকা-১

মূল্য : চব্বিশ টাকা মাত্র

ISLAMI RENESAR AGROPATHIK: The Fore-runners of Islamic Renaissance, written by Syed Abul Hasan Ali Nadvi in Urdu & translated by A. S. M. Omar Ali into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijra. December 1982

Price : Taka 24·00 ; US. Dollar : 2·50

উৎসর্গ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি,

এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে যাঁরা হাসিমুখে মুকাবিলা করেছেন, অত্যাচারী জালিমের খড়্গ-কৃপাণ ও বদ্ধ কারা-প্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবনযাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে এবং অনাড়ম্বর পরিবেশে থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্‌র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির সমুন্নত রেখেছেন, দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভরসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,
আপন করেছেন,

রূহানীয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোক-ধারায় যাঁরা পাপ-ক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে।

আমাদের কথা

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম ইতিহাসের আদর্শবাদী ধারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগে এমন কিছু কিছু বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা পুনরায় ফিরে যেতে চেয়েছেন ইসলামের মূল আদর্শের দিকে এবং আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন ইসলামী আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তাঁরা কেউ কেউ যেমন, 'উমর বিন 'আবদুল 'আযীয, গাযী সালাহুদ্দীন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সাধনা ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, কেউ কেউ এই সাধনার কারণে তৎকালীন রাষ্ট্র-শক্তির কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েছেন, আবার অনেকেই রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে দূরে অবস্থান করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার কঠোর সাধনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস যতটা মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের ইতিহাস, তার চাইতেও অধিক এই সব সাধক ও সংগ্রামী পুরুষদের ইতিহাস। আজকের বিশ্বব্যাপী ইসলামী নবজাগরণের পেছনে এইসব অমর সাধকদের শত সহস্র বছরের নিঃস্বার্থ সাধনার অবদানকে অস্বীকার করা আর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা একই কথা।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামের ইতিহাসের এই স্বর্ণোজ্জ্বল ধারা আজও আমাদের কাছে প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। ইসলামী আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী এই বিপ্লবী তাৎপর্যমণ্ডিত প্রবাহের চাপা পড়া ইতিহাস পুনরুদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োগ করে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী মুসলিম উম্মাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর এ সম্পর্কিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত' পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এবং হযরত 'উমর বিন 'আবদুল 'আযীয (রঃ) থেকে শুরু করে বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী (রঃ) পর্যন্ত সাধক-সংগ্রামীদের আলেখ্য এতে স্থান লাভ করেছে। এই গ্রন্থমালা বাংলায় ভাষান্তরিত করার কর্মসূচী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইতোপূর্বেই গ্রহণ করেছে। বর্তমান গ্রন্থ উক্ত 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ। এতে হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া থেকে শুরু করে হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ)-এর কাল পর্যন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এর অন্যান্য খণ্ডও অদূর ভবিষ্যতে অনূদিত হয়ে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হবে।

এই অমূল্য গ্রন্থের প্রকাশনার সুযোগ পেয়ে আমরা রাহমানুর রহীমের দরগাহে আমাদের সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করি এবং এই মূল্যবান গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদককে জানাই আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ — আবদুল গফুর

১৪-১২-৮২ — প্রকাশনা পরিচালক

অনুবাদকের আরয

আল্লাহ্ পাকের অপার অনুগ্রহে অবশেষে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত 'আলিম, লেখক ও চিন্তাবিদ সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী রচিত 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত' সিরিজের তৃতীয় খণ্ডের বাংলা তরজমা 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে প্রকাশিত হ'ল। যাঁর অসীম কৃপায় এটি বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে পেঁছিতে পারল সেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে জানাই অসংখ্য শোকর ও সজূদ।

উর্দূ-ভাষী পাঠকের নিকট 'তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত'-এর নতুন করে পরিচয়ের অবকাশ নেই। সর্বপ্রথম ভারতে প্রকাশিত হলেও ইতিমধ্যেই তা আরবী ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। কুয়েত ও বৈরুত থেকে আরবী ভাষায় গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় Saviours of Islamic Spirit নামে দুটি সংস্করণ, উর্দূ ভাষায় লাখনৌ থেকে দুটি সংস্করণ এবং করাচী থেকে উর্দুতে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৯ সালে সর্বপ্রথম এ সিরিজের ৩য় খণ্ডটি আমার হাতে আসে। বইটি আমাকে আকৃষ্ট করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমি তরজমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি; কিন্তু তখন অন্য একটি বই আমার হাতে থাকায় এটির তরজমায় স্বভাবতই একটু বিলম্ব হয়। তারপর ১৯৮০ সালের শেষ দিকে তরজমার কাজে হাত দিই এবং ১৯৮১ সালের মে মাসে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। তরজমার সঙ্গে এর পূর্বকার দু'টি খণ্ড সংগ্রহের সযত্ন চেষ্টা চালিয়ে যাই। অতঃপর মেজর জেনারেল আকবর খান রচিত ইসলামের প্রতিরক্ষা কৌশলের উপর প্রণীত বিখ্যাত 'হাদীছে দেফা' গ্রন্থটির তরজমায় হাত দিই এবং আল্লাহ্‌র ফযলে যথাসময়ে তা সম্পন্ন করতেও সমর্থ হই। অবশেষে বহু চেষ্টা তদবীরের পর Karim International-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর নাজমুল করিম সাহেবের আন্তরিকতায় উক্ত খণ্ড দু'টি সংগ্রহে সমর্থ হয়েছি। এজন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। আল্লাহ্‌র রহমত এবং পাঠকের দু'আ' পেলে সত্বর সে দু'টির তরজমাও পেশ করতে সক্ষম হব।

বর্তমান পুস্তকের তরজমা সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। ইসলামী বিশ্ব-কোষ প্রকল্পের দায়িত্ব বহন করতে নিরন্তর যে পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছে তজ্জন্য নিজের কাজের প্রতি যতটুকু সুবিচার করা দরকার ছিল তা পারিনি। তবুও এতে প্রশংসার যদি কিছু থাকে তবে তা বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক বন্ধুবর আবদুল মতীন জালালাবাদীর প্রাপ্য। কেননা এর সম্পাদক হিসাবে একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে চেষ্টার কোন কসূর তিনি করেন নি। আর দোষক্রটি কোথাও কিছু ঘটলে তার সকল দায়-দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছি। এরপর আগামী সংস্করণ ছাড়া কাফফারা আদায়ের কোন সুযোগ দেখছি না।

আমার সকল বক্তব্য প্রথম খণ্ডের জন্য তুলে রেখে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকল হা'ম্‌দ আল্লাহ্‌র।

—আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং সালাম ও শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর।

আলহামদুলিল্লাহ্। 'তারীখ-ই দা'ওয়াত ও 'আযীমত'-এর তৃতীয় খণ্ড পেশ করার সৌভাগ্য হ'ল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মাঝখানে এত দীর্ঘ বিরতি ঘটে যে, গ্রন্থকার বিমর্ষ এবং আগ্রহী পাঠক নিরাশ হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে গ্রন্থকারের ছোট কলম কিছু গ্রন্থ-রচনা করেছে এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। যতই বিলম্ব ঘটছিল ততই এ সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিল যে, আল্লাহ্ না করুন, এই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর সিলসিলা প্রাচীন গ্রন্থকারদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের এমন কি খোদ এই গ্রন্থকারের কতকগুলো ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রণয়ন প্রকল্পের মতো অসম্পূর্ণ না থেকে যায়। সম্ভবত এমনটিই হ'ত,—কমপক্ষে এ বিরতি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'ত—যদি এর ভেতর একটি লক্ষণীয় অভিব্যক্তি এবং অবশ্য পালনীয় ইশারা-ইঙ্গিত ও প্রচণ্ড দাবির অস্তিত্ব না থাকতো।

আমার আধ্যাত্মিক গুরু হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির সাহেব রায়পুরী (তাঁর বরকত চিরন্তন হোক) "তারীখ-ই-দা'ওয়াত ও 'আযীমত' বারবার শুনে এবং বারবার তাঁর মজলিসে-মহফিলে পড়িয়ে—গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সম্মান ও সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন! এই দু'খণ্ডের পর তিনি তৃতীয় খণ্ডের জন্য তাগাদা দিতে থাকেন এবং এই খাদেম (গ্রন্থকার)-কে তা সম্পূর্ণ করার জন্য বারবার নির্দেশ প্রদান করেন। অনেক বার এমনও হয়েছে যে, আমি বাইরে থেকে যখনই তার খেদমতে গিয়ে হাযির হয়েছি তখনই তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল, তৃতীয় খণ্ড কি সমাপ্ত করেছ? কয়েকবার আমি আমার সংকট ও বিড়ম্বনার কথা তাঁকে জানাই; তিনি তা শুনেই বলে ওঠেন, অন্তত তৃতীয় খণ্ডটি শেষ করে ফেল। অতঃপর তিনি যখন জানতে পারলেন যে এই অংশটিতে সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহী (কাঃ)-এর আলোচনা থাকবে, তখন তিনি তাঁর রূহানী ও বিশেষ সম্পর্কের কারণে তাগাদার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। এদিকে এই অধমের অবস্থা এই হয়েছিল, যেন সে কলম রেখে দিয়েছিল এবং এ প্রসঙ্গে ইতি টানার উপক্রম হয়েছিল। জুন, ১৯৬১ সালে আমি একবার হযরত রায়পুরী

সাহেবের খেদমতে হাযির হলে দেখতে পাই, হযরত খাজা (রঃ)-এর মলফু-জাতের সেই সংকলন পঠিত হচ্ছে—যা আমীর খসরু (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত ও 'আফজালুল ফাওয়ায়িদ' নামে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং যা আমার এক প্রিয় দোস্ত তোহ্‌ফাস্বরূপ নিয়ে এসেছেন। এ সংকলনটি এমনই সনদবিহীন ও ভিত্তিহীন বর্ণনায় ভরপুর যে, তা শ্রবণ করাটাও কোন বিশ্লেষণী শক্তি ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ব্যক্তি, এমন কি, সাধারণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষেও বোঝাস্বরূপ মনে হবে। এর সংগ্রাহক হিসাবে আমীর খসরু (রঃ)-কে সম্পর্কিতকরণ আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূদরায (রঃ)—যাঁর ও সুলতানুল মাশায়িখের ভেতর কেবল একটিই মাধ্যম এবং তাও হযরত চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর, যিনি উক্ত আধ্যাত্মিক সিলসিলার নয়নমণি এবং গুপ্ত রহস্যের অধিকারী,—সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে 'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' ছাড়া মলফুজাতের যতগুলি সংকলন 'মশহূর হয়ে আছে—তার সব-গুলোই বাহুল্য দোষে দুষ্ট এবং অবিশ্বাস্য। যা হোক, মজলিসে উক্ত কিতাব পঠিত হচ্ছিল। হযরত রায়পুরী কখনো কখনো এর কোন কোন অধ্যায়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তাঁর অর্ধনিমিলিত ও অর্ধ উন্মীলিত অথচ চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি—যা কখনো কখনো এই গ্রন্থকারের উপর পড়ছিল এবং ইশারা-ইঙ্গিতে বলছিল যে, যদি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কোন কিতাব খুঁজে পাওয়া যেত তাহলে এ ধরনের অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বাস্য কিতাব হাতে নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। তাঁর ঐ দৃষ্টি আমার অন্তরে গিয়ে তীরের মতো বিদ্ধ হ'ল এবং আমি সেখানেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, প্রথম অবকাশেই আমি অবশ্যই এ দায়িত্ব সম্পাদন করব এবং এ সওগাত আমাকে অবশ্যই পেশ করতে হবে।

এ কাজ মাঝপথে আটকে পড়ার অন্যতম কারণ ছিল পথের বন্ধুরতা। ভারতীয় উপমহাদেশের আওলিয়ায়ে কিরাম, ইসলামের মুবাল্লিগবৃন্দ এবং মহান বুযুর্গগণের জীবনী সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর ভেতর বিরাট আকারের গ্রন্থও রয়েছে। কিন্তু যখন এ যুগের কোন গ্রন্থকার তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী একত্রিত করার মানসে কাজে নামেন এবং তাঁদের প্রকৃত কামালিয়াত, তাঁদের দীনি ও তবলীগী চেষ্টা-সাধনা, তাঁদের তা'লীম ও তরবিয়তের ফলাফল এবং তাঁদের মেযাজ ও প্রকৃতির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেন এবং এ যুগের লোকদের জন্য ঐ সব জীবন-বৃত্তান্ত শিক্ষণীয়, উৎসাহ-উদ্দীপক ও সাহসিকতা-মণ্ডিত করে তোলার প্রয়াস পান, অধিকন্তু সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষী ও পরিপূর্ণ মানব তথা ইনসানে কামিল হিসাবে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী ও অন্যান্য

অবস্থাদি প্রকাশ্য দিবালোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে প্রয়াস পান, প্রয়াস পান তাঁদের জীবনের সত্যিকার বিশুদ্ধ কাঠামো উপস্থাপিত করতে—তখন বিদগ্ধ রচনাকারীকে দারুণভাবে নিরাশ হতে হয়—হতে হয় বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন। কোন কোন সময় শত শত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ থেকে এমন কি কতিপয় গ্রন্থ থেকেও একটি পৃষ্ঠা লিখবার মতো উপকরণ সংগ্রহ করা যায় না। এভাবে মহান ও শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের জীবন-কাহিনীতে এমন বিরাট বিরাট শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হয় যে, কোনরূপ কল্পনা, অনুমান ও ভাষার অলংকার-চাতুর্য দিয়েও তা পূরণ করা যায় না। গোটা পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কাল্পনিক গল্প, অলৌকিক কাহিনী ও বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটাবার মতো ঘটনাবলী এবং কল্পকাহিনীতে ভরপুর থাকে আর তাতে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের দুঃখজনক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, যিনি স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ ও গ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্যকতা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের এত ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন যার দ্বিতীয় কোন নজীর বর্তমান যুগে মেলা দুরূহ—এই বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত লোকদের জীবনী আটটি বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত করেছেন,[১] তাঁকে নিম্নোক্ত উপায়ে অভিযোগ পেশ করতে দেখা গেছে:

"দেশের জন্য কি পরিহাস দেখুন, প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের শত শত ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন শিরোনামে লেখা হয়েছে, কিন্তু এগুলোর ভেতর কোন গ্রন্থই ঐতিহাসিকের বিশুদ্ধ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় না। যে কোন কিতাব হাতে নিন, মনে হবে—যদিও যুদ্ধের ময়দান ও বিলাস মাহফিলের গল্প-কাহিনী, বিউগল ও কাড়া-নাকাড়ার বর্ণনা থেকে এর কোন কোন পৃষ্ঠা মুক্ত—কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার থেকে তা আদৌ মুক্ত নয়। ছন্দবদ্ধ বাণী ও অলংকার-সমৃদ্ধ গাঁথার কাঁটাবর্নে আপনার আঁচল জড়িয়েও আপনি তা খুঁজে পাবেন না। এমতাবস্থায় কি করে আশা করা যায় যে, আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের জ্ঞান-সমৃদ্ধ জীবনের সঠিক চিত্র ত্রুটিমুক্ত এ্যালবামে পাব? ঐসব বুযুর্গের কিছু কিছু জীবনী-গ্রন্থ পাওয়া যায় যাঁরা তরীকতের কোন না কোন সিলসিলার সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু এ এক নিদারুণ পরিহাস যে, আপনি যদি সেসব গ্রন্থ থেকে তাঁদের নাম ও বংশ-পরিচয়, লালন-পালন, শিক্ষা, দীক্ষা-জীবন-যাপন পদ্ধতি ও জ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে চান তবে একটি শব্দও তাতে পাবেন না। কাড়া-

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, আরবী, ১ম-৮ম খণ্ড, পাঁচ হাযার ব্যক্তিত্বের জীবন-কাহিনী সম্বলিত।

নাকাড়ার ও রণদামামার কাজ এখানে অবশ্য নেই. কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার থেকে এর একটি পৃষ্ঠাও আপনি মুক্ত পাবেন না। দেখা যায় ঐ সব গ্রন্থকারের সকল শক্তি ব্যয়িত হয়েছে ঐ সব মহান বুযুর্গের কাশফ ও কারামত তথা অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনায় এবং তাঁদেরকে এই পর্যায়ে উপনীত করবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যেন তাঁরা রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের উর্ধ্বে অপর কোন সৃষ্টি, আদৌ এ জগতের কেউ নন। মনে হয় তাঁরা খান না, পান করেন না, শয়ন করেন না এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও জ্ঞান-সাধনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক কিংবা প্রয়োজনীয়তাই নেই। তাঁদের কাজ শুধু যেন এই যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রাকৃতিক বিধান সর্বদাই ভেঙে চুরে খান খান করে যাবেন এবং প্রাণী-জগত, উদ্ভিদ জগত ও বস্তু জগতের চারটি মৌলিক পদার্থের (আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি) উপর যে কোন উপায়ে নিজেদের শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবেন।" ১

এ মুহূর্তে আপনি যদি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান তবে ভারতীয় উপমহাদেশে চিশতীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা বরং আর এক দিক থেকে এ উপমহাদেশে ইসলামী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনউদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করুন এবং তা থেকে সংক্ষিপ্ত কোন জীবনী প্রণয়নে প্রয়াসী হোন, সম্ভবত আপনার মনে হবে, যুগটা যেন ইসলামের প্রাথমিক যুগ, গ্রন্থ রচনা ও কিতাবাদি প্রণয়ন যুগের সূচনাই যেন হয়নি। বাস্তব ঘটনা কিন্তু তা নয়। কেননা এ যুগেই আমরা কাযী মিনহাজ-উদ্দীন 'উছমানী জুযেজানীর 'তাবাকাতে নাসিরী' এবং নূরউদ্দীন আওফীর কিতাব 'লুবাবুল আলবাব'-এর সাক্ষাত পাই। এ দু'টো কিতাবই হিজরী সপ্তম শতাব্দীর রচনা। আর যদি তা কোন মতে মেনেও নেয়া হয় তবে এ ব্যাপারে কী বলা যাবে যে, শায়খুল ইসলাম হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (রঃ) যিনি ছিলেন একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সংস্কারক,—যিনি তাঁর যুগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং এমন একটি শহরে জীবনপাত করেছিলেন যা ছিল সে যুগে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ; যে যুগে রাজনৈতিক অবস্থার ভেতর ভারসাম্য ও স্থায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তথাপিও এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে এবং তাঁর কার্যাবলীর ইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়! অথচ তাতে অদ্ভুত ও

১. ইয়াদে আইয়াম (গুজরাটের ইতিহাস), পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯, নুযহাতুল খাওয়াতির ও 'গুলেরা'না'-এর লেখক মাওলানা হাকীম সায়্যিদ আবদুল হাই (রঃ) কৃত।

অলৌকিক কাহিনী এবং কাশ্‌ফ ও কারামতের ঘটনাবলীর কোন কমতি দেখা যায় না।

এদিক থেকে হযরত সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র:) এবং হযরত মাখদূমুল মুলক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া মুনায়রী (র:) (যাঁরা হিজরী অষ্টম শতাব্দীর দুজন নামকরা ব্যক্তিত্ব এবং মহান আধ্যাত্মিক নেতা ও সংস্কারক) বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত কোন তরীকতপন্থী নেতার এবং কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবন-বৃত্তান্ত এতখানি আলোকোজ্জ্বল নয় যতখানি এ দু'জন মহান বুযুর্গের। এ উপকরণ এদিক থেকেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার যে, সেগুলো এঁদের মলফুজাত ও চিঠিপত্রাদি (মকতূবাত) থেকে অথবা সমসাময়িক ইতিহাস এবং তাঁদের খাদেম ও মুরীদানদের লিখিত কিতাবাদি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এদিক দিয়ে ঐতিহাসিককে এখানে সর্বাপেক্ষা কম সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য বাছাই ও পর্যালোচনার কাজ এখানেও অপরিহার্য। কেননা সংঘটিত ঘটনাবলী ও সন-তারিখ নিয়ে অত্যন্ত বিশৃংখল ও পরস্পরবিরোধিতা এখানেও দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু এ দু'জন মহান বুযুর্গকে বেছে নেবার কারণ এ নয় যে, তাঁদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক উপকরণ অত্যন্ত সহজেই হস্তগত হয়। এটা অন্যান্য আরো কিছু ব্যক্তিত্বের বেলায়ও প্রযোজ্য। তবে এঁদের বেছে নেবার কারণ হ'ল, তাঁরা ইসলামী রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণের ইতিহাসে সম্মানিত আসন অধিকার করেন এবং ভারতীয় উপমহাদেশে (যা সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে ইসলাম জগতের কেন্দ্রবিন্দু এবং নবজাগরণ ও রেনেসাঁ আন্দোলনেরও উৎস-ভূমি) সংস্কারধর্মী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন,—যা নিজেদের যুগ ও পরবর্তী বংশধরদের সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে।

জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষামালা বাছাই ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার সব সময়ই সেসব অনুচ্ছেদ ও অধ্যায়গুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন যা বর্তমান বংশধরদের জন্য উপকারী, শিক্ষণীয়, অনুকরণীয়, সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক এবং যাতে ভুল বোঝাবুঝি ও গলদ আচরণের সম্ভাবনা কম এবং যা কাল্পনিক ও নৈতিক দর্শনের সঙ্গে কম সম্পর্কযুক্ত। কেননা ঈমান ও একীন, 'ইশ্‌ক ও মুহব্বত, রাসূল করীম (স:)-এর বাস্তব জীবনাদর্শ (সুন্নত) অনুসরণের প্রেরণা ও আবেগ, অটুট সংকল্প ও উচ্চ মনোবল, দা'ওয়াত ও তবলীগের আগ্রহ, আমল ও আখলাকের সংস্কার, বিশুদ্ধ 'ইল্‌ম ও ধর্মীয় বিধান

অধ্যয়ন ও অনুসরণই ছিল ঐ সমস্ত বুযুর্গের আসল সম্পদ এবং তাঁদের জীবনেতিহাসের আসল পয়গাম।

সম্ভবত গ্রন্থকারের অন্যান্য ব্যস্ততা এবং এমন সব কাজ-কর্ম যা কোন দিনই শেষ হবার নয়—এত সত্বর বর্তমান কিতাবকে পরিপূর্ণতায় পেঁছবার সুযোগ দিত না, যদি না স্বীয় জন্মভূমি (রায়বেরেলী)-র সী-নদীর বন্যা একটা গ্রামে (ময়দানপুর) গ্রন্থকারকে বন্দী করে এর প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ যুগিয়ে দিত। ফলে যে কাজে মাসের পর মাস লেগে যেত সে কাজ আল্লাহ্‌র ফযলে কয়েক সপ্তাহের ভেতরই হয়ে গেল। "আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী আসমান-যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।"

গ্রন্থকারের এটা নৈতিক দায়িত্ব উপকারী বন্ধু ও সহযোগীদের শুকরিয়া আদায় করা। প্রাচীন উৎসের ভেতর গ্রন্থকার সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞ 'সিয়ারুল আওলিয়া' প্রণেতা আমীর খোর্দ এবং 'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' গ্রন্থের প্রণেতা আমীর হাসান 'আলা সজযীর নিকট যাঁরা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র:)-এর জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষামালার সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য উপকরণ সরবরাহ করেছেন। আমি হযরত মাখদূমুল মুল্‌ক বিহারী (র:)-এর জীবনীমালার ভেতর 'সীরতুশ্‌ শরফ' থেকে বিরাট সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা লাভ করেছি এবং এ থেকে প্রাচীনতর উৎসের সন্ধান পেয়েছি। মাওলানা সায়্যিদ মানাজির আহসান গিলানী (র:)-এর রচিত গ্রন্থরাজির অধ্যায়গুলো বরাবরের মধ্যে আমার জন্য বিরাট উপকারী ও সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ওয়ালিদ সাহেব মাওলানা হাকীম সায়্যিদ 'আবদুল হাই (র:)-এর মূল্যবান গ্রন্থ 'নুযহাতুল খাওয়াতির' স্বাভাবিক নিয়মেই ইতিহাস ও তাযকিরার একটি বিশ্বকোষের কাজ দিয়েছে এবং গ্রন্থকার এ থেকে এভাবে সাহায্য ও সহায়তা নিয়েছেন, এর দিকে হাত বাড়িয়েছেন বারবার যেমন কোন ছাত্র বারবার অভিধানের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। এ বিষয়ের উপর ব্যাপক অধ্যয়নের পর পরিমাপ করতে পেরেছি যে, তাঁর দৃষ্টি কত বিস্তৃত ও গভীর এবং তাঁর নির্বাচন ও রুচি কত পবিত্র ও শালীন।

আমার সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে গ্রন্থকার জনাব মাওলানা সায়্যিদ নাজমুল হুদা সাহেব নদভী দসনবী ও বন্ধুবর মওলবী মুরাদুল্লাহ্ সাহেব মুনায়রী নদভীর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যাঁরা হযরত মাখদূমুল মুলক (র:)-এর জীবন কাহিনী ও রচনাবলীর মধ্যে কতক দুষ্প্রাপ্য বিষয় আমাকে যোগান দিয়েছেন। বন্ধুবর মওলবী শাহ শাব্বীর 'আতা নদভী (যাঁর ইতিহাস ও জ্ঞানগত বিষয়ে গভীর

আগ্রহ তাঁর স্বনামখ্যাত পিতা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে মিলেছিল) থেকেও কতক জরুরী বিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। ভাগ্যবান বন্ধুবর সায়্যিদ মুশাররাফ 'আলী নদভীও গ্রন্থকারের শুকরিয়া পাওয়ার হকদার। এ গ্রন্থকার বর্তমান পুস্তকের বিরাট অংশ রচনা করেন এবং প্রিয় বন্ধু অত্যন্ত সাহসিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে তা লিপিবদ্ধ করেন। মওলবী ইকবাল আহমদ সাহেব আ'জমীও শুকরিয়া পাওয়ার হকদার যিনি সময় অসময়ে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এসব বুযুর্গ ও বন্ধুদের উপযুক্ত শুভ প্রতিদান দিন এবং তাদের আমলকে কবুল করুন।

প্রথম থেকে শেষাবধি আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রশংসা; তাঁরই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর বংশধর, সাহাবীকুল ও সমগ্রের উপর মহান আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক।

মারকাযে দা'ওয়াতে ইসলাহ্ ও
তবলীগ, লাখনৌ

আবুল হাসান 'আলী
১১ই সফর, ১৩৮২ হিজরী
২৪, জুলাই, ১৯৬২ 'ঈসায়ী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে চিশতীয়া সিলসিলা এবং সিলসিলার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গগণ

- O ইসলামী বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক কেন্দ্র ১
- O মুসলিম ভারতের স্থপতি— ৩
- O ভারতবর্ষের সঙ্গে চিশতীয়াদের প্রাথমিক সম্বন্ধ ৪
- O হযরত খাজা মু'ঈনউদ্দীন চিশতী (রঃ) ৫
- O খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) ১১
- O হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর (রঃ) ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর জীবনী ও কামালিয়াত

- O প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ৩৩
- O কঠোর দারিদ্র্য ও মা'য়ের প্রশিক্ষণ ৩৪
- O শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর সাথে সম্পর্ক এবং আন্তরিক মিল-মুহব্বত ৩৫
- O দিল্লী ভ্রমণ ৩৫
- O দিল্লীতে ছাত্র জীবন ৩৬
- O উস্তাদের প্রিয়পাত্র ৩৬
- O জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অগ্রাধিকার ৩৭
- O 'মাকামাত' কন্ঠস্থ ও এর কাফফারা ৩৭
- O হাদীছের ইজাযত প্রাপ্তি
- O অন্তরের অস্থিরতা এবং আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমানতা ৩৮
- O ওয়ালিদা সাহেবার ইন্তিকাল ৩৯
- O মা'য়ের স্মৃতি স্মরণ ৩৯

o আল্লাহ্‌র প্রতি মা'য়ের য়াকীন ও তাওয়াক্‌কুল ৩৯
o একটি ভুল আকাংক্ষা ৪০
o আজুদহনে প্রথমবার উপস্থিতি ৪০
o প্রার্থী, না প্রার্থনা পূরণকারী ? ৪১
o মুরীদকে সাদরে গ্রহণ ৪১
o বায়'আত ৪১
o শিক্ষার ধারাক্রম অব্যাহত অথবা পরিত্যক্ত ? ৪২
o শায়খুল কবীর (রঃ) থেকে দরস গ্রহণ ৪২
o দরস-এর আনন্দ ৪৩
o আত্মবিলুপ্তির শিক্ষা ৪৩
o চূড়ান্ত মুহূর্ত ৪৪
o বন্ধুর ভৎর্সনা ৪৫
o উপস্থিতি কতবার ? ৪৭
o শায়খুল কবীর (রঃ)-এর অনুগ্রহ ৪৭
o বিদয় ও ওসিয়ত ৪৭
o একটি দু'আ'র আবেদন ৪৭
o আজুদহন থেকে দিল্লী ৪৮
o ন্যায্য অধিকার প্রত্যর্পণ ৪৯
o দিল্লীর অবস্থানস্থল ৫০
o দারিদ্র্য ও অনাহার ৫১
o অন্যের মাধ্যম ব্যতিরেকে ৫২
o শায়খুল কবীর (রঃ)-এর ওফাত ৫২
o গিয়াছপুরে অবস্থান ৫৩
o জনস্রোত ৫৬
o অনুগ্রহ বিতরণকারী ফকীর ৫৬
o জাগ্রত হবার পর প্রথম প্রশ্ন ৫৭
o দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বিনিময় ও দান ৫৭
o জমি-জায়গা ও অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে বিরত থাকা ৫৭
o ফকীরের শাহী দস্তরখান ৫৮
o শায়খ (রঃ)-এর খোরাক ৫৯
o নিয়ম-প্রণালী ৬০

o সমসাময়িক সুলতানের সাথে সম্পর্কহীনতা ৬০
o সুলতান 'আলাউদ্দীনের পরীক্ষা ও শ্রদ্ধা ৬২
o বাদশাহ্‌র আগমন সংবাদে 'উযরখাহী ৬৩
o ঘরের দু'টি দরজা ৬৩
o ইসলামের জন্য চিন্তা-ভাবনা ৬৩
o সুলতান কুতবুদ্দীনের বিরোধিতা ও হত্যা ৬৫
o গায়েবী লঙ্গরখানা ৬৬
o গিয়াছুদ্দীন তুগলকের রাজত্বকাল এবং সরকারী বিতর্ক সভা ৬৭
o হযরত খাজা (রঃ)-এর যবানীতে বিতর্ক সভার অবস্থা ৭০
o দিল্লীর ধ্বংস ৭১
o সময়ের ব্যবস্থাপনা ৭১
o আমীর খসরুর বৈশিষ্ট্য ৭২
o রাত্রের প্রস্তুতি ৭২
o সাহরী ৭৩
o ভোর বেলায় ৭৩
o দিনের বেলায় ৭৩
o মনস্তুষ্টি সাধন ও প্রশিক্ষণ ৭৪
o ওফাত নিকটবর্তী হ'লে ৭৪
o মর্যাদাশীল খলীফাদের এজাযতনামা প্রদান, মুহব্বত ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ৭৪
o ওফাতের অবস্থা ৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

চরিত্র ও গুণাবলী

o সামগ্রিক গুণাবলী ৭৯
o ইসলাম ৭৯
o শত্রুর প্রতি উদারতা ৮১
o দোষ গোপন এবং মহত্ত্ব ও ঔদার্য ৮৩
o স্নেহ-প্রবণতা ও আত্মীয়-কুটুম্বিতা ৮৪
o সাধারণের প্রতি সমবেদনা ৮৫
o ছোটদের প্রতি স্নেহ ৮৭

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাদ আহলাদ ও বাস্তব অবস্থাদি

O প্রেম-মুহব্বত ও স্বাদ-আহলাদ ৮৯
O 'সামা' ৯১
O বাদ্য যন্ত্রের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং এর উপর নিষেধাজ্ঞা ৯৩
O 'সামা'র মধ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (র:)-এর অবস্থা ৯৪
O কুরআনুল করীমের স্বাদ ৯৬
O শায়খ (র:)-এর সাথে সম্পর্ক ৯৭
O জামাতের ব্যবস্থাপনা ও দৃঢ় মনোবল ৯৮
O শরীয়তের পাবন্দী এবং সুন্নতের অনুসরণে কর্মপন্থা ৯৮

পঞ্চম অধ্যায়

পরোপকার ও গভীর বিশ্লেষণ

O জ্ঞানের মর্যাদা ৯৯
O জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ৯৯
O হাদীছ ও ফিকাহ্-র উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ১০০
O ইসলামের গুরুত্ব ১০১
O গভীর জ্ঞানরাজি ও প্রবন্ধাদি ১০২
O শরীয়তের বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান ১০৩
O হালাল বস্তু আল্লাহ্-র পথের প্রতিবন্ধক নয় ১০৪
O কলব (আত্মা) আল্লাহ্-র দিকে নিবিষ্ট হলে কোন বস্তুই ক্ষতিকর নয় ১০৪
O দুনিয়া পরিত্যাগের হাকীকত ১০৪
O বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন আনুগত্য ১০৫
O কাশফ ও কারামত আল্লাহ্-র পথের অন্তরায় ১০৫
O আওলিয়া ও আম্বিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান ১০৫
O দুনিয়ার মুহব্বত ও দুশমনী ১০৬
O তিলাওয়াতে কালামে পাকের মরতবা ১০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফয়েয ও বরকত

O ঈমানের নব জাগরণ এবং ব্যাপক ও সাধারণ তওবাহ ১০৮
O বায়'আত একটি অঙ্গীকার ও পারস্পরিক ওয়াদা পালনের নাম ১১০

○ সাধারণ ও ব্যাপক বায়'আত-এর হিকমত ১১১
○ জনজীবনে এর প্রভাব ১১৩
○ প্রেমের বাজার ১১৭
○ খলীফাদের তরবিয়ত ১১৮
○ চিশতী-খানকাহ ১২০
○ বিশিষ্ট মুরীদবর্গ ১২০

সপ্তম অধ্যায়

হযরত খাজা (র)-এর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাব এবং তাঁর খলীফাদের ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক খেদমত

○ তৎকালীন সুলতানদের সঙ্গে নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার নমুনা ১২৫
○ ইসলামী সালতানাতের পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধান ১২৯
○ ইসলামের প্রচার ও প্রসার ১৩৫
○ 'ইলম-এর খেদমত ও প্রচার ১৩৯
○ শেষ কথা ১৪০

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ)

প্রথম অধ্যায়

জীবনের ঘটনাবলী ও বিভিন্ন অবস্থাঃ জন্ম থেকে বায়'আত ও ইজাযত লাভ পর্যন্ত

○ খান্দান ১৪৫
○ জন্ম ১৪৬
○ শিক্ষা ১৪৬
○ মওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং সোনার গাঁও সফর ১৪৭
○ বিবাহ ১৪৯
○ দেশে প্রত্যাবর্তন ১৫০
○ দিল্লী সফর ও একজন মহান বুযুর্গের নির্বাচন ১৫১
○ শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ) ১৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতেবর্ষে ফিরদৌসিয়া সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গগণ

০ খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (রঃ) ১৫৪
০ ভারতীয় উপমহাদেশে কুবরোবী সিলসিলার আগমন ১৫৫
০ ভারতীয় উপমহাদেশে ফিরদৌসিয়া সিলসিলার আগমন ১৫৬
০ খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ)
০ খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)

তৃতীয় অধ্যায়

মুজাহাদা, নির্জন বাস, লোকালয়ে অবস্থান এবং ইরশাদ ও প্রশিক্ষণ

০ দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন ১৬১
০ প্রেমের উচ্ছ্বাস ১৬১
০ রাজগীরের জঙ্গলে ১৬২
০ বিহারে বসবাস এবং খানকাহ নির্মাণ ১৬৩
০ উপদেশ ও হেদায়াত প্রদান ১৬৬

চতুর্থ অধ্যায়

গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

০ আত্মবিলুপ্তি ১৬৯
০ আখলাক ও মহান চরিত্র ১৭১
০ স্নেহ ও করুণা ১৭৩
০ দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ১৭৪
০ বুলন্দ হিম্মত ১৭৫
০ তাজরীদ ও তাফরীদ ১৭৬
০ সৎকার্যে আদেশ এবং মুসলমানদের অবস্থা
ও কার্যকলাপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ১৭৮
০ সুন্নতের অনুসরণ ১৭৯

পঞ্চম অধ্যায়

ওফাত

o ওফাতের অবস্থা ১৮১
o সালাতে জানাযা ও দাফন ১৯১
o সন্তান-সন্ততি ও বংশধর ১৯২
o বিশিষ্ট খলীফা এবং মুরীদবর্গ ১৯২
o রচিত গ্রন্থাদি ১৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

মকতুবাত

o মকতূবাত, তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যিক মান ১৯৫
o চিঠিপত্রের (মকতূবাত) সংকলন এবং যাকে লেখা হয়েছে ১৯৯
o রচনার উৎস ২০১

সপ্তম অধ্যায়

মকামে কিবরিয়া

o দুনিয়া জাহানের মহান স্রষ্টার পরমুখাপেক্ষীহীনতা ২০২
o মহা করুণা-সিন্ধুর প্রবল উচ্ছ্বাস ২০৮
o সাধারণ প্রতিদান ২০৯
o দয়ালু সমালোচক ২১০
o তওবার তা'ছীর ২১১

অষ্টম অধ্যায়

মানবতার সম্মান ও মর্যাদা

o একটি বিপ্লবাত্মক দা'ওয়াত ২১২
o স্রষ্টার বিশেষ দৃষ্টি ২১৩
o মুহব্বতের আমানত ২১৪
o হাসিলে ওজুদ : মানুষের অস্তিত্ব লাভ ২১৫
o আমানতের বোঝা ২১৫
o মাটির ঢেলার সৌভাগ্য ২১৬
o আল্লাহ্‌র গুপ্ত-রহস্যের বাহক ২১৭
o সিজদা ও ঈর্ষার পাত্র ২১৮
o সতর্ক দীল ২১৮
o অধিকতর পরাজিত, অধিকতর প্রিয় ২১৯
o মুহব্বতের রাজত্ব ২২০

নবম অধ্যায়

বিশ্লেষণসমূহ ও উচ্চতম জ্ঞান

o উচ্চতম ও সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং নিবন্ধসমূহ ২২১

o ওয়াহদাতুশ শুহূদ ২২১

o পরিবর্তন ও বিবর্তন গুণাবলীর মধ্যে, সত্তার মধ্যে নয় ২২৩

o দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তুর নড়া-চড়া চোখে পড়ে না। ২২৩

o প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার উৎসাদন আমল
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইহাকে পরাভূতকরণ ২২৪

o কারামতও এক প্রকার মূর্তি ২২৬

o কাশফ, কারামত ও ইস্তিদরাজ ২২৬

o সেবার মর্যাদা ২২৭

o 'নফস' সংশোধনের তথা ইসলাহে নফস-এর মানদণ্ড ২২৭

দশম অধ্যায়

দ্বীনের হেফাজত ও শরীয়তের সাহায্য সমর্থন

o একটি সংস্কার ও সংশোধনমূলক কাজ ২২৯

o বিলায়েতের মর্যাদা থেকে নবুওতের মর্যাদা উত্তম ২৩০

o আম্বিয়ায়ে কিরামের একটি নিঃশ্বাস ওলীদের সমগ্র
জীবনের সাধনা থেকেও উত্তম ২৩২

o আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ আর আওলিয়াদের আত্মা ২৩৩

o শরীয়তের চিরন্তনতা ও অপরিহার্যতা ২৩৩

o শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দী সর্বাবস্থায় অপরিহার্য ২৩৪

o শরীয়তের স্থায়িত্বের গোপন রহস্য ২৩৫

o একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত ২৩৬

o 'উলামা ও কামিল বুযুর্গগণের আদর্শ ২৩৭

o শরীয়তের শর্ত ২৩৮

o মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পদাংক অনুসরণ ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই ২৩৮

o ফিরদৌসিয়া সিলসিলার প্রচার এবং এর কতিপয় কেন্দ্র ২৩৯

o হযরত মাখদূম (রঃ)-এর দোহা ও হিন্দী প্রবাদ বাক্য ২৩৯

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষে চিশতীয়া সিলসিলা এবং সিলসিলার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গগণ

ইসলামী বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক কেন্দ্র

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী (খ্রীস্টীয় ১২শ শতাব্দী) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশাল বিস্তৃত ইসলামী বিশ্বে এমন এক সুবিশাল নতুন রাষ্ট্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছিল যা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানবীয় যোগ্যতা ও প্রতিভায় ছিল পরিপূর্ণ এবং যার ললাটে লেখা ছিল নিকট-ভবিষ্যতে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত ও পয়গামের বিশ্বজয়ী কেন্দ্র ও ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক ও আমানতদার হওয়ার কথা।

এ শতাব্দীর প্রাক্কালেই অর্ধ-বন্য তাতারীদের আক্রমণ সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর পঙ্গপালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুর বন্য অত্যাচারে দেশের পর দেশ, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, শহরের পর শহর, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পীঠস্থান, শিক্ষায়তন ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমি-সমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। শহরের শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা, জীবনের অটুট বাধন, ভদ্র ও মর্যাদাশীল লোকদের মানসম্ভ্রম সবই ধূলোয় মিশে যায়। বুখারা, সমরখন্দ, রেয, হামদান, জুনযান, কুজভীন, মার্ভ, নিশাপুর, খাওয়ারিযম, এবং শেষ পর্যন্ত খেলাফতের কেন্দ্র ও ইসলামের আবাসভূমি বাগদাদ এ দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয় এবং তার অতীত ও সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এরূপ আকস্মিক বিপদ ও দুর্যোগের শিকারে পরিণত হয়ে মুসলিম জাহানের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে উঠে এবং সমগ্র প্রাচীন ইসলামী বিশ্বের উপর রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে। এ সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভারতবর্ষই কেবল একটি মাত্র দেশ যা দুনিয়াব্যাপী এ অশুভ ফেতনা ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানে তখন প্রাণবন্ত, শক্তিশালী, অত্যুৎসাহী, আবেগদীপ্ত তুর্কী

বংশোদ্ভূত লোকদের রাজত্ব চলছিল যারা ছিল ঐ সমস্ত তাতার ও মোগলদের আক্রমণের অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম। তারা নিজেদের ঈমানী শক্তি ও ইসলামের নবোদ্দীপ্ত উৎসাহ এবং আবেগের ভিত্তিতে—যুদ্ধ-শক্তি, রণকৌশল ও সাহসিকতায় কেবল ওদের সমকক্ষই ছিল না বরং তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠতর ছিল। তাতার ও মোগল বাহিনী বারবার ভারতবর্ষের উপর হামলা চালাতে থাকে এবং প্রতিবারই প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হটতে থাকে। একমাত্র সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালেই চেঙ্গীয খানের বংশধর মোগলরা পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। প্রথম আক্রমণ ঘটে ৬৯৬ হিজরীতে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম আক্রমণ পরিচালনাকালে সুলতানের পক্ষ থেকে মালিক তুগলক (মালিক গাযী) এমন বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং মোগলদের এমনভাবে পরাজিত করেন যে, "সেদিন থেকে ভারতবর্ষের স্বপ্ন মোগলদের মন-মগজ থেকে উঠে যায় এবং তাদের লোভাতুর দৃষ্টি চিরদিনের তরে ঘোলাটে ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।"[১]

মুসলিম বিশ্বের অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর কাছে মানসম্ভ্রম এবং ঈমান ও 'আকীদা ছিল অত্যন্ত প্রিয় বস্তু; তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও মহোত্তম হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ছিল তারা নিজেদের দেশে শান্তি ও জীবনের নিরাপত্তা লাভে বঞ্চিত হয়ে অবশেষে শান্ত ও নিরাপদ ইসলামের এই নতুন আবাসভূমি ভারতবর্ষের দিকে দলে দলে হিজরত করতে শুরু করে। যোগ্যতম ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের এবং অভিজাত ও ভদ্র পরিবারবর্গের হিজরতকারী এ কাফেলা বন্যার বেগে ইরান, তুর্কিস্থান এবং ইরাক থেকে ভারতবর্ষের দিকে আছড়ে পড়তে থাকে, যার ফলে দিল্লী একটি আন্তর্জাতিক শহরে এবং এককালের মুসলিম সাম্রাজ্যের গৌরব বাগদাদ ও কর্ডোভার ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়। শুধু দিল্লীই নয় বরং ভারতবর্ষের অন্যান্য শহর ও শহরতলীগুলো পর্যন্ত সিরাজ ও য়ামানের সমকক্ষতা লাভ করে। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বার্নী প্রমুখ এ সমস্ত অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশ-গোত্রের, খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর, মশহূর উলামায়ে কিরামের ও পণ্ডিতমণ্ডলীর, ইসলামের মহান ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ ও মনীষীদের নামের যে তালিকা পেশ করেছেন যাঁরা তাতারী ফেতনার পরিণতিতে ভারতবর্ষে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং পরে এখানে শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচার তথা জনগণের ব্যাপক আত্মশুদ্ধির অভিযানে মনোনিবেশ

১. মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ, পৃষ্ঠা ১৮৬ ও তারীখে ফিরূযশাহী, ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বার্নীকৃত—পৃষ্ঠা ২৫১, ৩০২, ৩২০ ও ৩২৩।

করেছিলেন—অধিকন্তু সাম্রাজ্যের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্বও সামলিয়ে ছিলেন এবং যাঁরা ছিলেন সাম্রাজ্যের গৌরব ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু, তাতে মনে হয় তখন সমগ্র ইসলামী বিশ্বের আভিজাত্য, মর্যাদা ও মহত্ত্বের এখানেই যেন সমাবেশ ঘটেছিল।[১]

এই বিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষ শুধু মুসলিম জাহানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশেই পরিণত হয় নাই বরং ইতিহাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এদিকেই ছিল যে, সে (ভারতবর্ষ) ইসলামের চিন্তা ও আত্মিক শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপ্লব ও পুনরুজ্জীবনেরও নতুনতর কেন্দ্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। উপরন্তু ইসলামের জ্ঞান-গবেষণা, ঈমানের বিপ্লবী দাওয়াত এবং 'আকীদার অটুট ও দৃঢ়সংকল্পের ইতিহাস রচয়িতাদের ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে এরই উপর সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

মুসলিম ভারতের স্থপতি

মুসলিম বিশ্বের জন্য ভারতবর্ষের আবিষ্কার ও প্রাপ্তি একটি নতুন দুনিয়া আবিষ্কার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। হিজরীর প্রথম শতাব্দীতেই এখানে ইসলামের উৎসাহদীপ্ত কাফেলার আগমন ঘটেছিল এবং ৯৩ হিজরীতে ইসলামের বীর সন্তান মুহাম্মাদ বিন কাসিম ছাকাফী সিন্ধু থেকে মুলতান অবধি সমগ্র এলাকা তলোয়ার ও চারিত্রিক মাধুর্যের সাহায্যে মুসলিম অধিকারে আনয়ন করেন। অধিকন্তু এ উপমহাদেশের স্থানে স্থানে দ্বীপ ও উপদ্বীপের ন্যায় ইসলামের মুবাল্লিগবৃন্দের কেন্দ্র ও খানকাহ্ সমূহ স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলো অন্ধকার রাত্রিতে প্রান্তরের মধ্যে ক্ষুদ্র প্রদীপের ন্যায় আলো বিকিরণ করছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ বিজয়ের পুরো কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন আলেক-জাণ্ডারের ন্যায় দুঃসাহসী ইসলামের বীর সৈনিক সুলতান মাহমূদ গযনভী (৪৪১ হিঃ) এবং ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তিতে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের কৃতিত্বের অধিকারী হচ্ছেন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী (৬০২ হিজরী)। আর এখানে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ঈমানী বিজয় প্রতিষ্ঠার মূল স্থপতি হচ্ছেন শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) (জন্ম ৬২৭ হিজরী)।

ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রাক্কালেই ইসলামের প্রসিদ্ধ চারটি আধ্যাত্মিক সিল-সিলা কাদিরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া ও সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকা জন্মলাভ

১. তারীখে ফিরূযশাহী দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ১১১ ও ১১২।

করেছিল এবং বেশ কিছুকাল থেকেই ফলে-ফুলে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিলো। নিজস্ব সময় ও সুযোগ মুতাবিক এদের প্রত্যেকটিরই ফয়েয ও বরকত ভারতবর্ষে পৌঁছে যায় এবং ভারতবর্ষের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণে সবগুলো সিলসিলারই যৌথ অবদান রয়েছে। আল্লাহ্ পাকও তাঁদের প্রচেষ্টাকে ধন্য করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিজয়ে এবং এখানে ইসলামের চারা রোপণে (যার ছায়া ও ফল লাভে দুনিয়ার একটি বিরাট অংশ উপকৃত হতে যাচ্ছিল) আল্লাহ্‌র কুদরতী বিধান চিশতীয়া সিলসিলাকে বেছে নিয়েছিল। "আর তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা পয়দা করেন ও যেমনটি ইচ্ছা বাছাই করেন।" (আল-কুরআন)

আল্লাহ্‌র এ সমস্ত গুপ্ত-রহস্য ছাড়াও চিশতীয়া তরীকার উপর আমাদের এ দেশের প্রতিবেশীসুলভ অধিকারও ছিল। চিশতীয়া তরীকার সিলসিলা আমাদের দেশেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানে উজ্জ্বলতররূপে বিকশিত হচ্ছিল। স্বীয় সংবেদনশীল মিযাজ, প্রেম ও ভালবাসা ভিত্তিক হবার কারণে—যা চিশতীয়া তরীকার মৌলিক পুঁজি ও মূলধনও বটে—এ সিলসিলা ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দের অন্তর-মন জয় এবং স্বীয় প্রেমে পাগলপারা ও মাতোয়ারা করতে যে অত্যন্ত সহজেই সক্ষম হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেননা প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ভূমির প্রাণসত্তা ও কাঠামো প্রেম ও বেদনার জারক রসে সঞ্জীবিত।

ভারতবর্ষের সাথে চিশতীয়াদের প্রাথমিক সম্পর্ক

উপরে উল্লিখিত জানা-অজানা গূঢ় রহস্য ও কৌশলসমূহের কারণে আল্লাহ্ তাঁর প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ীই ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের পরিচিতি ও প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে চিশতীয়া সিলসিলাকে নির্বাচিত করেন। আর চিশতীয়া তরীকার ধারক ও বাহক মহান সন্তানদের প্রতি ভারতবর্ষের দিকে গতি পরিবর্তনের গায়েবী ইঙ্গিত আসে। সর্বাগ্রে চিশতীয়া তরীকার যে বুযুর্গ সাধক ভারতবর্ষের দিকে নিজের গতিধারা পরিচালিত করেন তিনি ছিলেন খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতী[১] যাঁর দু'আ, পবিত্র ও বরকতময় অস্তিত্ব সুলতান

১. খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতী (মৃত্যু ৪০৯ অথবা ৪১১ হিজরীতে) খাজা আবু আহমাদ চিশতীর পুত্র ও খলীফা ছিলেন যিনি খাজা আবু ইসহাক শামীর সর্বপ্রধান খলীফা এবং খাজা নাসিরুদ্দীন আবু য়ূসুফের পীর ও মুরশিদ ছিলেন। খাজা নাসিরুদ্দীন আবু য়ূসুফ আবার খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ (র:)-এর পীর ছিলেন এবং তিনি (খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী) হাজী শরীফ জিন্দানীর পীর; হাজী শরীফ জিন্দানীর খলীফা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র:)।

মাহমূদ গযনভীর ধারাবাহিক বিজয়ের পেছনে সদা ক্রিয়াশীল ছিল। মাওলানা জামী 'নাফাহাতুল উনস্' নামক গ্রন্থে বলেন:

"যখন সুলতান মাহমূদ সোমনাথ[১] আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখনই খাজা আবু মুহাম্মাদ গায়েবী নির্দেশ পান যেন তিনি সুলতান মাহমূদের সাহায্যার্থে গমন করেন।

তিনি ৭০ বছর বয়সে কতিপয় দরবেশ সাথে নিয়ে রওয়ানা হন এবং সেখানে পেঁৗছে স্বয়ং জিহাদে শরীক হন।"

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)

কিন্তু যেমনি সুলতান মাহমূদের রাজনৈতিক বিজয়ের পরিপূর্ণতা এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ও মযবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরীর ভাগ্যে নির্ধারিত ছিল, ঠিক তেমনিই আবু মুহাম্মাদ চিশতী (রঃ)-এর মিশনের পূর্ণতা সাধন, ইসলামের ব্যাপক ও সাধারণ প্রচার ও প্রসার, মযবুত ভিত্তিক ইসলামী কেন্দ্র এবং সততা ও হেদায়াতের প্রতিষ্ঠা উক্ত সিলসিলারই একজন বুযুর্গ আওলিয়াকুল শিরোমণি হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী সজযী[২] (রঃ)-এর ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছিল।

---

১. সুলতান মাহমূদ ৪১৬ হিজরীতে সোমনাথ আক্রমণ করেন। যদি উল্লিখিত বছর (৪০৯ অথবা ৪১১ হিজরী) খাজা আবু মুহাম্মাদ চিশতীর ঠিক মৃত্যু সন হয়ে থাকে তবে এর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত মাওলানা জামী "আক্রমণ" দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রমণকেই বুঝিয়েছেন এবং তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণকেই সোমনাথ আক্রমণের সমার্থক ভেবেছেন। কেননা সুলতান মাহমূদের সোমনাথ বিজয়ই একমাত্র ভারতবর্ষের বাইরে ব্যাপক খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। সোমনাথ আক্রমণের পূর্বেই তিনি ৮ বার ভারত আক্রমণ করেন। এর মধ্যে কোন একটিতে (সম্ভবত প্রথম আক্রমণ পরিচালনা কালে) শায়খ আবু মুহাম্মাদ (রঃ) সুলতান মাহমূদের সঙ্গী ছিলেন।

২. খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) আপন জন্মভূমির প্রকৃত নামে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে 'সজযী' হবেন; কিন্তু লেখকদের ভুলেই হোক কিংবা সাধারণের উচ্চারণদোষে হোক তিনি 'সঞ্জরী' হয়ে গেছেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং কবিতা ও গাথা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথমে 'সজযীই' লেখা হ'ত এবং বলা হ'ত। 'সজয' সিজিস্তান-এর দিকে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভূগোলবেত্তাগণ একে সাধারণভাবে খুরাসান প্রদেশের অন্তর্গত বলে ধরে নেন। বর্তমানে এর অধিকাংশ এলাকাই ইরানের এবং বাকী অংশ আফগানিস্তানের অন্তর্গত।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ (যার মধ্যে তাবাকাতে নাসিরীর লেখক কাযী মিনহাজুদ্দীন 'উছমানী জুনজানীও অন্তর্ভুক্ত— যিনি হযরত খাজা সাহেবের অল্প বয়স্ক সমসাময়িকও ছিলেন)[১] বলেন, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর সেইসব সৈন্যবাহিনীর সাথেই ছিলেন যারা আজমীরের রাজা রায় পাথুরাকে (পৃথ্বিরাজ[২]) পরাজিত করেন এবং

এই এলাকার রাজধানী ছিল জরন্‌জ যার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে যাহিদানের নিকটে পাওয়া যায়। এককালে সিজিস্তানের সীমানা গযনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (আহসানুত্তাকাসীম)

কোন কোন ভূগোলবেত্তার মতে, 'সজয' সিজিস্তানের অন্তর্গত একটি বিশেষ জায়গার নাম যার দিকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে একজনকে সজযী বলা চলে। কখনো কখনো সমগ্র সিজিস্তানের দিকে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেও একজনকে সজযী বলা হয়।

'প্রাচ্যের খেলাফতের ভৌগোলিক সীমারেখা'র লেখক মি. জি. বি. স্ট্রেঞ্জ ৩০ পৃষ্ঠা জুড়ে সিজিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখা বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্ত-সার হচ্ছে, সিস্তান ফারসী শব্দ, সংগীস্তান থেকে উদ্ভূত। আরবরা তাকে সিজিস্তান বলে। উক্ত এলাকার যমীন নীচুতে এবং হ্রদ জেরাহ নামক জায়গার পাশে এবং তার পূর্ব দিকে অবস্থিত। হিলমন্দ নদীসহ যতগুলি নদী উক্ত হ্রদে পতিত হয় এর সবগুলির উৎসমূল এ এলাকাতেই পড়ে।

ফারসী ভাষায় সিস্তানকে 'নিমরোজ' (বা দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্র) বলা হয়। সিস্তান খুরাসানের দক্ষিণে অবস্থিত বলে একে দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্র বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৫০৩ ও ৫০৪)।

১. কাযী সাহেবের জন্ম ৫৮৯ হিজরীতে হয়েছিল।

২. পৃথ্বিরাজ অথবা রায় পাথুরা (১১৭৭-১১৯৪ খৃস্টাব্দ) সোমেশ্বরের পুত্র ছিলেন—যিনি আজমীরে চৌহান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অরুনা রাজার পুত্র এবং এ বংশেরই প্রখ্যাত শাসক ভোগর রাজা ওরফে দলীল দেবের ভাই ছিলেন। সোমেশ্বরের দিল্লীর তুমার রাজপুত নৃপতির বংশ এবং আজমীরের চৌহান বংশের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল। সোমেশ্বর দিল্লীর শেষ তুমার রাজা আনন্দ পাল (অনঙ্গ পাল)-এর জামাতা ছিলেন এবং এই সুবাদে পৃথ্বিরাজ দিল্লীর শেষ নৃপতির দৌহিত্র হন। আনন্দ পালের জীবিত কোন পুত্রসন্তান ছিল না বিধায় তিনি পৃথ্বিরাজকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে নৃপতির মৃত্যুর পর পৃথ্বিরাজ স্বাভাবিকভাবেই দিল্লীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং পৈত্রিক সূত্রে রাজা সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর আজমীরের শাসনভারও লাভ করেন। এভাবেই রাজা পৃথ্বিরাজ রাজপুত রাজাদের দু'টি শক্তিশালী কেন্দ্র দিল্লী ও আজমীরের সিংহাসনের অধিকারী হন। যেহেতু আজমীর ছিল তাঁর জন্মস্থান ও পৈত্রিক আবাসভূমি এবং দাদার সিংহাসনও এখানেই ছিল, তাই ষোল আনা সম্ভাবনা যে, পৃথ্বিরাজ অধিকাংশ সময় আজমীরেই কাটাতেন। আর এ কারণেই সে যুগে আজমীরই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। ব্যক্তিগতভাবে পৃথ্বিরাজ অত্যন্ত উৎসাহী ও উচ্চাকাংখী বীর বাহাদুর এবং অদ্বিতীয় তীক্ষ্ণধী রাজপুত

ভারতবর্ষ বিজয় সম্পূর্ণ করেন। এ বিজয়ে তাঁর দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ্ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিরাট ভূমিকা ছিল।[১]

পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর আক্রমণ পরিচালনার মধ্যবর্তী সময়ের (৫৭৯ হিজরী থেকে ৬০২ হিজরী) প্রথম দিকেই আজমীরে যা সে সময়ে রাজপুত শক্তি ও সাম্রাজ্যের এবং হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার, একটি বিরাট কেন্দ্র[২] ছিল, অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যখন মুহাম্মাদ ঘোরীর আক্রমণ দ্বারা ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়নি এবং যখন তাঁর আক্রমণ

ছিলেন। অনেকগুলি যুদ্ধে তিনি বিজয় শিরোপা লাভে সক্ষম হন যা শতাব্দী কাল পর্যন্ত তাঁর নাম ও খ্যাতিকে অম্লান ও উজ্জ্বল রেখেছিল। কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের মেয়ে সংযুক্তাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে উঠিয়ে আনার কারণে তিনি রূপকথার রাজপুত্রের ন্যায় কিংবদন্তীর নায়ক হিসাবে উত্তর ভারতের গাথা ও কাব্যে স্থান লাভ করেন যা অদ্যাবধি গীত ও পঠিত হয়ে থাকে। পৃথ্বিরাজ স্বীয় রণনৈপুণ্যে, দৃঢ় চেতনায় এবং বিবিধ বিজয়ের কারণে ভারতবর্ষের শেষ দু'জন বাহাদুর রাজপুত এবং শক্তিশালী নৃপতির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পরাজয় তাঁর মান-মর্যাদা পর্দার অন্তরালে ঠেলে দেয়। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে (হিজরী ৫৮৭) যখন সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন পৃথ্বিরাজ তরাইন (বর্তমানে তেলোণ্ডী) নামক স্থানে যা থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটি সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁর মুকাবিলা করেন এবং সুলতানকে পরাজিত করেন। পরবর্তী বছর ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে (হিজরী ৫৮৮) সুলতান বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে নব উদ্যমে এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দ্বিতীয় বার আক্রমণ করেন। পৃথ্বিরাজ তিন লাখ ঘোড়-সওয়ার এবং তিন হাযার হাতী সহকারে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন। ১৫ জন রাজপুত রাজাও নিজ নিজ বাহিনীসহ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পৃথ্বিরাজ পরাজিত হন এবং বন্দী অবস্থায় নীত ও নিহত হন। এভাবেই রাজপুতদের স্বাধীন সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাসনামলের পরিসমাপ্তি ঘটে। (অধ্যাপক ঈশ্বরী প্রসাদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক থেকে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত)

১. তাবাকাতে নাসীরী, পৃষ্ঠা ৪০; তারীখে ফিরিশতা, ৫৭ পৃষ্ঠা; মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ, ৫০ পৃষ্ঠা।

২. আজমীর থেকে ৭ মাইল উত্তরে পুশকর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি যার দর্শন উপলক্ষে দূর-দূরান্তর এলাকা থেকে লোক সমাগম ঘটত। এর ঝিল (হ্রদ ও পুকুর) ধর্মীয় পবিত্র বস্তুর মর্যাদা লাভ করেছিল। একমাত্র মানস সরোবরই তার সমপর্যায় ও সমমর্যাদার দাবি করতে পারত। পুশকরের ঝিল সম্পর্কে সাধারণ্যে এ ধরনের বিশ্বাসও প্রচলিত যে, ব্রহ্মা সেখানে ধ্যানস্থ হন এবং স্বরস্বতী নিজস্ব পাঁচটি ধারা দ্বারা প্রকটিত হন। (আজমীর গেজেটিয়ার, পৃষ্ঠা—১৮)

পরিচালনা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে এমন একটি ঘটনার উদ্ভব ঘটে যদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যায়। রাজা পৃথ্বিরাজ কোন একজন মুসলমানকে (সম্ভবত তাঁরই দরবারের সাথে সম্পর্কিত কেউ হবেন) কষ্ট ও বিপদের মধ্যে ফেলেন। এর প্রতিকার চেয়ে হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) পৃথ্বিরাজকে একটি পত্র লিখেন। পৃথ্বিরাজ অত্যন্ত গর্বভরে অবমাননাকর ভাষায় ঐ পত্রের জবাবে বলেন, 'এই লোকটি এখানে আসার পর এমন বড় বড় কথা বলে যা কেউ কখনও বলেনি এবং শোনেও নি।' হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) ঐ জবাব শুনে বলেন, 'আমি পৃথ্বিরাজকে জীবিত বন্দী করে মুহাম্মাদ ঘোরীর হাতে তুলে দিলাম।' এর পর পরই মুহাম্মাদ ঘোরী হামলা করেন। পৃথ্বিরাজ মুকাবিলা করেন এবং পরাজিত হন।[১]

যা হোক, ঘটনার বিবরণে যতটুকু জানা যায়, তাতে কোনই সন্দেহ নেই যে, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) মুহাম্মাদ ঘোরীর হামলার মধ্যবর্তী সময়ে এবং ভারতবর্ষে ইসলামী সাম্রাজ্য সাধারণভাবে ও সুদৃঢ় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বেই প্রাচীন ভারতবর্ষের বিরাট রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আজমীরকেই আবাসস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর অটুট সংকল্প, উচ্চ মনোবল ও ঈমানী সাহসিকতার এমন একটি উজ্জ্বল ঘটনা যার নজীর শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা ও বিশ্ববিজেতাদের জীবনকথায় পাওয়া যাবে। তাঁর দৃঢ়তা, ধৈর্য, ঐকান্তিকতা, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা, তাকওয়া, পরহেযগারী ও ত্যাগ স্বীকারের কারণেই যে ভূখণ্ড ছিল হাযার হাযার বছর ধরে সত্যিকার ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মের প্রকৃত রূপ ও পরিচিতি থেকে বঞ্চিত, তাওহীদের বজ্রকণ্ঠ থেকে ছিল বধির ও অজ্ঞ, সেই ভূখণ্ডই 'উলামায়ে কিরামের আবাসভূমি এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনী পরিপূর্ণতার বিশ্বস্ত আমানতদার ও সংরক্ষক হয়ে পড়ে। তার আকাশ-বাতাস আযানের শব্দে অনুরণিত আর পর্বতমালা ও গিরি-কন্দর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এবং শহর-বন্দরগুলি আল্লাহ্‌র কালাম ও রসূল পাক (সঃ)-এর বাণীতে গুঞ্জরিত ও মুখরিত হয়ে উঠে।

সিয়ারুল আওলিয়ার গ্রন্থকার কী সুন্দর করেই না লিখেছেন—

ভারতবর্ষ নামক দেশটির শেষ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকের রাজত্ব ছিল। খোদাদ্রোহীরা তারস্বরে 'আনা রাব্বুকুমুল আ'লা' (আমিই তোমাদের

১. সিয়ারুল আওলিয়া,—৪৭ পৃষ্ঠা ; মাআছারুল কিরাম পৃঃ ৭

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু) আওয়ায হাঁকছিল। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ইট, পাথর, গাছ, পশু, গাভী ও গোবরকে প্রণতি জানাচ্ছিল। কুফর ও অন্ধকার দ্বারা মানুষের অন্তর-মন ছিল আচ্ছন্ন ও তালাবদ্ধ। সবাই ছিল দীন ও শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অনীহ, অসতর্ক এবং আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহী রসূল (সঃ)-এর সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর। এরা কেউ কেবলা চিনত না—'আল্লাহু আকবার' আওয়াযও কেউ শোনেনি। বিশ্বাসীদের সূর্য হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর কদম মুবারক এদেশের মাটিতে পড়া মাত্রই রাষ্ট্রের নিশ্ছিদ্র অন্ধকাররাশি ইসলামের সুশোভিত আলোকমালায় রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়ে গেল। একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রভাবে যেখানে ক'দিন আগেও শিরকের কালো প্রতীক বিরাজ করত, সেখানে মসজিদ, মিহরাব ও মিম্বর দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। যে আসমান পৌত্তলিকতা ও শিরকের বিষবাষ্পে ছিল ভরপুর সেখানে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। এদেশে যাঁরাই ঈমান ও ইসলামের মহামূল্যবান সম্পদের অধিকারী হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন, শুধু তাঁরাই নন বরং তাঁদের সন্তান-সন্ততি---অধঃস্তন বংশধরগণ সবাই তাঁরই 'আমলনামার অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যতই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার সীমা যতই বিস্তৃত হতে থাকবে, তার ছওয়াব শায়খুল ইসলাম খাজা মু'ঈনুদ্দীন হাসান সজযী (রঃ)-এর রূহ মুবারকে ততই পেঁৗছুতে থাকবে।[১]

এভাবে ভারতবর্ষের বুকে আল্লাহ্‌র নাম যা কিছু নেওয়া হয়েছে এবং ইসলামের জন্য যা কিছু কাজ করা হয়েছে তার সবই চিশতীদের এবং তাদের একনিষ্ঠ ও উচ্চ-দৃঢ় মনোবলের অধিকারী উক্ত সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর সৎকর্মশীলতা এবং কার্যকলাপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবার যোগ্য। আর এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ উপমহাদেশে চিশতীয়া সিলসিলার দাবি ও অধিকার অত্যন্ত প্রাচীন। মাওলানা গুলাম 'আলী আযাদ ঠিকই লিখেছেন,—

"এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, চিশতীয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ ও মনীষীদের ভারতীয় উপমহাদেশের উপর চিরন্তন দাবি ও অধিকার রয়েছে।"[২]

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৪৭
২. মাআছারুল কিরাম, পৃষ্ঠা ৭

সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থের লেখকও ঠিকই বলেছেন---

"এদের (চিশতীয়া সিলসিলার মহান সাধকদের) পদধূলির বরকতেই ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এবং কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে।"[১]

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র আজমীর থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং আজমীর তার গুরুত্ব অনেকটা হারিয়ে ফেলে। খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে প্রধান খলীফা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-কে দিল্লীতে অধিষ্ঠিত করেন। আজমীরেই তিনি তাঁর বাকী জীবন ইসলামের প্রচার, ধর্মোপদেশ দান, তা'লীম ও তরবিয়ত এবং সত্যের সাধনায় নিমগ্ন থাকার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করেন। কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎসের মধ্যেই এসব প্রচার-প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের পরিণতি বা প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে এতটুকুই বলা হয়ে থাকে যে, বিরাট ও বিপুল সংখ্যক আল্লাহ্র বান্দা তাঁর হাতে ঈমান ও ইহসানের অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিল এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। আবুল ফযল 'আইন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে বলেন---

"(তিনি) আজমীরেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রদীপ শিখা উজ্জ্বলতররূপে প্রজ্বলিত করেন। তাঁর পবিত্র সত্তায় মুগ্ধ হয়ে লোকে দলে দলে ঈমানরূপ সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছিল।"[২]

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল যাবত ধর্মোপদেশ এবং ইসলামী শিক্ষার প্রচার, ইসলামের মুবাল্লিগ ও সূফী-সাধকদের তা'লিম ও তরবিয়ত এবং সত্যের অনুসরণে অত্যন্ত কায়মনে লিপ্ত থেকে ৯০ বছর বয়সে ৬২৭ হিজরীতে[৩] তিনি সেই মুহূর্তে ইন্তেকাল করেন যখন ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁর নিজ হাতে লাগানো সাধের চারাটি ফলে-ফুলে সুশোভিত এবং রাজধানী দিল্লীতে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত ও দীক্ষাপ্রাপ্ত সে যুগের মনীষী হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রঃ) ধর্মোপদেশ

১. সিয়ারুল আকতাব, পৃঃ ১০১

২. আইন-ই-আকবরী' স্যার সায়্যিদ সংস্করণ, পৃঃ ২৭০

৩. মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে তিনটি সনের উল্লেখ দেখা যায়। যেমন—৬২৭, ৬৩২ ও ৬৩৩ হিজরী। সিয়ারুল আকতাব গ্রন্থের লেখক আফতাব মুলক হিন্দ-এর মাধ্যমে মৃত্যু সন ৬৩৩ হিজরী বের করেন। খাযীনাতুল আসফিয়ার লেখক এটাকেই মৃত্যু সন হিসাবে উল্লেখ করেন।

ও হিদায়েতের কাজে অত্যন্ত সংগ্রামরত এবং কায়মনোবাক্যে নিমগ্ন। অন্যদিকে তাঁরই একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত অন্যতম খাদেম সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপকভিত্তিক প্রসারে, তার ভিত্তি সুদৃঢ়করণে, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও সৃষ্টির কল্যাণ সাধন ও প্রতিপালনে গভীরভাবে মশগুল।

খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)

খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) ক্ষুদ্র শহর আওশ[১] নামক স্থানে (মাউরাউন্নাহার) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দেড় বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। মা-ই তাঁকে লালন-পালন করেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি মকতবে ভর্তি হন এবং মাওলানা আবু হাফস আওশী (রঃ)-এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে তরীকতের এক মহান ও শ্রেষ্ঠ বুযুর্গের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ ঘটে যাঁর নেতৃত্বে তিনি আধ্যাত্মিকতার সোপান বেয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছুতে সক্ষম হন। ফকীহ্ আবুল্লায়েছ সমরকন্দী (রঃ)-এর ঐতিহাসিক ও বরকতময় মসজিদে উল্লেখযোগ্য ও খ্যাতনামা 'উলামায়ে কিরাম ও তরীকতের সাধকদের উপস্থিতিতেই তিনি খিলাফতের খেরকা লাভে ধন্য হন, অতঃপর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং স্বীয় পীর ও মুরশিদের নির্দেশ ও হিদায়েত মুতাবিক দিল্লীকেই স্থায়ী ঠিকানারূপে মনোনীত করেন যা উর্বর ও প্রসারমান ইসলামী সালতানাতের রাজধানী ছিল এবং যা একদিকে উচ্চ মনোবলসম্পন্ন মুসলিম বাদশাহদের আনুকূল্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শনে এবং জ্ঞানী-গুণীজনের মর্যাদা ও কদর দানেব ফলে—অন্যদিকে তাতারীদের হামলার ফলে 'উলামায়ে কিরাম, ভদ্র ও অভিজাত মহলের এবং বিজ্ঞ-সুধী ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ওলীয়ে কামিলদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে তখন দিল্লীতে মুসলিম জাহানের সম্পদ ও প্রতিভা স্থানান্তরিত হচ্ছিল।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ তাঁকে যথাযোগ্য কদর ও মর্যাদা দান করেন। কিন্তু তিনি শাহী দরবারের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখা পসন্দ করলেন না। সুলতানের তরফ থেকে পেশকৃত হাদিয়া-তোহফা কিংবা কোনরূপ জায়গীর ও ভূ-সম্পত্তি কবুল করা থেকেও বিরত রইলেন। প্রথমে তিনি কিলোখড়ি, পরে মালিক 'ইয্‌যুদ্দীনের মসজিদের নিকট ফকীর ও দরবেশের জীবন যাপন

১. য়াকূত মু'জামুল বুলদান নামক গ্রন্থে বলেন: আওশ ফারগানা রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রধান শহরের নাম।

শুরু করেন।[১] সুলতান বরাবরের মতই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর দরবারে হাযিরা দিতে থাকেন এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষাবধি খাজা বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর দরবারে শহরবাসী লোকজনের আনাগোনা এমনভাবে বেড়ে যায় যে, সে যুগের শায়খুল ইসলাম শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (রঃ)-এর মনেও তাঁর সম্পর্কে কিছুটা অসন্তুষ্টি ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) স্বীয় খলীফার সাথে মুলাকাতের উদ্দেশ্যে দিল্লী এলে শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরার (রঃ)—যিনি খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর অত্যন্ত পুরানো দোস্ত ছিলেন—বখতিয়ার সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করেন। এতে হযরত খাজা চিশতী (রঃ) স্বীয় ভক্ত মুরীদকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

"বাবা বখতিয়ার! এত সত্বর তুমি এত মশহূর হয়ে গেছ যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মনে তোমার সম্পর্কে ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তুমি এ জায়গা ছাড় এবং আজমীরে চলে এস। তুমি সেখানেই বসবাস করবে এবং তোমার খেদমতের জন্য আমি সব সময় প্রস্তুত থাকব।"[২]

হযরত খাজা (রঃ) এমন একটি কথা উচচারণ করলেন যা তাঁর মত উচচ ও মহান মর্যাদার অধিকারী শায়খের পক্ষেই সম্ভব—যিনি ইখলাস ও রব্বানী ভাবধারার পূর্ণতম মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। ন্যায়, সত্য ও আল্লাহ্‌র পথের যিনি পথিক, আল্লাহ্‌র এক নগণ্য সৃষ্টির অভিযোগ ও হা-হুতাশকেও যেক্ষেত্রে তিনি গুনাহ মনে করেন, সেক্ষেত্রে শায়খুল ইসলামের অসন্তুষ্টি ও অভিযোগের কথা তো বলাই বাহুল্য। উপরন্তু ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে বিশৃংখলা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করাকে তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। সূক্ষ্মতর উপায়ে আপন মুরীদকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, যদি এখানকার জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধজনেরা তোমার সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে থাকে তবে আমি তো জ্ঞাত আছি। এখানে কে খাদেম আর কে মাখদূম, কে শায়খ (পীর) আর কে মুরীদ সে প্রশ্ন অবান্তর। ওখানে (আজমীরে) তুমি মাখদূমের মত থাকবে আর আমি খাদেম হিসাবে তোমার খেদমতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব। এতে হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) সে জবাবই দিয়েছিলেন যা দেওয়া তাঁর পক্ষেই ছিল সম্ভব ও স্বাভাবিক। তিনি নিবেদন করলেন:

"মাখদূম তো বহুত দূরের কথা—আমি আপনার সামনে খাদেমের অধিকার নিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাও তো রাখি না—বসা তো আরও অসম্ভব ও অকল্পনীয়।"[৩]

১. তারীখে ফিরিশতা ৭২০ পৃঃ ২. সিয়ারুল আওলিয়া পৃঃ ৫৪ ; ৩. ঐ, পৃঃ ৫৪ ;

অবশেষে শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রঃ)-কে আজমীর গমনের নির্দেশ দেন। বিশ্বস্ত মুরীদও সাথে সাথে কোনরূপ আপত্তি ও প্রতিবাদ ছাড়াই মুরশিদের আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু যখন শহরের বাইরে পা রাখেন তখনই শায়খ হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) আপন মুরীদের অসম্ভব ও অস্বাভাবিক রকমের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি এও বুঝতে পারেন যে, এ জনপ্রিয়তা আল্লাহ্র তরফ থেকে এবং এতে প্রবৃত্তিজাত ও নিজস্ব সৃষ্টিজাত কোন বিষয়ই নেই। সুযোগ্য মুরীদ যে সমস্ত দিল্লীবাসীর মন ইতিমধ্যেই প্রেমবিমুগ্ধ ও আবেশবিহ্বল করে ফেলেছে এটা তিনি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতার ভাষায়—

"খাজা কুতুবুদ্দীন (রঃ) স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের সাথে আজমীরের দিকে রওয়ানা হন। এ সংবাদ দিল্লীবাসীদের কানে পৌঁছুতেই শহরে একটা হাঙ্গামা ও গোলযোগের উপক্রম হয়। সমস্ত শহরবাসী, এমন কি সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশও শহর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অনুগামী হন। যেখানেই খাজা কুতুবুদ্দীনের কদম মুবারক পড়ছিল সেখানকার পদস্পর্শিত ধূলিকে লোকেরা তাবাররুক ভেবে সাথে সাথেই উঠিয়ে নিচ্ছিল আর অস্থির ও বিহ্বলচিত্তে কান্নাকাটি করছিল।"[১]

একটি মাত্র মন-মানসকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং একটি সামান্যতম কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে আল্লাহ্র লাখো বান্দার মন-মানসকে ব্যথাতুর ও বেদনাক্রান্ত করে তোলা মোটেই সমীচীন ছিল না। তাই মুরশিদ আপন মুরীদকে আজমীর নিয়ে যাবার ইরাদা পরিত্যাগ করে বলেন—

"বাবা বখতিয়ার! তুমি এখানেই থাক। কেননা তোমার বাইরে যাবার কথা জেনে আল্লাহ্র এতগুলি বান্দা অত্যন্ত ব্যথাতুর ও বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আমি এটাকে জায়েয মনে করি না যে, এতগুলি লোকের অন্তর-জ্বালাকে বাড়িয়ে তুলি। যাও, এ শহরকে আমি তোমার আশ্রয়ে রেখে গেলাম।"[২]

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ যাঁর রাজধানী এমন একটি পবিত্র সত্তার উপস্থিতি ও অবস্থিতি থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছিল—উপরোক্ত ঘটনার ফলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর শুকরিয়া আদায় করেন। খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) শহরে প্রত্যাগমন করেন আর ওদিকে খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) আজমীরের পথে রওয়ানা হন।

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫৫ পৃঃ ২, আখয়ারুল আখবার, পৃঃ ২৬

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) দিল্লী ফিরে এসেই স্বীয় চাটাইয়ের আসনে বসে জোরেশোরে ধর্মীয় উপদেশ, শিক্ষা ও তদনুযায়ী বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। তিনি শুধু সরকার ও শাহী দরবারের সাথে সম্পর্কই ছিন্ন করেন নি, বরং এটাকেই জীবনের লক্ষ্য ও মূলনীতি বানিয়ে নেন। এমনকি স্বীয় সিলসিলাভুক্ত সবার জন্যই এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, দারিদ্র বরণ ও ধনাঢ্যতা বর্জনের সাথে সাথে শাহী দরবার থেকে দূরে অবস্থান করেই নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। এরূপ সংস্রবহীনতা ও বর্জন নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিশিষ্ট এবং সাধারণ—বাদশাহ এবং গরীব সকলেই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয় এবং তাঁকে কেন্দ্র করে মানুষের আনাগোনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

"সমগ্র দুনিয়া, অভিজাত-অনভিজাত, বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট সবাই ছিল তাঁর দু'আ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত ও পাগলপারা।"[১]

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ সপ্তাহে দু'বার তাঁর দরবারে হাযির হতেন এবং তাঁর কাছে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। দিল্লীতে যা তখন শুধু ভারতবর্ষের রাজধানীই ছিল না বরং মুসলিম জাহানের নবতর শক্তি, ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত ও সংস্কারের নতুন কেন্দ্র এবং বিশিষ্ট 'উলামায়ে কিরাম, শিক্ষকমণ্ডলী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অভিজাত মহল, তরীকতের পথ প্রদর্শক ও সিলসিলাভুক্ত অন্যান্য বুযুর্গ এবং ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সন্তান ও প্রতিভাধরদের সমাবেশস্থল ছিল সেখানে তরীকতের প্রচার ও প্রসার, মানুষের অন্তর-মানসকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার বাস্তব প্রশিক্ষণ এবং নবোত্থিত ইসলামী সাম্রাজ্যের সঠিক নৈতিক নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, দারিদ্র অনুসরণ, ধনাঢ্যতা বর্জনের নীতিকে এতটুকু কালিমাযুক্ত ও ধূলা-মলিন না করে আঞ্জাম দেওয়াটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। এজন প্রয়োজন ছিল পর্বতপ্রমাণ ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং বাতাসের মত ক্ষিপ্র প্রবাহমানতা যাতে কোন কিছুর গায়ে আঁচড়টিও না লাগে। হযরত খাজা সাহেব (রঃ) অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এবং সুন্দর ও সুচারুরূপে নাযুক ও কঠিন এ দায়িত্বটি আঞ্জাম দেন। এ কাজের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় পাননি। স্বীয় শায়খ ও মুরশিদ হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর পর বড় জোর

১. সিয়ারুল আওলিয়া,

চার কি পাঁচ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।[১] কিন্তু তাঁর বদৌলতে ভারতবর্ষে চিশতীয়া সিলসিলার বুনিয়াদই শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং যে সুমহান ও উচ্চ লক্ষ্যের জন্য হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র:) ভারতবর্ষকে নিজের অবস্থানস্থল ও কর্মক্ষেত্ররূপে বাছাই করেছিলেন তা অত্যন্ত সুষ্ঠুতার সাথে সার্থকতা লাভ করে।

তখন তাঁর বয়স ৫০ বছর কি তার কিছু বেশী হবে—ঐশী প্রেম ও মুহব্বতের যে হুতাশন তিনি ধৈর্য ও স্থৈর্যের ভিতর বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন এবং যে আগুন তিনি গোটা সৃষ্টির বাস্তব প্রশিক্ষণ ও হিদায়েতের মহত্তর লক্ষ্য ও কল্যাণ দ্বারা লিপিষ্ট করে রেখেছিলেন—তাই হঠাৎ করে জ্বলে উঠে—ছাপিয়ে উঠে সব কিছুর উপর।

صدائے تیغ تو آمد ببزم زندہ دلاں
کدام کہ درد ذوق این سرود نماند

একবার শায়খ 'আলী সাকাজ্জীর[২] খানকাহ্‌তে 'সামা'র' মজলিস ছিল অত্যন্ত সরগরম। এক কাওয়াল কবিতা আবৃত্তি করল:—

کشتگان خنجر تسلیم را - ہر زمان از غیب جانے دیگر است

এতে খাজা কুৎবুদ্দীনের উন্মত্ততা ও মুমূর্ষুপ্রায় অবস্থা দেখা দেয়। খানকাহ থেকে আবাসস্থল পর্যন্ত কোনক্রমে আসেন, কিন্তু মত্ততা ও বেহুঁশী অবস্থা কাটেনি। কিছুটা হুঁশ ফিরতেই তিনি কবিতাটি আবৃত্তি করতে নির্দেশ দেন। আদেশ মাত্রই তা পালন করা হয়। এভাবেই চার রাত্র-দিন একাদিক্রমে তিনি বেহুশপ্রায় অবস্থায় কাটান। কিন্তু যখনই সালাতের ওয়াক্ত এসে যেত তখনই তিনি চেতনা ফিরে পেতেন। সালাত আদায় করতেন। অতঃপর পুনরায় উক্ত কবিতা আবৃত্তির নির্দেশ দিতেন। আবৃত্তি করা হত, ফলে তিনি পুনরায় বেহুঁশী অবস্থায় চলে যেতেন। পঞ্চম রাত্রিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩] এ ঘটনা ৬৩৩ হিজরীর।[৪]

ইন্তিকালের আগে 'ঈদের দিন তিনি 'ঈদগাহ থেকে ঘরের দিকে ফিরছিলেন। পথে তাঁকে এমন একটি জায়গা অতিক্রম করতে হয় যেখানে কোন

১. যদি খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (র:)-এর মৃত্যু সন ৬২৭ হিজরী মেনেও নেয়া যায় তবে খাজা কুতুবুদ্দীন (র:) তাঁর ইন্তিকালের পর মাত্র ৬ বছর বেঁচেছিলেন।
২. কতক বর্ণনাতে 'সজযী' লিখিত পাওয়া যায়।
৩. সিয়ারুল আওলিয়া বর্ণনায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র:)।
৪. কতক বর্ণনায় ৬৩৩ হিজরীর পরিবর্তে ৬৩৪ হিজরী পাওয়া যায়।

গ্রাম কিংবা বসতি ছিল না। খাজা কুতুবুদ্দীন সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাটান। জনৈক খাদেম আরয করল, "আজ 'ঈদের দিন। উপরন্তু সবাই আপনার জন্য অপেক্ষমান, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"[১] উত্তর এলো: مرا ازیں زمین بوئے دلہا می آید "আমার এখান থেকে অন্তরের খুশবু আসছে।" পরে কোন এক সময় উক্ত যমীনের মালিককে ডেকে নিজস্ব অর্থ দ্বারা তা খরিদ করেন এবং নিজের দাফনের জন্য সে যমীনটুকুই নির্বাচন করেন। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর খলীফার সংখ্যা (যাঁদের নাম আওলিয়া' কিরামের জীবনীগ্রন্থে বিদ্যমান) নয় কিংবা দশজনের কম ছিল না। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া, হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করা, আর জারিকৃত কাজগুলি অব্যাহত রাখা, তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের পরিপূর্ণতা সাধন ও প্রসারের সৌভাগ্য হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-ই লাভ করেছিলেন।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)

যেমনিভাবে হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) ভারতবর্ষের বুকে চিশতীয়া সিলসিলার ভিত্তি স্থাপনকারী ও প্রতিষ্ঠাতা তেমনি হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর এ সিলসিলার মুজাদ্দিদ ও দ্বিতীয় আদম। তাঁরই দু'জন খলীফা সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন দেহলভী (রঃ) এবং হযরত শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলী সাবির পীরানে কলীরী (রঃ)-এর মাধ্যমে এই সিলসিলা ভারতবর্ষের বুকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এঁদের খলীফা ও সিলসিলাভুক্ত অন্যান্য লোকদের দ্বারা এখন অবধি তা সঞ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

خم و خمخانه با مهر و نشان است

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম মাস'উদ। উপাধি ছিল—ফরীদুদ্দীন। সাধারণভাবে 'গঞ্জে শকর' উপাধিতেই তিনি সারা দুনিয়ায় মশহূর হয়ে আছেন।[২] তিনি হযরত 'উমার ফারূক (রঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতামহ কাযী শু'আয়ব তাতারী হামলা ও গোলযোগের

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, বর্ণনায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) পৃষ্ঠা, ৫৫; বর্তমানে জায়গাটি হযরত কুতুবুদ্দীন (রঃ)-এর নামে প্রসিদ্ধ।

২. এ উপাধির প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত বিধায় আমরা কিছু বলতে অক্ষম।

কারণে কাবুল থেকে লাহোরে আগমন করেন। কিছুকাল কাসূর নামক স্থানেও অবস্থান করেন এবং কাহীনওয়াল শহরের কাযীর পদ ও জায়গীর প্রাপ্ত হন। এখানে ৫৬৯ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালেই তিনি মুলতান সফর করেন (যা সে-সময় ভারতবর্ষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল)। শহরের শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেন। মাওলানা মিনহাজুদ্দীন তিরমিযীর নিকট ফিকহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 'আন্নাফে' পড়েন এবং এখানেই ৫৮৪ হিজরীতে হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত লাভ ঘটে এবং পরে তাঁরই হাতে বায়'আত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেন। শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ) খাজা কাকী (রঃ)-এর ব্যক্তিত্বে ও সান্নিধ্যলাভে এতই মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন যে, শিক্ষালাভের সকল পাট চুকিয়েও তিনি স্বীয় মুরশিদের সাহচর্যে কাল কাটাবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। ওলীয়ে কামিল হযরত শায়খ (রঃ) এথেকে তাকে নিবৃত্ত করেন এবং পড়াশোনা সমাপ্ত করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করেন।[১]

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি স্বীয় শায়খ ও মুরশিদের খেদমতে দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হন। শায়খ (রঃ) তাঁর অবস্থানের জন্য গযনী দরজার সন্নিকটে একটি জায়গা নির্বাচিত করেন এবং সেখানেই তিনি রিয়াযত ও মুজাহাদায় (কঠোর আত্মিক সাধনা) নিমগ্ন হয়ে পড়েন। সলূক পরিপূর্ণতার পর তিনি খেলাফত লাভে ধন্য হন এবং শায়খ (রঃ)-এর ইজাযতে হাঁসিতে অবস্থান গ্রহণ করেন যা তাঁরই একনিষ্ঠ একজন ভক্ত (যিনি পরে তাঁরই সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফাদের মধ্যে পরিগণিত হন) শায়খ জামালুদ্দীন খতীবে হাঁসির আবাসভূমি ছিল। শায়খের ইন্তিকালের মুহূর্তে তিনি হাঁসিতে ছিলেন। ইন্তিকালের তৃতীয় দিনে তিনি দিল্লীতে আসেন। শায়খ (রঃ)-এর মাযারে ফাতেহা পড়েন। কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরী (রঃ) শায়খ খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর ওসিয়ত মুতাবিক তাঁর প্রদত্ত খিরকা ও অন্যান্য আমানত তাঁকে সোপর্দ করেন। এটা ছিল খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-কে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যাবার

১. রাহাতুল কুলুব নামক গ্রন্থে---যা তাঁরই সকল মালফুজাতের সংকলন এ সফরের ও অন্যান্য ভ্রমণের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। যেহেতু উক্ত কিতাব নির্ভরযোগ নয় বিধায় তার উপর নির্ভর করা হয় নি। অপর কোন কোন পুস্তকে আরও বিস্তারিত মিলবে।

সুস্পষ্ট ইংগিত। দু'রাকআত সালাত আদায় করে তিনি খিরকা পরিধান করেন এবং স্বীয় শায়খ খাজা কাকী (রঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন।

দিল্লী আসার এবং শায়খ হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন কাকী (রঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হবার তৃতীয় দিনে সরহিঙ্গা নামীয় তাঁরই একজন পুরনো বন্ধু ও ভক্ত হযরত গঞ্জে শকর (রঃ)-কে দেখার প্রবল আগ্রহে দিল্লী আসেন। খাদেমরা তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়; ভক্ত ও খাদেমদের ভীড়ে উক্ত দরবেশ শায়খ (রঃ)-এর মুলাকাতের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হন। অগত্যা অপেক্ষায় থাকেন কবে তিনি বাইরে আসেন। একদিন হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (রঃ) বেরিয়ে আসতেই দরবেশ তাঁর পায়ের উপর পড়ে যান এবং কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, "যতদিন আপনি হাঁসিতে ছিলেন ততদিন অতি সহজেই এবং বিনা বাধায় আপনার সাক্ষাত লাভে ধন্য হ'তাম। এখানে আমাদের মত গরীবদের পক্ষে আপনার সাক্ষাত লাভ মোটেই সম্ভব নয়।" শায়খ (রঃ) একথায় অত্যন্ত ব্যথা পান এবং বুঝতে পারেন যে, দিল্লীতে থেকে তাঁর নিজের আন্তরিক শান্তি লাভের এবং সর্বসাধারণ ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে তাঁর দেখা-সাক্ষাত লাভের অবাধ সুযোগ নেই। তিনি তখনই বন্ধু-বান্ধবদের বললেন, "আমি হাঁসি যাব।" উপস্থিত সবাই আরয করল, "শায়খ কুত্‌বুদ্দীন (রঃ) তো আপনাকে এখানেই বসিয়ে গেছেন। এখন আপনি আবার কোথায় যাবেন?" উত্তরে হযরত ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ) জানান, "শায়খ (রঃ) তাঁর আমানত সোপর্দ করে দিয়েছেন। এখন আমি শহরে থাকি আর প্রান্তরে কিংবা জঙ্গলে যাই—তা আমার সাথেই থাকবে।"[১]

আবাসস্থল হিসাবে হাঁসিকে তিনি বেছে নেন যেন শান্তিতে থাকতে পারেন এবং থাকতে পারেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। এখানেও খাজা কুত্‌বুদ্দীন (রঃ)-এর একজন মুরীদ মাওলানা নূর তুর্কের কারণে [যিনি হাঁসির অধিবাসীদেরকে তাঁর (হযরত গঞ্জে শকরের) মর্তবা ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করিয়ে দেন] তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং এতে বিপুল জনসমাগম হতে থাকে। অবশেষে তিনি তাঁর পুরনো আবাসস্থল কাহীনওয়ালে গমন করেন। কাহীনওয়াল ছিল মুলতানের সন্নিকটে। তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদার কথা দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে গেছে তখন। তিনি আজুদহনকে[২] অবস্থানস্থল

১. সিয়ারুল আওলিয়া. পৃষ্ঠা ৭২

২. আজুদহনকে বর্তমানে পাকপত্তন বলা হয়। বর্তমানে এটি মন্টোগোমারী জেলার একটি ছোট শহর (পাকিস্তান)।

হিসাবে নির্বাচন করেন এবং বলেন, যেহেতু আজুদহনের অধিবাসীবৃন্দ জাহিল ও অজ্ঞ এবং জায়গাটিও অখ্যাত ও অপরিচিত তাই এখানে ঝামেলা কম হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছুবার স্বল্পকালের ভেতরই তিনি মশহূর হয়ে ওঠেন এবং চতুর্দিক থেকে লোকের ভীড় বাড়তে শুরু করে। হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর খ্যাতি ও মর্যাদার সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগনে এবং তার আলোকচ্ছটা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত। অল্পদিনের ভেতরেই লোক সমাগম বেড়ে যায় এবং আগত লোকের আনাগোনা বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে। ফলে অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা খোলা থাকত।

এখানে অবস্থানকালে বেশ কিছুদিন টানাপোড়েন, দুঃখ-কষ্ট ও কঠোর দারিদ্র দশায় তাঁর জীবন কাটে। পীলু গাছের ফল ছিঁড়ে আনা হ'ত এবং এতে কিছু লবণ ছিটিয়ে তাই গরীব জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হ'ত, আর নিজেও মেহমান ও সমস্ত খাদেমদের নিয়ে তাই খেতেন। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও নির্ভরশীলতার অবস্থা এমনি ছিল যে, একবার তিনি সিয়াম শেষে ইফতারের উদ্দেশ্যে এক লোকমা মুখে উঠিয়েই বললেন, এর ভেতর নীতিহীনতার গন্ধ পাচ্ছি। খাদেম উত্তরে জানায়, লবণ ছিল না। তাই একটু লবণ ধার নিয়ে এতে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তুমি নীতিহীন কাজ করেছ, আমার জন্য এরূপ খাবার শোভা পায় না।[১] কিছু কাল পর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, রাত-দিন চুলা জ্বলতে থাকত এবং অর্ধেক রাত অবধি খানাপিনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকত। সেখানে যেই আসত সেই তার খাবার প্রস্তুত পেত।[২] তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা ও অন্তরের প্রীতি সবার প্রতিই ছিল একরকম। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বলেন, আশ্চর্য ছিল তাঁর শক্তি, আর এমন আশ্চর্য ছিল তাঁর জীবন-ধারণ পদ্ধতি, যা বরদাশত করা অন্য কারো পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। তিনি নবাগত এবং বহু বছর যাবত পরিচিত ও একান্ত সান্নিধ্যে বসবাসকারী সবার সাথে একই রূপ খোশমিযাজ, দয়া, প্রীতি ও একাগ্রতার সাথে মিশতেন। মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক বলেন, তাঁর ব্যক্তিগত খাদেম আমিই ছিলাম। তিনি যা বলতেন, আমাকেই বলতেন। তাঁর ঘরে-বাইরে তথা সদরে-অন্দরে ছিল একই অবস্থা। তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের মাঝে কোন বিরোধ বা পার্থক্য ছিল

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃঃ ৬৬,

২. ঐ, পৃঃ ৬৪

না। বছরের পর বছর তাঁর খেদমত ও সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর-বিরোধিতা লক্ষ্য করিনি।[১]

একবার সুলতান নাসীরুদ্দীন মাহমূদ সমগ্র সেনাবাহিনী সমেত আউচ এবং মুলতান সফরে আসেন এবং খাজা (রঃ)-এর দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে আজুদহনে হাযির হন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেন, "ভীড় ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অবশেষে খাদেমকূল একটি কৌশল অবলম্বন করল। হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর একটি পিরহান (জামা) এর আস্তিন প্রাসাদের বাইরে টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল। সেনাবাহিনী আসত এবং তাতে চুমু দিয়ে চলে যেত। শেষ পর্যন্ত আস্তিন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি মসজিদে তশরীফ রাখেন এবং খাদেম-বৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার চারিপাশে বেষ্টনী তৈরি কর যেন কোন দর্শনপ্রার্থী এর ভেতর না আসতে পারে। লোকেরা আসত এবং বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যেত। আকস্মিকভাবে একজন বৃদ্ধ ফরাশ বেষ্টনী ভেদ করে ভেতরে এসে পড়ে এবং শায়খ (রঃ)-এর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। সে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় এবং বলে, শায়খ ফরীদ! শ্রান্ত হয়ে গেছ। আল্লাহ পাকের দেওয়া এ পুরস্কারের আরও বেশী শুকরিয়া আদায় কর। শায়খ (রঃ) একথা শুনে জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ওঠেন এবং উক্ত ফরাশকে অত্যন্ত খাতির সম্মান করেন।[২]

সুলতান নাসীরুদ্দীন নিজেই শায়খ (রঃ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার সংকল্প নেন। সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি গিয়াছুদ্দীন বুলবন যিনি সুলতানের সাথেই ছিলেন, আরয করলেন: সাথে বিরাট সৈন্যবাহিনী, আর এদিকে আজুদহন পানি ও ঘাস-পাতাহীন শুষ্ক ও রুক্ষ্ম জায়গা। আপনার নির্দেশ হলে এ বান্দাহ্ নিজে গিয়ে জাহাঁপনার পক্ষ থেকে 'উযরখাহী করে আসতাম ও হাদিয়া-তুহ্ফা পেশ করতাম। অতঃপর কিছু নগদ অর্থ ও চারটি গ্রাম জায়গীর প্রদানের শাহী ফরমান নিয়ে বুলবন খাজা (রঃ)-এর দরবারে হাযির হন এবং অর্থ ও ফরমান শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর সামনে পেশ করেন। তখন শায়খ (রঃ) বলেন, "এটা কি?" গিয়াছুদ্দীন বুলবন জানান, এতে কিছু নগদ অর্থ-কড়ি আর তার সাথে হুযুরকে প্রদত্ত জায়গীরের শাহী ফরমান।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৬৫
২. ঐ, পৃঃ ৭৯

শায়খ (রঃ) মুচকি হেসে উত্তর দেন, "নগদ টাকা-কড়ি আমাকে দিয়ে যাও, আর শাহী ফরমান ফিরিয়ে নাও। ওর গ্রাহক অনেক মিলবে।" একথা বলেই তিনি নগদ টাকা-কড়ি তখনই উপস্থিত দরবেশদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।[১]

সুলতান গিয়াছুদ্দীন বুলবন হযরত শায়খ (রঃ)-এর সাথে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। দিল্লীর সালতানাত লাভ করাকেও তিনি হযরত (রঃ)-এর দু'আ', প্রেম ও আন্তরিক মুহব্বতের পরিণতি মনে করতেন এবং তাঁর খাদেমবৃন্দের খেদমত করাকেও তিনি নিজের জন্য পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করতেন। হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ) একবার এক ব্যক্তির অনুরোধ উপরোধে একান্ত বাধ্য হয়ে বাদশাহ্‌র নিকট তার সম্পর্কে একটি সুপারিশ পত্র লিখে দেন যা একই সাথে সুপারিশ ও অমুখাপেক্ষিতার আশ্চর্য এক সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ছিল। তিনি লিখেন ঃ

"আমি এ ব্যক্তির বিষয় আল্লাহ্ পাক এবং পরে আপনার সামনে পেশ করছি। যদি আপনি তাকে কিছু দেন তবে আল্লাহ পাকই প্রকৃত দাতা হবেন আর আপনি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। আর যদি না দেন তবে তাতেও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাই প্রকাশ পাবে—, সেক্ষেত্রে আপনি আপনার অসমর্থতার কারণে দায়ী হবেন না।"[২]

হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ) সমসাময়িককালের খ্যাতনামা ওলীয়ে কামিল ও অন্যান্য সিলসিলার প্রবীণ বুযুর্গদের সাথেও বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি তাঁদের মর্তবা ও মর্যাদার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (রঃ) যিনি সুহরাওয়ারদিয়া তরীকার খ্যাতনামা মুরশিদ এবং ভারতবর্ষের অন্যতম প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা ও মুবাল্লিগ —তাঁরই সমসাময়িককালের—সম্ভবত সমবয়সী ছিলেন।[৩] উভয়ের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও খোলামেলা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হ'ত। হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ) শায়খ বাহাউদ্দীন (রঃ)-কে শায়খুল ইসলাম উপাধিতে সম্বোধন করতেন। উভয়ের খলীফা ও মুরীদবর্গও নিজেরা গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হতেন। তাঁরা একে অপরের সম্মান

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা, ৭৯,৮০;

২. আখবারুল আখয়ার—আসল চিঠি অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষায় লিখিত।

৩. শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রঃ)-এর জন্ম ৫৬৬ হিজরীতে এবং শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর জন্ম ৫৬৯ হিজরীতে।

ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। শায়খুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া মুলতানী (রঃ)-এর পৌত্র শায়খ রুকনুদ্দীন আবুল ফাত্হ (রঃ) এবং শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর খলীফা সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর ভেতর বিরাট হৃদ্যতা ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (রঃ)-এর জীবনের প্রকৃত ও আসল সম্পদ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর বিপুল আগ্রহ ও আবেগ, ঐশী প্রেমে মত্ততা ও আল্লাহ্‌রই জন্য পাগলপারাপ্রায় অবস্থা। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, শায়খুল কবীর হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ) নিজস্ব হুজরায় (কামরা) ছিলেন। মাথা ছিল উন্মুক্ত আর চেহারা ছিল পরিবর্তিত। হুজরার মধ্যে পাগলের মত তিনি পায়চারী করছিলেন আর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন:

خواهم که همیشه در وفائے تو زیم - خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم

مقصود من خسته زکونین توئی - از بهر تو میرم از برائے تو زیم

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা যে সর্বদাই তোমার হয়েই আমি বেঁচে থাকি,—মাটিতে মিশে যাই। তোমারই পায়ের তলায় আমি জীবন কাটিয়ে দেই। আমার মত নিঃস্ব ও সর্বহারার ইহকালে ও পরকালে একমাত্র কাম্য তুমিই। তোমারই জন্য বেঁচে থাকি আর তোমারই জন্য মারা যাই।

এই কবিতা আবৃত্তির পর তিনি সিজদাবনত হয়ে মাটিতে মাথা রাখছিলেন। অতঃপর আবার এই কবিতাই আবৃত্তি করছিলেন এবং কামরার মধ্যে চতুর্দিকে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। এভাবে তিনি বার বার সিজদায় পড়তেন এবং বহুক্ষণ ঐ অবস্থায়ই কেটে যেত।[১]

আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতিতে তিনি সব সময় কাঁদতেন। কখনও উপদেশপূর্ণ কথা শুনলে কিংবা মর্মস্পর্শী বর্ণনা কানে এলে অথবা তার সামনে প্রেমোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করা হলে কিংবা কোন বুযুর্গের কোন প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা শুনলে তিনি বে-এখতিয়ার কেঁদে ফেলতেন। কোন সময় অবিরাম কাঁদতে থাকতেন। সর্বদাই সিয়াম পালন করতেন। পবিত্র কুরআনুল করীম হেফজ এবং তেলাওয়াতের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং এ দু'টির (সিয়াম ও কুরআন

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া,

হেফজ) জন্য খাস খলীফা ও বিশেষ বিশেষ মুরীদকে ওসিয়ত করতেন ও তাকিদ দিতেন।[১] তিনি সামা'র (এক প্রকার প্রেম ও ভক্তিমূলক গযল) প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কেউ বলেছিলেন, সামা'র বৈধতা নিয়ে 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তাতে তিনি বলেন:

سبحان الله ! یکے سوخت و خاکستر شد دیگرے ہنوز در اختلاف است

"সুবহানাল্লাহ। একজন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর তারা এখনও মতভেদেই লিপ্ত রইল।"[২]

তাঁর সারা জীবনের নীতি ছিল—ধনী ও ক্ষমতাসীনদের থেকে দূরে অবস্থান, নিজের অবস্থা গোপন রাখা এবং দরবেশী জীবন যাপন করা। স্বীয় প্রবীণ বুযুর্গদের রীতি-নীতি ও চলন-পদ্ধতি আয়ত্ত করে এবং সেগুলির মধ্যে ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার হেফাজত তথা তরীকার প্রচার ও প্রসারের গোপন রহস্য নিহিত আছে জেনে তিনি তার উপরই শক্ত ও সুদৃঢ়ভাবে কায়েম ছিলেন। আপন তরীকতের (তরীকতে চিশতিয়া) একজন ভাই হযরত শায়খ বদরুদ্দীন গযনভী (রঃ) [যিনি ছিলেন হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর শ্রেষ্ঠ খলীফাদের অন্যতম] সাম্রাজ্যের কিছু অমাত্যবর্গের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তারা শায়খ গযনভী (রঃ)-এর জন্য দিল্লীতে একটি খানকাহ তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে তাঁর খেদমতও করতেন। বিপ্লবাত্মক রূযী-রোযগারের কারণে যখন তিনি শাহী আমীরের রোষানলে পড়েন তখন তাঁকে বেশ দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। তিনি এই দুর্দশা থেকে উদ্ধারের আশায় শায়খুল কবীর হযরত গঞ্জে শকর (রঃ)-এর নিকট দু'আ' প্রার্থী হলে তিনি জবাবে লিখেছিলেন,

"যে ব্যক্তি নিজস্ব পদ্ধতিতে চলতে চাইবে সে অবশ্যই এমন অবস্থায় পতিত হবে যেখানে সে সর্বদা অস্থির ও পেরেশান থাকবে। আপনি তো পীরানে পাক হযরত খাজা কাকী (রঃ)-এর ভক্তদের অন্যতম। অতএব তাঁর তরীকা ও পদ্ধতির পরিপন্থী খানকাহ্ কেনই-বা নির্মাণ করলেন আর কেনই-বা সেখানে অধিষ্ঠিত হলেন? হযরত খাজা কুত্‌বুদ্দীন (রঃ) এবং হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর তরীকা ও জীবন পদ্ধতিতে এটা ছিল না যে, নিজের জন্য

১. সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর জীবনী দ্রষ্টব্য
২. সিয়ারুল আওলিয়া

খানকাহ্ নির্মাণ করে দোকান সাজাবেন। তাঁদের আদর্শ ও নীতিই ছিল নাম-নিশানাহীন নির্জন বাস।"[১]

এই স্বভাবগত ঝোঁক ও প্রবণতার কারণে এবং সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভীড় ও আনাগোনার ফলে ইন্তিকালের পূর্বে পুনরায় তাঁর জীবনে অভাব-অভিযোগ ও টানাপোড়েন দেখা দেয়। সিয়ারুল আওলিয়া পুস্তকে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) বলেন —

"শুয়ূখুল 'আলম হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ) শেষ বয়সে ইন্তিকালের সন্নিকট সময়ে খুবই আর্থিক অনটনের ভেতর ছিলেন। আমি রমযান মাসে তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এত অল্প পরিমাণ খাবার আসত যে, তা উপস্থিত লোকদের জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। সে সময় কোন রাত্রিতেই আমি পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পাইনি। খাদ্য-সামগ্রী যা দেখা যেত তা ছিল নিতান্তই সামান্য ও মামুলী ধরনের। আমি রওয়ানা হবার প্রাক্কালে হযরত শায়খ (রঃ) আমাকে একটি সুলতানী (সম্ভবত সে যুগের প্রচলিত মুদ্রা) পথ খরচের জন্য দিলেন। ঐ দিনই মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাকের মাধ্যমে নির্দেশ পেলাম—আজ অবস্থান কর, কাল যেও। ইফতার মুহূর্তে হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। আমি জানতে পেরেই তৎক্ষণাৎ শায়খ (রঃ)-এর খেদমতে যাই এবং আরয করি যে, হুযুরের দরবার থেকে আমাকে একটি সুলতানী দেওয়া হয়েছিল। যদি অনুমতি পাই তবে তা দিয়ে কিছু খানা-পিনার ইন্তিজাম করতে পারি। হযরত অনুমতি দেন এবং আমার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ' করেন।"[২]

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর বর্ণনা থেকে ইন্তিকালের অবস্থা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন :

"মুহাররাম মাসের পাঁচ তারিখে অসুখ অত্যন্ত বেড়ে যায়। 'ইশার সালাত জামাতেই আদায় করেন। সালাতের পর তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে পেলে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি 'ইশার সালাত আদায় করেছি ?' সবাই বলল, 'হাঁ !' তিনি বলেন, 'দ্বিতীয়বার পড়ি। জানি না কখন কি হয়।' তিনি দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করেন এবং এরপর আবারও বেহুঁশ হয়ে যান। এবার বেহুঁশী অবস্থা ছিল দীর্ঘক্ষণ। হুঁশ ফেরার পর

---

১. সিয়ারুল 'আরিফীন. পৃষ্ঠা, ৮৫ ; বযমে সূফীয়া থেকে গৃহীত।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৬৬।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি সালাত আদায় করেছি?' জানানো হ'ল, 'হাঁ! আপনি ইতিমধ্যেই তা দু'বার আদায় করেছেন।' তখন তিনি উত্তরে বললেন, 'আরও একবার আদায় করি। কে জানে কখন কি হয়?' এরপর তিনি তৃতীয় দফা সালাত আদায় করেন। অতঃপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।"[১]

ইন্তিকালের তারিখ ছিল ৫ই মুহাররাম, মঙ্গলবার, হিজরী ৬৬৪।[২] আজুদহনে (পাক পত্তনে) তাঁকে দাফন করা হয়। পরে সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক তাঁর কবরের উপর গুম্বজ নির্মাণ করে দেন।

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ) পাঁচজন পুত্র সন্তান ও তিনজন কন্যা রেখে যান। পুত্রদের নাম যথাক্রমে শায়খ নাসরুদ্দীন নাসরুল্লাহ্, শায়খ শিহাবুদ্দীন, শায়খ বদরুদ্দীন সুলায়মান, খাজা নিজামুদ্দীন ও শায়খ য়া'কুব। কন্যাত্রয় হলেন বিবি মাসতূরা, বিবি ফাতিমা ও বিবি শরীফা।

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর ওফাতের পর তৃতীয় পুত্র শায়খ বদরুদ্দীন সুলায়মান (রঃ) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁরই পুত্র সাজ্জাদানশীন শায়খ 'আলাউদ্দীন আজুদহনী (রঃ) পবিত্রতা ও খোদাভীরুতার দিক দিয়ে অত্যন্ত মশহূর ছিলেন। মুহাম্মাদ তুগলকও তাঁর মুরীদ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।[৩] আল্লাহ পাক রূহানী সিলসিলার ন্যায় হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশাবলীর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বরকত দান করেন। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে তাঁর বংশধরগণ ছড়িয়ে আছেন। সাধারণভাবে তাঁরা ফরীদী নামে খ্যাত।

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৮৯।

২. সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা কতিপয় স্থানে ৬৬৯ হিজরীর এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যা হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর জীবনী সম্পর্কিত। কতক জায়গায় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর লিখিত বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, "হযরত খাজা (রঃ) আমাকে এটা বলেছেন,—এটার জন্য হেদায়াত করেছেন।" যদি ঐ সব সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করা হয় তবে ৬৬৪ হিজরী মৃত্যু তারিখ যা সাধারণভাবে মশহূর ও অধিকাংশ কিতাবেই উল্লিখিত ও বর্ণিত—তা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে এবং মেনে নিতে হয় যে, হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর ওফাত এর পরে হয়েছিল। অন্যান্য পুস্তকে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অনুমান করা চলে যে, হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর ওফাত ৬৭০ হিজরীতে হয়েছিল যা খাযীনাতুল আসফিয়া ও তাযকিরাতুল 'আশিকীন নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে পেশ করা হয়েছে।

৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা—১৯৬;

হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর পাঁচজন খলীফার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। এঁরা হলেনঃ শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসুবী (রঃ), শায়খ বদরুদ্দীন ইসহাক (রঃ), শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ), শায়খ 'আলী আহমাদ সাবির (রঃ) এবং শায়খ 'আরিফ (রঃ)।

শায়খ জামালুদ্দীন (আহমাদ বিন মুহাম্মাদ) খতীব হাঁসুবী (রঃ) হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত খলীফা ছিলেন। তাঁরই খাতিরে তিনি সুদীর্ঘ ১২ বছর যাবত হাঁসিতে অবস্থান করেন। যখনই তিনি কাউকে খিলাফতনামা লিখে দিতেন, তখনই বলতেন, "যাও, হাঁসিতে গিয়ে শায়খ জামালুদ্দীনকে দেখিয়ে নেবে।" যদি শায়খ জামালুদ্দীন খিলাফতনামা কবুল করে নিতেন তবে তিনিও কবুল করতেন। শায়খ জামাল নামঞ্জুর করলে তিনিও নামঞ্জুর করতেন এবং বলতেন, "জামালের ছেঁড়া জিনিস সেলাইয়ের অযোগ্য।" তিনি প্রায়ই বলতেন, "জামাল আমার সৌন্দর্য।"[১]

শায়খ জামালুদ্দীন স্বীয় শায়খ (রঃ)-এর জীবদ্দশায় ৬৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। শায়খ কুতুবুদ্দীন মুনাওয়ার [হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর প্রিয় খলীফা] তাঁরই পৌত্র।

শায়খ বদরুদ্দীন বিন ইসহাক বিন 'আলী (রঃ) বুখারার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ)-এর খলীফা, খাদেম এবং জামাতা ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন স্বীয় শায়খ (রঃ)-এর শিক্ষা ও সাহচর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। চোখ থাকত সর্বদাই অশ্রুভেজা। প্রায়ই কাঁদতেন, যার ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, "আপনি যদি কান্না সংযত করেন তাহলে আপনার ব্যবহারের জন্য আমি সুরমা বানিয়ে দেব।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "চোখের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।" তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্‌র পথে অব্যাহত প্রয়াস ও নিরলস সাধনা দেখে শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠত। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাধর ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। বহু দিন তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মু'ইয্যিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বুখারা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ফারসী ও আরবী ভাষায় এমত পরিমাণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, অবলীলাক্রমে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। পঠিত ও শিক্ষনীয়

১. নুযহাতুল খাওয়াতির; সিয়ারুল আওলিয়া ও আখবারুল আখয়ার প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

অধ্যায়কে পদ্যে ঢেলে সাজাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। 'কিতাবুস্‌সরফের' সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁর পদ্যে লিখিত একখানা পুস্তকও পাওয়া যায়। খাজা মুহাম্মাদ ইমাম এবং খাজা মুহাম্মাদ মূসা—যাঁরা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর সালাতের ইমাম—হযরত শায়খ বদরুদ্দীন বিন ইসহাকেরই সাহেবযাদা ছিলেন। ৬৯০ হিজরীর ৬ই জমাদিউছ্‌ছানী তাঁর ওফাত হয়।[১]

শায়খ 'আরিফকে হযরত খাজা শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ) খিলাফত প্রদান করে সিবিস্তান পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি এ খিলাফতনামা স্বীয় শায়খ (রঃ)-কে এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, এ বড় নাযুক দায়িত্ব। তিনি এতবড় দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নন। শায়খ (রঃ)-এর দু'আ' ও অনুগ্রহই তাঁর জন্য যথেষ্ট। অতঃপর শায়খ (রঃ)-এর ইজাযত নিয়ে হজ্জ-পর্ব সমাধা করবার নিয়তে তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফ রওয়ানা হন। পরে সেখান থেকে আর ফিরে আসেন নি।[২]

শায়খ-ই-কবীর 'আলাউদ্দীন 'আলী বিন আহমাদ সাবির ইসরাইল বংশীয় ছিলেন। নির্জনবাস এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী লাভের উদ্দেশ্যে দুরূহ সাধনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। পীরান কলীর নামক স্থানে 'ইবাদত, জন-সেবা এবং আত্মোন্নতির ভেতর মশগুল থেকে ১৩ই রবিউল আওয়াল ৬৮১ হিজরী অথবা ৬৯০ হিজরীতে তিনি ওফাত পান। হযরত শায়খ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথী এঁরই খলীফা ছিলেন।[৩]

---

১. নুযহাতুল খাওয়াতির।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৮৪ ও ১৮৫ পৃষ্ঠা

৩. নুযহাতুল খাওয়াতির। আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, শায়খ 'আলী আহমাদ সাবিরের অবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক বর্ণনা ও ইতিহাস নীরব। সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে আমীর খোরদ তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলেন যে, শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) সন্দেহ পোষণ করেন যে, এটা হযরত শায়খ 'আলী আহমাদ সাবির পীরান কলীরীর বর্ণনা অথবা এ নামেরই অপর কোন বুযুর্গ ব্যক্তির বর্ণনা। আমীর খোরদ বলেন:

'অধম নিজ ওয়ালিদ (রঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছে যে, একজন উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন দরবেশ ছিলেন যাঁকে 'আলী আহমাদ সাবির বলা হ'ত। তিনি দরবেশীতে অটল ও মযবুত, নিসবত ও প্রভাবসম্পন্ন এবং ডিগ্রী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ)-এর মুরীদ ছিলেন এবং তিনি তাঁকে বায়'আত গ্রহণের ইজাযতও দিয়ে রেখেছিলেন।

সমসাময়িক কিংবা নিকটবর্তীকালের বর্ণনায় তাঁদের বর্ণনা থাকুক আর নাই থাকুক কিংবা ছিটেফোঁটা ও সংক্ষিপ্ত থাকুক তাঁদের সিলসিলার মহান বুযুর্গগণের অবস্থাদি, উচ্চ মর্যাদা,

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন (রঃ) চিশতিয়া সিলসিলার প্রথম বুযুর্গ যাঁর প্রভাব-বলয় ও প্রতিপত্তি নিজের জীবদ্দশায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং যিনি ভারতবর্ষের ইসলামী সমাজ জীবনকেও বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত করেন। রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ ও দরিদ্রের পর্ণ কুটিরের জীবন পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি নিজেকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলেন। তিনি ভারতবর্ষের বুকে তরীকতের প্রথম শায়খ ও আধ্যাত্মিকতার পথপ্রদর্শক (মুরশিদ) যাঁর সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী পাওয়া যায়। অপরদিকে তাঁর পীর ও মুরশিদগণ লিখিত কোন কিছুই রেখে যান নি। তাঁদের খলীফাবর্গও স্বীয় পীর ও মুরশিদগণের মালফুজাত ও জীবনের ঘটনা ও অবস্থাদি না সংগ্রহ করেছেন, আর না তাঁরা স্বীয় শায়খ ও মুরশিদগণের মালফুজাত ও জীবনীর

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে আসন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের এই সিলসিলার জনপ্রিয়তার উপর ঐকমত্য এবং সারা দুনিয়ায় এর ফয়েয ও বরকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সাক্ষী যে, এই সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা অত্যন্ত উচ্চ মকাম, উচ্চ নিসবতের অধিকারী, অধিকন্তু আল্লাহ পাকের নিকট মকবূল ও প্রিয় বান্দাহরূপে গৃহীত। ইতিহাসের সাক্ষ্যও এর থেকে বড় হতে পারে না। এটাই ইতিহাসের প্রথম অসতর্কতা ও ভুল নয়। প্রাচীনকালে বহু কামিল ব্যক্তি এমনও অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন যাঁরা ইতিহাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে গেছেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছেন।

এই সিলসিলায় (সাবিরীয়া চিশতীয়া) বড় বড় ও বিরাট মাশায়িখ, 'আরিফ, মুহাক্কিক ও সংস্কারক জন্মেছেন। যেমন:—হযরত মাখদূম আহমাদ 'আবদুল হক রাদূলভী (রঃ) যাঁর পবিত্র বরকতময় সত্ত্বাকে কতক পণ্ডিত ও বিজ্ঞজন নবম শতাবদীর মুজাদ্দিদ হিসেবে গণ্য করেছেন, হযরত শায়খ 'আবদুল কুদ্দুস গংগুহী (রঃ), হযরত শায়খ মুহিব্বুল্লাহ ইলাহাবাদী (রঃ), শায়খুল 'আরব ওয়াল 'আজম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ), কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী (রঃ), কাসিমুল 'উলুম হযরত মাওলানা কাসিম নানূতবী (রঃ) (যিনি দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন), হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রঃ), হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রঃ), হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রঃ), হযরত শায়খ 'আবদুর রহীম রায়পুরী (রঃ), হযরত মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী (রঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস কানদেহলভী (রঃ), শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কানদেহলভী (রঃ) প্রমুখ। আমাদের এযুগেও আল্লাহ তায়ালা এই সিলসিলা দ্বারা দীন ইসলামের হেফাজত ও বিশ্বব্যাপী রেনেসাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। এ মুহূর্তে সবচেয়ে ব্যাপক ও কার্যকরী এই সিলসিলা জোর-দারভাবে সক্রিয়। দারুল 'উলুম দেওবন্দ এবং মাজাহিরুল 'উলুম সাহারানপুরের তা'লিমী খিদমত, মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (রঃ)-এর লেখনী ও মাওয়া'ইজ গ্রন্থসমূহ ও সর্বশেষে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (রঃ)-এর দাওয়াত ও তাবলিগী আন্দোলন অভিযানের দ্বারা এই সিলসিলার ফয়েয দুনিয়াব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। অধ্যাপক খালীক আহমদ

সংকলন তৈরি করেছেন।[১] কিন্তু তাঁর মালফুজাত ও জীবনী সংকলিত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্র দু'টো মূল্যবান, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উৎস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ—আমীর হাসান 'আলা সজযী (মৃত্যু ৭৩৭ হিজরী) এটি রচনা করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) এর প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা শুনেছেন এবং এর সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। তাঁর সাথী ও খাদেমবৃন্দও এর বিশুদ্ধতাকে সাধারণভাবে স্বীকার করেছেন এবং একে জীবনের ওসীলা ও তাবিযরূপে গ্রহণ করেছেন।[২] দ্বিতীয়, সিয়ারুল আওলিয়া ; আমীর খোরদ সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুবারক 'আলভী কিরমানী (মৃত্যু ৭৭০ হিজরী) এটি রচনা করেন। আমীর খোরদ খোরদসালগীতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর হাতে বায়'আত হন এবং তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। এরপর হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লীর হাতে বায়'আত হন। তাঁর পিতা নূরুদ্দীন মুবারক বিন সায়্যিদ মুহাম্মাদ কিরমানী (মৃত্যু ৭৪৯ হিজরী) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর পুরনো বন্ধু ও একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এ কিতাবের

নিজামী তারীখে মাশায়িখে চিশত (চিশতীয়া তরীকার মহান বুযুর্গদের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে বলেন :

"বিগত শতাব্দীগুলিতে কোন বুযুর্গই চিশতীয়া সিলসিলার সংস্কারমূলক মৌলিক নীতিগুলি এমনভাবে চুষে নিতে সক্ষম হননি যেমনটি মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস (রঃ) সক্ষম হয়েছেন।" (২৩৪ পৃঃ)

আজও রায়পুরে হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির সাহেবের খানকাহ চিশতীয়া সিলসিলার প্রাচীন খানকাহগুলির একাগ্রতা, কর্মতৎপরতা, আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্নতা, প্রেম ও প্রীতির ও ব্যথা-বেদনার কর্ম কোলাহলের স্মৃতিকেই জীবন্ত করে তোলে। আফসোস যে হযরত মাওলানা 'আবদুল কাদির সাহেবের ওফাতের পর এ খানকাহটিও প্রাচীন অবলুপ্ত খানকাহ-গুলির তালিকায় স্থান পেয়েছে। "আল্লাহ ব্যতীত প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল।"—আল-কুরআন।

১. হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর মালফুজাত—খায়রুল মাজালিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার হযরত পীর ও মুরশিদ জনাব সুলতানুল আওলিয়া কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহুল 'আযীয বলেন,—আমি কোন কিতাব প্রণয়ন করি নাই এজন্যই যে, খিদমতে শায়খুল ইসলাম হযরত ফরীদুদ্দীন (রঃ), শায়খুল ইসলাম হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) এবং বাকী অন্যান্য চিশতীয়া তরীকার বুযুর্গগণ যাঁরা আমাদের শেজরার অন্তর্গত—কেহই কোন কিতাব প্রণয়ন করেন নাই। খায়রুল মাজালিস-এর অনুবাদ সিরাজুল মাজালিসের ৩৫ পৃষ্ঠা ;

২. এতে ৩রা শা'বান ৭০৭ হিজরী থেকে ৯ই শা'বান ৭২০ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন মজলিসের মালফুজাত সংকলিত হয়েছে।

অধিকাংশ বর্ণনা তাঁর থেকেই নেওয়া হয়েছে। স্বীয় শায়খ হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর থেকে শোনা বহু বর্ণনাও এতে লিপিবদ্ধ করেছেন। নিজের চোখে দেখা অবস্থাদি ও নিজ কানে শোনা মালফুজাতও এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর জীবন ও ঘটনা-পঞ্জী, তাঁর শ্রেষ্ঠতম খলীফাদের অবস্থা ও কামালিয়াতের এটাই বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য সংকলন। উল্লিখিত দু'টি কিতাবের ফলেই বিশেষ করে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর জীবন ও অবস্থাদি, ঝোঁক ও স্বাভাবিক প্রবণতা, তা'লীম ও তরবিয়তের প্রক্রিয়া, সংস্কার ও প্রচারধর্মী নিরলস প্রয়াস ও সাধনা, তাঁর ফয়েয ও বরকত এবং প্রভাবপঞ্জী সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং ইতিহাসের উজ্জ্বলতর লেখনীমালার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়ে।

এ মহান ব্যক্তির মর্যাদা ও প্রভাব, বিভিন্ন অবস্থা ও উৎসমূলের সহজপ্রাপ্যতার কারণে, দা'ওয়াত ও সুদৃঢ় সংকল্পের ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ও যুগনায়ক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর সত্তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

হযরত শায়খ খাজা
নিজামুদ্দীন আওলীয়া (রঃ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতানুল মাশায়িখ হযরত নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর জীবনী ও কামালিয়াত

নাম মুহাম্মাদ, নিজামুদ্দীন উপাধিতে সাধারণ্যে খ্যাত ও পরিচিত। পিতার নাম আহমাদ বিন 'আলী। তিনি ইমাম হুসায়ন (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। মাতামহও সায়্যিদ বংশোদ্ভূতা ছিলেন। পিতামহ খাজা 'আলী এবং মাতামহ খাজা 'আরব দু'জনেই একই পিতামহের পৌত্র ছিলেন। উভয়েই বুখারা থেকে এসে কিছুদিন লাহোর অবস্থান করার পর সেখান থেকে বদায়ূন আসেন।

৬৩৬ হিজরীতে তিনি বদায়ূনে জন্মগ্রহণ করেন।[১] বদায়ূন (প্রাচীন বদাউন)[২] অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের আবাসভূমি ছিল। বহু নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ ইরান ও খুরাসান প্রভৃতি স্থান থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

হযরত নিজামুদ্দীন পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁর সৎকর্মশীলা ও আল্লাহ্‌ভক্ত মা এই য়াতীম শিশুর প্রতিপালন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশিক্ষণ

১. সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর বয়স হিসাব করে উপরোক্ত জন্ম সনকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন।

২. বদাউন রোহিলাখণ্ডের সুঠ নদীর বাম ধারে অবস্থিত। সে যুগে জনবসতিপূর্ণ ও জৌলুসপূর্ণ স্থান ছিল। দিল্লীর জন্য সীমান্ত শহর হিসাবে বিবেচিত হ'ত। সেজন্য পুরাতন দিল্লীর একটি দরজার নামই ছিল বদাউন দরজা। (নুযহাতুল খাওয়াতির)

বদাউন কেল্লার বর্তমান ধ্বংসাবশেষ তার অতীত মর্যাদা ও সুদৃঢ় ভিত্তির স্বাক্ষর বহন করছে। ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মাদ ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আয়বক একে জয় করেন এবং আপন ক্রীতদাস মালিক শামসুদ্দীন আলতামাশকে বদাউনের আমীর (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। আলতামাশ এখানে ১২২২ খ্রীস্টাব্দে একটি সুদৃশ্য ও প্রশস্ত মসজিদ নির্মাণ করান যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। দিল্লীর দু'জন বাদশাহ আলতামাশ এবং তাঁরই পুত্র রুকনুদ্দীন ফিরূয শাহ উভয়েই সিংহাসনে আসীন হবার পূর্বে বদাউনের গভর্নর ছিলেন (ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, বুদায়ল বদাউন)। 'দীনি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি' নামক মওলবী মুহাম্মাদ শফী' এম. এ. কৃত গ্রন্থ থেকে বর্ণিত, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৪১।

৩—

পুরুষোচিত সাহসিকতা ও পিতৃস্নেহে সম্পন্ন করেন। কিতাব পড়বার মত বয়সে উপনীত হলে তিনি মাওলানা 'আলাউদ্দীন উসূলীর[১] সামনে নীত হন এবং ফিকাহ্‌র প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। কুদূরী সমাপ্ত করার পর মাওলানা 'আলাউদ্দীন বললেন, "মাওলানা নিজামুদ্দীন! এখন শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও ফযীলতের পাগড়ী মাথায় বাঁধ।" ঘরে এসে তিনি মাকে জানালেন, উস্তাদ তাকে দস্তারবন্দীর হুকুম দিয়েছেন। এখন দস্তার কোত্থেকে আনি। মা বললেন, বাবা! নিশ্চিত থাক, আমিই তার বন্দোবস্ত করব। অতঃপর তূলা ক্রয় করে সুতা কাটিয়ে পাগড়ী বানিয়ে দিলেন।[২] এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে 'উলামায়ে কিরাম ও সে যুগের সৎকর্মশীল মহান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান। শায়খ জামালুদ্দীন তাবরিযী (রাঃ)-এর মুরীদ খাজা 'আলী এক প্যাঁচ বাঁধেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ কল্যাণকর জ্ঞান ও সার্বিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য দু'আ' করেন।[৩]

কঠোর দারিদ্র ও মা'য়ের প্রশিক্ষণ

ছোট্ট অথচ অভিজাত পরিবার—যা পিতার স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত—দারিদ্রের নিষ্পেষণ সইবে, তাতে আর বিচিত্র কি! আর এতে নতুনত্বেরও তেমন কিছুই নেই। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বলেন: মা'র অভ্যাস ছিল, যেদিন আমাদের ঘরে রান্না করবার মত কিছুই থাকত না তখন তিনি বলতেন—আমরা আজ সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান। আমি একথা শুনে বড়ই মজা পেতাম। একদিন আল্লাহ্‌র জনৈক বান্দাহ স্বল্প পরিমাণের খোরাক ঘরে পৌঁছিয়ে যায়। পর পর বেশ কয়দিন তা দিয়ে রুটি প্রস্তুত হতে থাকে। আমি শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠলাম এবং এই আশায় থাকলাম—ওয়ালিদা সাহেবা কখন বলেন যে, আজ আমরা সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান। শেষাবধি সে খোরাকীর শেষ দানাটুকু শেষ হবার পর আমার ওয়ালিদা সাহেবা বললেন 'আজ আমরা সবাই আল্লাহ্‌র মেহমান।' এ কথা শোনায় যে পরিমাণ মজা ও আনন্দ পেয়েছিলাম তা বর্ণনাতীত।[৪]

১. মাওলানা 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-উসূলী শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী (রঃ)-এর মুরীদ ছিলেন। স্বীয় শায়খ হযরত জালালুদ্দীন তাবরিযী (রঃ) এর পদাংক অনুসরণের উপর প্রচ্ছন্ন অবস্থা ও রহস্যের খুবই প্রচেষ্টা (ইহতিমাম) ছিল। সবর ও রেযামন্দী (ধৈর্য ও সন্তুষ্টি) সহকারে জীবন যাপন করতেন এবং সব সময় পরোপকার অথবা 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন (নুযহাতুল খাওয়াতির, ফাওয়ায়েদুল ফওয়াদের বরাতে)।

২. খায়রুল মাজালিসের অনুবাদ সিরাজুল মাজালিস, পৃষ্ঠা ১৪৫;

৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬;   ৪. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১১৩;

শায়খুল কবীর[১] হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর সাথে সম্পর্ক এবং আন্তরিক মিল-মুহব্বত

হযরত খাজা শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) বলেনঃ আমি তখন ছোট ছিলাম। বয়স সম্ভবত বারো বছর কিংবা তার কিছু বেশী অথবা কম। তখন আমি অভিধান পড়তাম। আবু বকর খাররাত নামে প্রখ্যাত এক ব্যক্তি কেউ কেউ আবুবকর কাওয়ালও বলেন—আমার উস্তাদের নিকট আসেন। তিনি মুলতান হয়ে আসছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (রঃ)-এর নিকট থেকে আসছি। এর পর তিনি তাঁর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ওখানকার জনগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকরকারী, তাঁরই ধ্যানে মশগুল—সাথে সাথে বহুবিধ নফল বন্দেগীতে এমতরূপ মগ্ন এবং সেখানে যিকরের পরিবেশ এমনি যে, ঘরের চাকরাণী, সেবিকা ও দাসীবান্দীরা পর্যন্ত যাতায় গম পিষতে পিষতে যিকরে ইলাহীতে নিমগ্ন থাকে। এবং এ ধরনের আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাই তিনি দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন জিনিসই আমার অন্তরে স্থান পাচ্ছিল না। এরপর লোকটি বলা শুরু করল যে, তারপর আমি সেখান থেকে আজুদহন আসলাম। সেখানে আমি এমত দীনদার বাদশাহ্‌র সাক্ষাত পেলাম। লোকটি শায়খুল ইসলাম শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ)-এর কথা আলোচনা করলেন। এটা শুনতেই আমার অন্তর-মানসে প্রেম ও প্রীতির ফল্গুধারা স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় উৎসারিত হয় এবং তাঁর মুহব্বত ও অন্তরের আকর্ষণ এমনতর ভাবেই স্থান করে নেয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর নাম নিতেই আমি স্বাদ অনুভব করতাম এবং আমি প্রতিটি সালাতের পরই আনন্দ ও উল্লাস সহকারে তাঁর নাম জপতাম।[২]

দিল্লী ভ্রমণ

ষোল বছর বয়সে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বদায়ূন থেকে দিল্লী এসে উপস্থিত হন।[৩]

---

১. এই পুস্তকে শায়খুল কবীর বলতে প্রত্যেক স্থানে শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

২, সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১০০; ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ১৪৯।

৩. এটা সিয়ারুল আওলিয়ার বর্ণনা আর এটাই সহীহ ও বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কেননা দিল্লীতে তিন-চার বছর ছাত্রজীবন কাটানোর পর খাজা সাহেব আজুদহন যান এবং যরত খাজা ফরীদুদ্দীন (রঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আতের সময় তিনি হবিশ বছর বয়সের ছিলেন বলে জানিয়েছেন। (সিয়ারুল আওলিয়া. ১০৭ পৃষ্ঠা)

দিল্লীতে ছাত্রজীবন

তিনি দিল্লী এসে শিক্ষা গ্রহণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। এ সময়-সীমা ছিল তিন থেকে চার বছর। দিল্লীতে সে সময় বহু প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বর্তমান ছিলেন।[১] এটা ছিল সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমূদের রাজত্বকাল এবং তৎকালীন উযীরে আজম ছিলেন গিয়াছুদ্দীন বুলবন এবং মাওলানা শামসুদ্দীন খারিযমী যিনি মুস্তাওফিল মামালিক[২] হয়ে শামসুল মুল্ক উপাধি লাভ করেন। তিনি শিক্ষকদের ও মহান উস্তাদ-এর মর্যাদা রাখতেন। সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পদের যিম্মাদারী এবং নানাবিধ ব্যস্ততার সাথে সাথে তিনি সে যুগের 'উলামাদের মত পঠন-পাঠনের দায়িত্বও পালন করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) ছিলেন তাঁর ছাত্রদের অন্যতম।

উস্তাদের প্রিয়পাত্র

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর সাথে মাওলানা শামসুদ্দীনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আর তিনি ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শাগরিদ। তিনি নিজে যে বিশেষ হুজরায় পড়াশুনা করতেন, সেখানে আর কোন শাগরিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু খাজা নিজাম (রঃ) এবং তাঁর দু'জন বন্ধু মাওলানা কুত্বুদ্দীন নাকিলা এবং মাওলানা বুরহানুদ্দীন বাকী ছিলেন এ নিয়ম-বহির্ভূত।[৩]

খাজা শামসুল মুল্‌কের অভ্যাস ছিল, যদি কোন শাগরিদ অনুপস্থিত থাকত কিংবা দেরী করে আসত, তবে তিনি বলতেন,—শেষ পর্যন্ত আমার এমন কোন্ ত্রুটি হয়েছে যেজন্য আপনি আসেন নি? হযরত খাজা স্বয়ং এ কাহিনী বলতে গিয়ে মুচকি হেসেছেন এবং বলেছেন যে, যদি তিনি কখনও কাউকে ঠাট্টা করতে চাইতেন তবে বলতেন, আমার দ্বারা এমন কি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে, আপনারা আসেন নি? কিন্তু আমি কখনো উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে কিংবা দেরী করে এলে আমার অন্তরে উদিত হ'ত যে তিনি আজ আমাকেও এমনটি বকবেন, কিন্তু আমাকে দেখামাত্রই নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতেন:

اخرکم از آنکه گاه گاهے - ائی و بما کنی نگاهے

১. দেখুন, কাযী জিয়াউদ্দীন বার্নীকৃত তারীখে ফিরূযশাহী, ১১২ পৃষ্ঠা।

২. এটা ছিল হিসাব বিভাগীয় প্রধান বা একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদ যা বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিকেই দেওয়া হ'ত।

৩. সিয়ারুল 'আরিফীন।

এটা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত এবং সমস্ত শ্রোতার উপর কান্নাবস্থা দেখা দিত। তিনি এও বলেন যে, তিনি নিজস্ব হুজরায় আমাকে সাথে বসাতেন। আমার শত আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তা মঞ্জুর করতেন না।[১]

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অগ্রাধিকার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আল্লাহ-প্রদত্ত অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তি দ্বারা সহপাঠীদের ভেতর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং অগ্রাকিার লাভ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিতর্ক এবং প্রশ্নোত্তরে (যা প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল) তাঁর বাকপটুতা ও বাকচাতুর্যের এবং প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপনা শক্তির এমন প্রকাশ ঘটে যে, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত যে সমস্যার ও প্রশ্নের উপরই আলোচনা করতেন অন্যান্য ছাত্র তাতে লা-জওয়াব হয়ে যেত এবং গোটা বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর সভায় তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা এবং প্রতিভার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। অতঃপর তাঁর সহ-পাঠীরা তাঁকে মাওলানা নিজামুদ্দীন 'বাহ্হাছ' (বাগ্মী) এবং মাওলানা নিজামুদ্দীন 'মাহফিল শেকন্' (মাহফিল ও বৈঠক চূর্ণ-বিচূর্ণকারী) উপাধিতে সম্বোধন করতে থাকে।[২]

'মাকামাত' কণ্ঠস্থ ও এর কাফফারা

সে যুগের পাঠ্যতালিকায় আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত পুস্তক 'মাকামাতে হারিরী' অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণভাবে ছাত্ররা পুস্তকটির মর্মোদ্ধার এবং তার কঠিন শব্দ ও বাক্যসমষ্টি মুখস্থ করাকেই যথেষ্ট মনে করত। কিন্তু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) তাঁর সীমাহীন জ্ঞানস্পৃহা, উচচ মনোবল ও সাহসিকতার দ্বারা এর চল্লিশটি মাকামাই মুখস্থ করে ফেলেন। পরে এরই কাফফারাস্বরূপ হাদীছের মশহূর কিতাব মাশারিকুল আনওয়ার মুখস্থ করেন।[৩]

হাদীছের ইজাযত প্রাপ্তি

তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মারিকলী---যিনি কামালুদ্দীন যাহিদ (মৃত্যু ৬৮৪ হিজরী) নামে বিখ্যাত—এর নিকট হাদীছ

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৬৮
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা, ১০১
৩. ঐ পৃষ্ঠা ১০১

শিক্ষালাভ করেন এবং যিনি 'মাশারিকুল আনওয়ার' প্রণেতা 'আল্লামা হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আস্‌সাগানীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। 'ইল্‌মে ফিকাহ্‌তে (ইসলামী আইন) তিনি একই সূত্রে 'হিদায়া' প্রণেতা 'আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মুরগিয়ানানীর ছাত্র ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) তাঁর নিকট থেকে মাশারিকুল আনওয়ারের দর্‌স গ্রহণ করেন এবং হাদীছ সম্পর্কে ইজাযত লাভ করেন।[১]

অন্তরের অস্থিরতা এবং আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমানতা

হযরত খাজা নিজাম (রঃ) যদিও সমগ্র দেহ-মন নিয়ে শিক্ষা অর্জনের পেছনে নিমগ্ন ছিলেন এবং তাঁর উঁচু মনোবল ও সাহসিকতা এবং অটুট ও সুদৃঢ় সংকল্প এক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা ও গাফলতির প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী ছিল না, তথাপি তাঁর অন্তর-মানস অন্য কোন বস্তু অধীর আগ্রহে খুঁজে ফিরছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা এবং প্রকাশ্য জ্ঞান-রাজ্যের উন্মুক্ত পরিবেশে তাঁর প্রকৃতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে যেত। একদিন তিনি বলেন, "যৌবনে যখন লোকজনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলাম এবং তাদের সাথে উঠাবসা করতাম তখন সর্বদাই নিজেকে ভারাক্রান্ত মনে হ'ত এবং মনে মনে বলতাম, কখন আমি এ সমস্ত লোকের মাঝে থেকে চলে যেতে পারব—যদিও এ সমস্ত লোক ছিলেন শিক্ষিত, সুধীমণ্ডলী এবং তাঁরা সর্বদা জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন বিষয় ও শাখা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন— তথাপি অধিকাংশ সময়ই আমার প্রকৃতি থাকত চরমভাবে বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ। আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের বলতাম, 'দেখ, আমি কিন্তু চিরদিনই তোমাদের মাঝে থাকব না। কিছুদিন তোমাদের এখানে আমি মেহমান মাত্র।' আমীর হাসান 'আলা সজযী (রঃ) বলেন, "আমি আরয করলাম, এটা কি শায়খুল ইসলাম হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হবার পূর্বেকার ঘটনা ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১০৫ পৃষ্ঠা। ইজাযতনামা আরবীতে লিখিত এবং সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে তা অবিকল উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইজাযতনামা ২২শে রবিউল আওয়াল ৬৭৯ হিজরীতে প্রদত্ত। যার অর্থ এই যে, যখন তিনি ইজাযতনামা পান তখন তাঁর বয়স (জন্ম তারিখ ৬৩৬ হিজরী হিসাবে) ৪৩ বছর ছিল এবং এ ঘটনা শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর ওফাতের ১৩ বছর পরের ঘটনা এবং সে সময়কার ঘটনা, যখন তিনি নিজেই জনগণের হেদায়াত ও ইরশাদ এবং তা'লীম ও তরবিয়তের আসনে সমাসীন এবং তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওয়ালিদা সাহেবার ইন্তিকাল

দিল্লীতে অবস্থানকালীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) -এর শ্রদ্ধেয়া ওয়ালিদা সাহেবা ইন্তিকাল করেন।

মা'য়ের স্মৃতি স্মরণ

অনেককাল পর একদিন হযরত খাজা (রঃ) স্বীয় মা'য়ের ইন্তিকালের কথা বর্ণনা করেন। বর্ণনা করতে গিয়ে এমত পরিমাণ কেঁদেছিলেন যে অতিরিক্ত কান্নার ফলে তিনি যা কিছুই বলছিলেন কিছুই পুরাপুরি শোনা যাচ্ছিল না।

আল্লাহ্‌র প্রতি মা'য়ের য়াকীন ও তাওয়াক্কুল

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) বলেন, "একদিন নতুন চাঁদ দেখে মায়ের খেদমতে হাযির হলাম এবং কদমবুসি করলাম। অতঃপর পবিত্র চাঁদ দেখার শুভ সংবাদ বরাবরের মতই পেশ করলাম। তিনি বললেন, 'আগামী মাসে চাঁদ দর্শন উপলক্ষে কার কদমবুসি করবে?' আমি বুঝে ফেললাম যে, ইন্তিকালের মুহূর্ত সমাগত। দুঃখ ও বিষাদে আমার অন্তর-মন ভরে গেল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। আমি বললাম, আম্মা! এ অধম ও গরীব বেচারাকে কার কাছে সোপর্দ করে যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে জানালেন—এর জবাব আগামী কাল পাবে। আমি আপন মনেই বললাম—এ মুহূর্তেই কেন তিনি জবাব দিচ্ছেন না। তিনি এও বললেন—যাও, আজ রাত শায়খ নাজীবুদ্দীনের ওখানেই কাটাবে। মা'য়ের নির্দেশ মুতাবিক আমি সেখানেই গেলাম। শেষ রাত্রে ভোরের দিকে ঘরের সেবিকা দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ডেকে বলল, বিবি সাহেবা তাঁকে ডাকছেন। আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সব খবর ভাল তো? সে হাঁ বলায় আমি নিশ্চিন্তে মা'য়ের খেদমতে হাযির হলে তিনি বললেন,—গতকাল তুমি আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে আর আমি তার জবাব দিবার ওয়াদাও করেছিলাম। এখন আমি তার জবাব দিচ্ছি। মনোযোগ সহকারে শোন। তিনি বললেন, তোমার ডান হাত কোন্‌টি? আমি আমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি আমার ডান হাত নিজের হাতের মুঠোর ভিতর টেনে নিলেন এবং বললেন: আল্লাহ পরওয়ারদিগার! একে তোমার হাতেই সোপর্দ করছি। একথা বলেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। আমি এতে আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করলাম আর আপন মনেই বললাম যে, আমার

আম্মা যদি স্বর্ণ ও মণিমুক্তায় পূর্ণ একটি ঘরও আমার জন্য রেখে যেতেন তবুও আমি এত খুশী হতাম না।"[১]

একটি ভুল আকাংক্ষা

সে সময় রাজধানী দিল্লীর আকাশে-বাতাসে বিশেষ করে ছাত্র ও বিদ্বান মণ্ডলীর গোটা সমাজে বিচার ও ফাতওয়া বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা ও চর্চা এবং এসব পদে 'উলামাদের নিযুক্তি এবং কাযী ও মুফতীদের জাঁক-জমক ও জৌলুসপূর্ণ জীবন-যাপন, উপরন্তু ধন-দৌলতের কিস্‌সা-কাহিনীতে বাজার ছিল সরগরম। হযরত খাজা নিজাম (রঃ)-এর প্রকৃতিগত সৌভাগ্য এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক যোগ্যতা সত্ত্বেও সে সময় তাঁর বয়স ছিল কম। জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য এবং জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অভাব-অনটন তথা দারিদ্রের কারণে তাঁর মনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদলাভের কামনা-বাসনা যদি জেগেই থাকে তবে তা মানবীয় প্রকৃতির পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। একদিন তিনি শায়খ নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রঃ)-এর নিকট গিয়ে আরয করলেন, "দু'আ' করুন যেন আমি কাযী হতে পারি।" শায়খ নাজীবুদ্দীন কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) মনে করলেন হয়ত তিনি শুনতে পাননি। দ্বিতীয় বার কিছুটা উচ্চ শব্দে বললেন, "আমি আপনার নিকট দু'আ'র দরখাস্ত করছি যেন কোথাও কাযী হয়ে যেতে পারি।" শায়খ উত্তর দিলেন, অন্য আর যাই কিছু হও, কাযী হয়ো না।[২]

আজুদহনে প্রথমবার উপস্থিতি

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) আজুদহন গিয়ে উপস্থিত হবার পূর্বেই দিল্লীতে শায়খুল কবীর (রঃ)-এর আপন ভাই খাজা নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (রঃ)-এর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে বেশ কিছুকাল অবস্থানও করেছিলেন। তাঁর সাহচর্য এবং আলাপ-আলোচনা শায়খুল কবীর হযরত খাজা শায়খ ফরীদ (রঃ)-এর প্রতি প্রীতি ও মুহব্বতের সে স্ফুলিংগ—যা অল্প বয়সে এবং বদায়ূনে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর রক্ত-মাংসে মিশে গিয়েছিল—প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে ও নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করে। তিনি শায়খুল কবীর (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হবার অটুট সংকল্প গ্রহণ করেন এবং শেষাবধি হাযিরও হয়ে যান।

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৫১ পৃঃ
২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ২৮ পৃঃ

প্রার্থী, না প্রার্থনা পূরণকারী ?

খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) এ মুলাকাত এবং প্রথমবারের উপস্থিতির অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজেই বলেছেন যে, আমি যখন শায়খুল কবীর (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হই তখন তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের কারণে আমি আমার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলি। শুধুমাত্র কোনক্রমে এতটুকুই উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম "কদমবুসি করতে অত্যন্ত আগ্রহী।" শায়খ (রঃ) যখন দেখতে পেলেন আমি অত্যন্ত ভীত ও হতচকিত, তখন তিনি বললেন : لكل داخل دهشة —প্রতিটি নবাগতই ভীত-বিহ্বল হয়ে থাকে।[১]

মুরীদকে সাদরে গ্রহণ

শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-কে অত্যন্ত সমাদর করেন। তিনি ইরশাদ করেন, "এই ভিনদেশী ছাত্রটির জন্য জামাতখানায় যেন চারপায়ী বিছানো হয়।" হযরত খাজা নিজাম (রঃ) বলেন, "যখন চারপায়ী বিছানো হ'ল, তখন আপন মনেই বললাম, আমি কখনোই চারপায়ীর উপর বিশ্রাম নেব না। কত সম্মানিত মুসাফির, আল্লাহ্‌র কালাম পাকের কত হাফিজ এবং আল্লাহ্‌র কত 'আশিক প্রেমিক ভূমিশয্যায় শায়িত—আর আমি চারপায়ীর উপর কেমন করে শুই?" এ সংবাদ খানকাহ্‌র ব্যবস্থাপক মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুতেই তিনি বললেন, "তুমি নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করবে, না কি শায়খ (রঃ)-এর নির্দেশ মান্য করবে ?" আমি বললাম, "শায়খ (রঃ)-এর নির্দেশই মান্য করব।" বললেন, "তবে যাও। চারপায়ীর উপর শুয়ে পড়।"[২]

বায়'আত

এখানে উপস্থিত থাকাকালীন কোন এক মুহূর্তে যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি এসেছিলেন সে উদ্দেশ্য পূরণ করেন এবং শায়খুল কবীর (রঃ)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত নেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল বিশ বছর।[৩]

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৩১ পৃঃ
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১০৭ পৃঃ
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃঃ ১০৭ ;

শিক্ষার ধারাক্রম অব্যাহত অথবা পরিত্যক্ত

সম্ভবত হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের কতকগুলি কিতাব অধ্যয়ন তখনও বাকী ছিল। গভীর আগ্রহ ও স্পৃহা দাবি করছিল যেন পড়াশোনার পাট এখানেই চুকিয়ে দেয়া হয় এবং প্রকৃত 'ইলম ও আল্লাহ্‌র প্রকৃত মা'রিফত (পরিচয়) লাভের পেছনেই জীবন ব্যয় করা হয় যা মানব স্থষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য। শিক্ষা আহরণ ও শিক্ষা প্রদানের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা প্রথমেও তাঁর সংবেদনশীল মন-মানসিকতা এবং সদাজাগ্রত আত্মার উপর বোঝাস্বরূপ ছিল। কিন্তু প্রয়োজন ও আবশ্যকীয় মনে করে, উপরন্তু অন্য কোন অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে তিনি তাই আঁকড়ে ধরে ছিলেন। কিন্তু যখন 'ইল্‌মে য়াকীনের প্রতিষেধক এবং 'ইল্‌মে হাকীকীর উৎসমূল মিলে গেল তখন এ দীর্ঘ ধারাক্রম বজায় রাখা তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতির উপর দুর্বহ বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু যে শায়খ ও মুরশিদে কামিলের সাথে তিনি আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিক কামালিয়াত হাসিলের সাথে সাথে 'ইল্‌মের দিক দিয়েও কামিল ছিলেন। তিনি তরীকতের 'ইল্‌ম হাসিলের জন্য আবশ্যকমত জাহিরী 'ইল্‌ম হাসিল করাকেও অত্যন্ত দরকারী ও অপরিহার্য মনে করতেন। স্বয়ং তাঁর শায়খ ও মুরশিদও এ হেদায়াত দান করেছিলেন। অতএব মাওলানা নিজামুদ্দীনের দ্বারা ইরশাদ (ধর্মীয় পথ নির্দেশনা) এবং তরবিয়তের (নির্দেশিত পথের বাস্তব প্রশিক্ষণে) যে দুনিয়াব্যাপী দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া স্রষ্টার অভিপ্রেত ছিল সেরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার ছিল গভীর পাণ্ডিত্যের। এমনিতেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ শায়খ ও মুরশিদগণ আল্লাহ্‌র যিনি প্রার্থী, তাঁর গণ্ডী ও সীমারেখার দিকটিও দেখে থাকেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বায়'আত গ্রহণের পর বললেন, "লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে কি নফল 'ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুশাহিদায় লিপ্ত হয়ে পড়ব?" শায়খুল কবীর (রঃ) বললেন, "আমি কাউকেই লেখাপড়া ও শিক্ষা লাভের পথ ছেড়ে দিতে বলি না। ওটাও কর এবং এটাও কর অর্থাৎ লেখাপড়ার সাথেই আধ্যাত্মিক সাধনা চালিয়ে যাও। দেখতে থাক কোনটি বিজয়ী হয়।" তিনি আরও বললেন, "দরবেশের জন্যও অল্পবিস্তর 'ইল্‌ম হাসিল করা অবশ্যই উচিত।"[১]

শায়খুল কবীর (রঃ) থেকে দর্‌স গ্রহণ

শায়খুল কবীর (রঃ)-এর বিশেষ অনুগ্রহ ও খাস মেহেরবানী যে, তিনি স্বয়ং খাজা নিজাম (রঃ)-কে সরাসরি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিষয় পড়াতে

১. সিয়ারুল আওলিয়া পৃঃ ১০৭।

শুরু করেন। তিনি বলেন, "নিজাম! তোমাকে কিছু কিতাব আমার থেকেও পড়তে হবে।" অতঃপর শায়খগণের ইমাম হযরত শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ারদী (রঃ)-এর তাসাওউফ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ কিতাব আওয়ারিফুল মা'আরিফ' এর দর্‌স দেওয়া শুরু করেন এবং ছয়টি অধ্যায় পড়ান। এ ছাড়াও আবু শুকূর সালেমীর ভূমিকাও প্রথম থেকে শেষ অবধি পৃথক পৃথক পাঠ করে শিক্ষা দেন। অধিকন্তু তিনি 'ইলমে তাজবীদও শিক্ষা দেন—এবং পবিত্র কুরআনুল করীমের ছয় পারা তাজবীদ সহকারে পড়ান।[১]

'দরস' এর আনন্দ

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) বহুকাল অতীত হবার পরও উক্ত দরসের আনন্দ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতেন। তিনি বলতেন, "আওয়ারিফ-এর দরস গ্রহণ কালে যে সমস্ত হাকীকত ও গোপন রহস্য হযরত শায়খুল কবীর (রঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছিলাম তা আর কখনও শুনতে পারব না। হযরত শায়খ (রঃ)-এর বর্ণনার যাদুকরী ও বিস্ময়কর বর্ণনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এমনি ছিল যে, তিনি যখন ধর্মীয় ভাষণ দিতেন তখন কায়মনে আকাংক্ষা পোষণ করতাম—কত সুন্দর হ'ত, যদি আমি এ অবস্থায় মারা যেতাম।"[২]

আত্মবিলুপ্তির শিক্ষা

'আওয়ারিফ'-এর যে কপি দরস প্রদানের সময় হযরত শায়খ (রঃ)-এর হাতে থাকত, তা ছিল কিছুটা ত্রুটিযুক্ত এবং লেখাগুলি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কয়েকটি সবকের পরই এমন একটি জায়গা এল, যেখানে শায়খ (রঃ)-কে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত থাকতে হয়। হযরত খাজা নিজাম (সরলতা ও তারুণ্যের কারণে) বলে বসেন, "আমি শায়খ নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের নিকট অন্য আর একটি কপি দেখেছি।" উক্ত কপিটি বিশুদ্ধ ছিল। শায়খুল কবীর (রঃ) বললেন, "ফকীর-দরবেশদের ভুলত্রুটিযুক্ত কপি সংশোধনের ক্ষমতা নেই।" কয়েকবারই তিনি কথাটি আওড়াতে থাকেন। হযরত খাজা নিজাম (রঃ) বলেন, "প্রথম দিকেতো খেয়ালই করতে পারি নি। কিন্তু বারবার আওড়ানোর ফলে সহপাঠী মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক আমাকে বলেন, 'শায়খুল কবীর (রঃ)-এর কথার লক্ষ্যস্থল তো তুমি।" হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের তো তখন হুঁশ হারাবার

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১০৬ ;
২. কাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৭৫

উপক্রম। তিনি বলে ওঠেন, "না'উযুবিল্লাহ। এর দ্বারা হযরত শায়খুল কবীর (রঃ)-এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না।" হযরত খাজা নিজাম (রঃ) বলেন, "আমি বারবার ওযরখাহী করলাম, কিন্তু তাঁর বিমর্ষ ভাব দূর হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।" তিনি বলেন, "অবশেষে আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত। সে দিন দুঃখ ও বিষাদের যে পাহাড় আমার উপর ভেঙে পড়েছিল এবং সমস্ত দিনটা যেভাবে কেটেছিল সম্ভবত আর কারও জীবনে তেমন দিন আসে নি। দুঃখ ও বিমর্ষচিত্তে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। একবার এমনও মনে হয়েছিল যে কূয়ায় ঝাপিয়ে পড়ে জীবনটাই শেষ করে দেই। কিন্তু শান্তভাবে চিন্তা-ভাবনার পর সে কল্পনা পরিত্যাগ করলাম। এরূপ পেরেশান ও হয়রান অবস্থায় আমি জঙ্গলের দিকে চললাম এবং বহুক্ষণ কেঁদে কাটালাম।"

শিহাবুদ্দীন নামে শায়খুল কবীর (রঃ)-এর জনৈক সাহেবযাদা যাঁর সাথে খাজা নিজাম (রঃ)-এর অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তিনি শায়খুল কবীর (রঃ)-এর নিকট খাজা নিজাম (রঃ)-এর উপরোক্ত অবস্থার বর্ণনা দেন। মনের আকাংক্ষা পূর্ণ হ'ল। শায়খুল কবীর (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হবার অনুমতি তাঁর মিলে গেল।

দ্বিতীয় দিনে তিনি নিজেই ডেকে পাঠালেন। বললেন, "এ সবই তো তোমার পূর্ণতা প্রাপ্তির স্তরে উপনীত হবার জন্যই করা হয়েছে। পীর মুরীদের কল্যাণ-কামী ও সংশোধন অভিলাষী হয়ে থাকেন।"

চূড়ান্ত মুহূর্ত

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর জন্য সে মুহূর্তটি—যখন শায়খুল কবীর (র) তাঁর "আমি শায়খ নাজীবুদ্দীনের নিকট একটি উত্তম কপি দেখেছি" শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন—অত্যন্ত কঠিন ও নাযুক মুহূর্ত ছিল। বাহ্যত এরূপ একটি নির্দোষ ও নিষ্পাপ বাক্য বলাতে এবং এই সংবাদ জ্ঞাত করাতে যে, আমি আপনারই ভাইয়ের নিকট উত্তম একটি কপি দেখেছি—এমন পরিমাণ অসন্তুষ্টি ও প্রতিবাদ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কামিল শায়খ এমন একজন ছাত্র থেকে যিনি ভাবী জীবনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন এবং যাঁকে গণমানুষকে আত্মশুদ্ধির তরবিয়ত দিতে হবে—এতটুকু অহমিকা থাকা পসন্দ করেন নি। তদুপরি আল্লাহ্‌র পথের নবীন এই পথিককে হালতের যে পূর্ণতম স্থানে পৌঁছুতে হবে তজ্জন্য তার অস্থিরতা ও অভাববোধ জাগ্রত করা

এবং অন্তর-মানসকে দ্রবীভূত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একজন ধীমান, যোগ্যতা ও প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের পক্ষে—যে জ্ঞানের সর্বোচচ ধাপ অতিক্রম করেছে—এ সময়টি ছিল অত্যন্ত নাযুক আর এরই উপর তাঁর গোটা ভবিষ্যত নির্ভর করছিল। মাওলানা সায়্যিদ মানাজির আহসান গিলানী ঠিকই লিখেছেন:

"প্রার্থীর মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক তার পার্থক্য ও যাচাই-বাছাই করার মুহূর্ত সমাগত। দুনিয়া দেখছিল—এখন মাওলানা নিজামুদ্দীনের সিদ্ধান্ত কি হয়? মাওলানা কি 'বাহ্হাছ' (তর্ক-বিতর্ককারী, তার্কিক, debator) অথবা 'মাহফিল শেক্ন' (আলোচনা বৈঠক চূর্ণ-বিচূর্ণকারী)-এর উপাধি নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন যেমনটি আরও লাখো 'বাহ্হাছ' ও 'মাহফিল শেক্ন' দুনিয়ার এ রঙ্গমঞ্চে এসেছে, আবার চিরাচরিত নিয়মে বিদায় নিয়ে চলেও গেছে—অথবা মাশায়িখে কিরামের নেতৃত্বের যে সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে তার উপর আসীন হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

হিম্মত ও দৃঢ় মনোবলের দিক দিয়ে ঘাটতি হলে বলতে পারতেন—ভালো! আমার কি অপরাধ? আমি কি অন্যায়টাই বা এমন করেছি? একটা ভাল কপির সন্ধান জানতাম, সেটাই প্রকাশ করেছি, আর এর জন্য এত রোষ ও উষ্মা প্রকাশের অর্থ কি? এই ছোট্ট ঘটনাটিই যদি এসে সামনে যেত, তবে এটাই লম্বা ফিরিস্তিতে রূপ নিতে পারত—এত লম্বা যে, শয়তানের ভূড়িও তার তুলনায় ছোট বলে প্রমাণিত হ'ত। কিন্তু এটা তো জানা কথা যে, তিনি নিজের আত্মার চিকিৎসার্থে এসেছিলেন, শায়খুল কবীরের কমযোরী ও দুর্বলতার চিকিৎসা করানোই আজুদহন আসবার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল না। তিনি পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে এটা চিকিৎসকের প্রতিষেধক মাত্র। এরপর সমালোচনার সুযোগ ও অধিকারই বা তাঁর ছিল কোথায়?"[১]

বন্ধুর ভর্ৎসনা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) বলেন যে, "আমি শায়খুল কবীর (রঃ)-এর খেদমতে আজুদহনে অবস্থান করছিলাম। জনৈক 'আলিম যিনি আমার দোস্ত ও সহপাঠী ছিলেন তখন আজুদহন আসেন। তিনি ছেঁড়া-ফাঁটা

১. ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫ "হিন্দুস্তান মে মুসলমানো কা নিজামে তা'লীম ও তরবিয়ত"

পুরনো কুর্তা আমার গায়ে দেখে অত্যন্ত উদ্বেগ ও আফসোসের সাথে বললেন, ‘মাওলানা নিজামুদ্দীন, তুমি নিজের এ কি অবস্থা করেছ? তুমি যদি কোন শহরে গিয়ে পঠন-পাঠনে লিপ্ত থাকতে তাহলে তুমি এযুগের মুজতাহিদ হতে পারতে এবং বিরাট শান-শওকতের সাথে জীবন-যাপন করতে পারতে।’ আমি আমার দোস্তের এ সব কথাই শুনলাম এবং নানাবিধ ওযরখাহী করে বিদায় দিলাম। এরপর যখন আমি শায়খুল কবীর (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলতে শুরু করলেন, ‘নিজাম, যদি তোমার কোন দোস্ত তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসে আর তোমাকে তোমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং বলে, কেন তুমি পঠন-পাঠনের সে পেশা ছেড়ে দিলে যা তোমার অবস্থার পরিবর্তন ও সৌভাগ্য লাভের কারণ ঘটত, তাহলে তুমি তার কি উত্তর দেবে?’ আমি আরয করলাম, শায়খ আমাকে যা বলার নির্দেশ দেবেন আমি তাই বলব।’ এতে তিনি বললেন, ‘যদি কখনও আর কেউ তোমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করে তবে তুমি এই কবিতাটি তাকে শুনিয়ে দেবেঃ

نه همرهی تو مرا راه خویش گیر و برو
ترا سلامتی باد امر از نگونساری

এরপর হুকুম হ’ল যে, খানকাহ্‌র বাবুর্চিখানা থেকে নানাবিধ খানা ভর্তি একটি পাত্র মাথায় করে উক্ত বন্ধুর নিকট নিয়ে যাও। আমি হুকুম তামিল করলাম। আমার দোস্ত যখন এ দৃশ্য দেখলেন তখন কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এসে পাত্রটি মাথা থেকে নামিয়ে নিলেন এবং বললেন, ‘এ তুমি কি করেছ?’ আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সে সমস্ত শুনে তিনি বললেন, ‘তোমাদের শায়খ এমন যে তিনি তোমাকে আত্মশুদ্ধি ও বিনয়ের এত উচ্চ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন; আমাকেও তাঁর খেদমতে নিয়ে চল।’ বন্ধুটির খাবার খাওয়া সমাপ্ত হলে স্বীয় চাকরকে লক্ষ্য করে বলল, ‘এই পাত্রটি উঠিয়ে আমাদের সাথে চল।’ আমি বললাম, ‘না, তা হয় না। এ পাত্র যেভাবে আমি মাথায় উঠিয়ে এনেছি ঠিক তেমনিভাবেই আমি মাথায় উঠিয়ে ফিরে যাব।’ মোট কথা, আমরা উভয়েই শায়খুল কবীর (রঃ)-এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমার দোস্ত হযরত শায়খ (রঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে বায়‘আত নেন এবং ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।”

উপস্থিতি কত বার ?

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) হযরত শায়খুল কবীর (রঃ)-এর জীবদ্দশায় তিনবার আজুদহন গিয়ে হাযির হন। প্রথম বারে, না কোন্ বারে খেলাফত লাভের সৌভাগ্য ঘটে কোন জীবনী গ্রন্থেই তার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই।

শায়খুল কবীর (রঃ)-এর অনুগ্রহ

কোন এক ২৫শে জমাদিউল আওয়াল সালাতুল জুম'আ বাদ আহ্বান এল। শায়খুল কবীর (রঃ) নিজের মুখের থুথু হযরত খাজা শায়খ নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর মুখে দিলেন এবং কুরআন মজীদ হেফজ করার ওসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ পাক তোমাকে দীন ও দুনিয়া উভয়ই দান করলেন।"

বিদায় ও ওসিয়ত

অতঃপর তিনি তাঁকে দিল্লীর দিকে রওয়ানা করে দেন। বিদায়কালে বললেন, "দিল্লী গিয়ে মুজাহাদায় মশগুল থাকবে। বেকার থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। নফল রোযা আল্লাহ্‌র পথে অর্ধেক এগিয়ে দেয়। আর সালাত ও হজ্জ (নফল) বাকী অর্ধেক।"

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তিনি তাঁকে খেলাফতনামা লিখিত দেন এবং হেদায়াত করেন যেন তা মাওলানা জামালুদ্দীনকে হাঁসিতে এবং কাযী মুনতাজিবকে দিল্লীতে দেখানো হয়। তিনি আরও ইরশাদ করেন, "তুমি একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষের ন্যায়—,তোমার ছায়ায় আল্লাহ্‌র মাখলুক আরাম পাবে—আশ্রয় পাবে। যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বাড়াতে হলে এবং উন্নতি করতে হলে মুজাহাদা করতে থাকবে।"

হযরত খাজা নিজাম (রঃ) বলেন, "ফিরতি পথে হাঁসিতে আমি শায়খ জামালুদ্দীনকে খেলাফতনামা দেখালাম। তিনি তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।"

একটি দু'আ'র আবেদন

একদা ১লা শা'বান হযরত খাজা নিজাম (রঃ)-এর তরফ থেকে শায়খুল কবীর (রঃ)-এর খেদমতে এই মর্মে দু'আ'র আবেদন পেশ করা হয় যেন সৃষ্টির পেছনে তাকে ঘুরতে না হয়। তাঁর আবেদনটি কবুল করা হয়—এবং তিনি তার জন্য দু'আ' করেন।[১]

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১১৬ পৃঃ

একবার তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্র নিকট তোমাদের জন্য অল্প কিছু দুনিয়াও চেয়ে নিয়েছি।" হযরত খাজা (রঃ) বলেন যে, "আমি একথা শুনেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, যেখানে বড় ও মহান ব্যক্তিরা অবধি দুনিয়ার কারণে ফেতনা ও দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে সেখানে আমার মত লোকের কি অবস্থা হবে?" শায়খ তৎক্ষণাৎ বললেন, "তুমি ফেতনায় পড়বে না। ধ্যান ও বিনয় গচ্ছিত ও জমা রাখবে।" এরপর আমি দুর্ভাবনামুক্ত হলাম।[১]

আজুদহন থেকে দিল্লী

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) স্বীয় মুরশিদ ও মুরব্বী থেকে বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক তথা রূহানীভাবে বিজয়, আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন ও আল্লাহ্র বিধান মাফিক প্রশিক্ষণ দান এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার, তবলীগ এবং হেদায়েতের মহান ও পবিত্রতম অভিযানে বের হলেন। একজন নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ফকীর ভারতবর্ষেরই নয় বরং হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোটা মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুসংহত ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানীর দিকে চলেছেন। শুধু ইখলাস, আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতা এবং আল্লাহ্র সৃষ্ট তামাম মাখলুকাত থেকে বিমুখতা ব্যতীত আর কোন পাথেয় কিংবা হাতিয়ার তাঁর ছিল না। মাওলানা সায়্যিদ মানাজির আহসান গিলানী কী সুন্দরই না লিখেছেন—

"(তিনি) ভারত বিজয় অভিযানে আজুদহন থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীর দিকে রওয়ানা হচ্ছেন যেখানে নীচু পর্যায় থেকে উঁচু পর্যায় পর্যন্ত বেশুমার মিথ্যা 'ইলাহ' আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। এর মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁদের সামান্য অংগুলী হেলনে মানুষের ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদের মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁদের সামান্যতম করুণা ও অনুগ্রহ মানুষকে মাটির আসন থেকে উঠিয়ে নেতৃত্ব ও সম্পদের আসমানে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। অলিতে গলিতে 'ইয্যত-আব্রু বিক্রী হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ভাগ-বণ্টিত হচ্ছে। চারদিকে টাকা-পয়সা ছড়ানো হচ্ছে। আর যে সমস্ত মাধ্যমে এসব অর্জিত হচ্ছে, সুলতানুল মাশায়িখ সে সবগুলিরই অধিকারী। তিনি পড়া-শোনা করেছেন। আজুদহন যাবার আগে দিল্লীর জ্ঞানী-গুণীজনের সভায় 'সভামঞ্চের নায়ক' হিসেবে সাধারণ ও ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আর কিছু না হোক, অন্তত বিচার বিভাগের কোন একটি পদ থেকে শুরু

১. সিয়ারুল আওলিয়া পৃঃ ১২৩; ৪ ঐ ১১৩২

করে শায়খুল ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আসনের খেদমত পর্যন্ত সকল রাস্তাই তাঁর সামনে উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু স্রষ্টার আকৃতিতে যে 'ইলাহ্‌র' সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাতে তাঁর বুক এমন পরিপূর্ণ যে, সেখানে কোন মাখলুকের পক্ষেই স্থান সংকুলানের অবকাশ ছিল না।"

ন্যায্য অধিকার প্রত্যর্পণ

শায়খুল কবীর (রঃ) মুরীদী ও খেলাফত প্রদানের সাথে সাথে কয়েকবারই তাকিদ দেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের খুশী ও সন্তুষ্ট করার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা যেন গ্রহণ করা হয় এবং হকদারদের যেভাবেই হোক সন্তুষ্ট ও রাযী করাতে চেষ্টার যেন কোন ত্রুটিই না করা হয়। খাজা (রঃ) বলেন, "আমি যখন দিল্লী চললাম তখন আমার স্মরণ হ'ল যে, জনৈক ব্যক্তির নিকট আমি বিশ 'জিতল' (অথবা চিতল)[১] দেনা আছি এবং কোন এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কিতাব ধার নিয়ে এসেছিলাম। সেটা পরে হারিয়ে যায়। বদায়ূনে থাকাকালীন আমি সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম যে, যখনই দিল্লী পৌঁছুব তখন ঐ সমস্ত পাওনাদারকে সন্তুষ্ট ও রাযী করতে চেষ্টা করব। যখন আমি আজুদহন থেকে দিল্লী ফিরে এলাম তখন যে ব্যক্তির নিকট বিশ জিতল ঋণী ছিলাম সে ছিল একজন কাপড় বিক্রেতা। আমি তার নিকট থেকে কাপড় খরিদ করেছিলাম। আমার নিকট কোন সময়েই বিশ জিতল সংগৃহীত হয়নি যে আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারি। জীবিকার ক্ষেত্রে আমি ছিলাম অত্যন্ত অনটনের ভেতর। কখনও পাঁচ জিতল হাতে আসে, কখনও-বা দশ জিতল। একবার দশ জিতল হাতে আসতেই আমি উক্ত কাপড় বিক্রেতার দরজায় গিয়ে হাযির। আওয়ায দিতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। আমি তখন বললাম যে, তোমার বিশ জিতল আমার যিম্মায় আছে। একবারে দেবার সামর্থ্য আমার নেই। দশ জিতল সাথে এনেছি। এটা নিয়ে নাও। বাকী দশ জিতল ইনশাআল্লাহ এর পরে পৌঁছিয়ে দেব। লোকটি বলল, মনে হচ্ছে তুমি মুসলমানদের নিকট থেকে এসেছ। লোকটি উক্ত দশ জিতল নিয়ে নিল আর বলল, আমি বাকী দশ জিতল মাফ করে দিলাম।'

"এরপর সেই লোকটির নিকট গেলাম যার নিকট থেকে কিতাব ধার নিয়েছিলাম। লোকটি আমাকে চিনতে পারেনি। আমি বললাম যে, একবার আমি একটা কিতাব আপনার নিকট থেকে ধার নিয়েছিলাম যেটা পরে হারিয়ে গেছে।

১. জিতল অথবা চিতল তামার মুদ্রা যা সে যুগে প্রচলিত ছিল।

এখন আমি উক্ত কিতাবের একটা কপি করে আপনাকে দিয়ে দেব। আমি কিতাবটি যেভাবে লেখা ছিল ঠিক সেভাবেই লিখে আপনাকে পৌঁছিয়ে দেব। লোকটি বলল, তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানকার পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে। এরপর সে বলল, আমি উক্ত কিতাবটি তোমাকে দিয়ে দিলাম।"[১]

দিল্লীর অবস্থানস্থল

খাজা সাহেব (রঃ) যখন দিল্লীবাসীদের তথা ভারতবাসীদের খেদমতের জন্য দিল্লী পেঁৗছলেন তখন যদিও দিল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহও শাহী মহল ও প্রাসাদোপম অট্টালিকা দ্বারা আবদ্ধ ছিল এবং যত্রতত্র নিত্য-নতুন ইমারত নির্মিত হচ্ছিল তবু খাজা সাহেব (রঃ)-এর কোন অবস্থানের ঠিক ছিল না। অবস্থানস্থল হিসাবে গিয়াছপুরে যতদিন ছিলেন ততদিন তিনি এত ঘন ঘন আবাস পালটিয়েছেন যে, যেন মনে হচ্ছিল গোটা শহরে এই ফকীরের নিজের দরবেশী সাজ-সামান রাখবার এবং চাটাই বিছাবার মত একফোঁটা জায়গাও নেই। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা মীর খোরদ স্বীয় ওয়ালিদ সায়্যিদ মুবারক মুহাম্মাদ কিরমানীর ভাষায় —যিনি খাজা (রঃ)-এর দোস্ত এবং বন্ধু ছিলেন— বাসগৃহ পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যা পাঠকদের উপদেশ গ্রহণের জন্য এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল। সায়্যিদ মুবারক মুহাম্মাদ কিরমানী বলেন:

"যতদিন সুলতানুল মাশায়িখ [খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)] দিল্লী শহরে ছিলেন ততদিন তাঁর এমন কোন বাসা-বাড়ী ছিল না যা তাঁর মালিকানাধীন। তিনি সারা জীবন নিজস্ব এখতিয়ারে নিজের জন্য কোন স্থানও নির্বাচন করেননি। যখন তিনি বদায়ূন থেকে আসেন তখন মিঞা বাজার সরাইয়ে যাকে নেমকের সরাইও বলা হ'ত—অবতরণ করেন। ওয়ালিদা সাহেবা ও বোনকে সেখানেই রাখেন এবং স্বয়ং নিজে একটি কামানগিরের দরবারে যা উল্লিখিত সরাইয়ের সামনে ছিল স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। আমীর খসরু (রঃ)-এর বাসাও ছিল উক্ত মহল্লাতেই। কিছুদিন পর বীর আরযের বাসা খালি হয়। তাঁর পুত্র নিজের এলাকায় চলে গিয়েছিল। আমীর খসরুর মাধ্যমে যিনি বীর আরয-এর দৌহিত্র ছিলেন সুলতানুল মাশায়িখের আবাসের জন্য বাড়ীটি পাওয়া গেল। এই বাড়ীতে তিনি দু'বছর বাস করেন। বাড়ীটি শহরের নিকটবর্তী হিন্দুস্তান দরজা এবং মন্দপুলের কাছেই ছিল। বাড়ীর মহল এবং রোয়াক ছিল উঁচু ও অত্যন্ত শানদার। ইতিমধ্যেই বীর আরয-এর ছেলে এসে যায়। তাই সুলতানুল মাশায়িখকে

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১৪ পৃষ্ঠা।

উক্ত বাড়ী থেকে স্থানান্তরে গমন করতে হয়। নিজস্ব কিতাবাদি—যা ব্যতিরেকে আর কোন সামান তাঁর ছিল না—সমকক্ষীয় লোকদের মাধ্যমে ছাপড়াওয়ালী মসজিদে (যা সিরাজ বাক্কালের সামনে অবস্থিত ছিল) নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় দিনে সা'দ কাগজী —যিনি শায়খ সদরুদ্দীনের অন্যতম মুরীদ ছিলেন—এ কাহিনী শোনেন এবং সুলতানুল মাশায়িখ-এর নিকটে এসে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা এবং অনুরোধ-উপরোধ সহকারে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান। বালাখানার উপর একটি উত্তম ও সুন্দর কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। সেখানেই তাঁর থাকার জায়গা করে দেওয়া হয়। সুলতানুল মাশায়িখ এখানে এক মাস অবস্থান করেন। এরপর এখান থেকেও বিদায় নেন এবং মিষ্টি বিক্রেতা ও বাবুর্চির সরাইয়ে—যা কায়সার পুলের সন্নিকটবর্তী ছিল—সরাইয়ের মাঝখানে একটি বাড়ীও ছিল—সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর সেখান থেকেও স্থানান্তরিত হয়ে মুহাম্মাদ নামক ফল বিক্রেতার বাড়ীর মাঝখানে অবস্থিত শাদী গোলাবীর ঘরে অবস্থান নেন। এখানে অবস্থানকালীন শামসুদ্দীন শরাবদারের[১] পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন—যারা তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন—হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-কে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে শামসুদ্দীন শরাবদারের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। কয়েক বছর যাবত সুলতানুল মাশায়িখ এ বাড়ীতেই থাকেন। এ বাড়ীতে থাকাকালীন তাঁর গোটা সময়টাই অত্যন্ত আরাম ও শান্তির মধ্যে কাটে।[২]

দারিদ্র ও অনাহার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর দিল্লীতে আসার পর থেকেই বিবিধ পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের পালা শুরু হয় যা ডিংগিয়ে এ পথের পথিকদের গোটা সৃষ্টি জগতের প্রত্যাবর্তনস্থল ও রূহানী ফয়েয লাভের উৎসমূলে পরিণত হতে হয়। আর তা আসে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই। এটা ছিল সেই সময় যখন সারা ভারতবর্ষের ধন-দৌলত, সোনা-রূপা ও বিবিধ জওয়াহেরাত প্লাবনের বেগে এসে দিল্লীতে জমা হচ্ছিল। প্রাচুর্যের অবস্থা এমন ছিল যে, এক জিতলে দুই সের মজাদার রুটি পাওয়া যেত, আর দুই জিতলে মিলত একমন খরবুযা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও খাজা সাহেবের দারিদ্র ও অনটনের অবস্থা এমনি ছিল যে, তিনি বলেন, "অনেক সময় আমার কাছে একটি কপর্দকও

১. বাদশাহ্‌র পানি পান করানোর পদ।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১০৮ পৃষ্ঠা;

থাকত না যা দিয়ে রুটি কিনে আমি নিজে খাই এবং মা-বোন ও দায়িত্বাধীন ঘরের লোকদের খাওয়াই। খরবুযার প্রাচুর্য ও প্রচুর আমদানী সত্ত্বেও গোটা মৌসুম চলে যেত, কিন্তু আমাদের পক্ষে খরবুযার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হ'ত না। তথাপি আমি আমার অবস্থার প্রতি তুষ্ট ছিলাম আর কামনা করতাম মৌসুমের বাকী সময়টাও যেন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং আমরা আগের অবস্থায়ই থাকি।"[১]

অন্যের মাধ্যম ব্যতিরেকে

যখন তিনি শহরের প্রান্ত সীমায় সেই বুরুজে অবস্থান করছিলেন যা মন্ধ দরজার সন্নিকটে অবস্থিত, কয়েক দিন কেটে যাবার পরও খাবার মত কোন কিছুর সংস্থান সম্ভব হয়নি। জনৈক ছাত্র জানতে পায় কয়েক দিন যাবত হযরত (রঃ) অনাহারে ও চরম অনটনের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন। তখন সে এ সম্পর্কে প্রতিবেশী কোন জোলাকে অবহিত করে। লোকটি খানা পাকিয়ে আনে। খানা খাওয়াবার প্রাক্কালে হাত ধোয়াবার সময় খানা আনয়নকারীদের ভিতর কেউ বলে বসে, 'আল্লাহ পাক ছাত্রটির মঙ্গল করুন যে সময় মত আমাদের এ খবর পৌঁছিয়েছে।' খাজা (রঃ) একথা শোনা মাত্রই হাত গুটিয়ে নেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'কি খবর দিয়েছিল?' লোকটি বলে, 'অমুক ছাত্র আপনি যে কয়েক দিন যাবত অনাহারে আছেন তা আমাদের জানিয়েছিল। এরপর আমরা খাবার রান্না করে নিয়ে আসি।' এতে তিনি বললেন, 'আমাকে মাফ কর।' এরপর লোকেরা বহু অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সে খাবার আর গ্রহণ করেন নি।[২]

শায়খুল কবীর (রঃ)-এর ওফাত

শেষ বার তিনি শায়খুল কবীর (রঃ)-এর খেদমতে ওফাতের তিন চার মাস পূর্বে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, ৫ই মুহাররাম[৩] শায়খুল কবীর (রঃ) ওফাত পান এবং শাওয়াল মাসেই হযরত খাজা গঞ্জে শকর (রঃ) আমাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেন। অসুখ-বিসুখ আগেই শুরু হয়েছিল। রমযান মাস। রোগ-যন্ত্রণার কারণে তিনি সিয়াম পালনে ছিলেন অপারগ ও অক্ষম। একদিন আমি খরবুযা কেটে শায়খ (রঃ)-এর সামনে রাখলাম। শায়খ নিজে গ্রহণ করলেন এবং কাটা এক টুকরা আমাকেও দিলেন। সে মুহূর্তে আমার

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১১৩ পৃষ্ঠা;
২. জাওয়ামি'উল কালাম (খাজা সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূ দরাজ (রঃ)-এর মালফুজাত
৩. হিজরী ৬৬৪;

মনে হয়েছিল যে, জানি না এরূপ সম্পদ আবার কখন মিলবে যা আজ তিনি নিজের পবিত্র হাতে আমাকে দিলেন। ইচ্ছে হয়েছিল এটা আমি খেয়ে নিই এবং ধারাবাহিকভাবে দু'মাস সিয়াম পালন করে তার কাফফারা আদায় করি। তিনি বললেন,—কখ্খনো নয়, এ হতে পারে না। আমার জন্য এমতাবস্থায় শরীয়তের অনুমতি থাকলেও তোমার জন্য তা কখনোই জায়েয হবে না।[১]

তিনি বলেন, ইন্তিকালের সময় তিনি [শায়খ ফরীদ (রঃ)] আমাকে স্মরণ করেন এবং বলেন, নিজামুদ্দীন তো এখন দিল্লীতে। তিনি এও বলেন, আমিও আমার শায়খ কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর অন্তিম মুহূর্তে হাযির ছিলাম না। আমি ছিলাম তখন হাঁসিতে। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এ কথার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি এমন কান্না কেঁদেছিলেন যে, উপস্থিত সবার অন্তর এতে দ্রবীভূত না হয়ে পারেনি।[১]

ওফাতের পর তিনি আজুদহন উপস্থিত হন। মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক শায়খুল কবীর (রঃ)-এর ওসিয়ত মুতাবিক জামা, মুসাল্লা (জায়নামায) এবং লাঠি সোপর্দ করেন যা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-কে দিবার জন্য শায়খুল কবীর (রঃ) মাওলানার হাতে সোপর্দ করেছিলেন।[৩]

গিয়াছপুরে অবস্থান

ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একদিন তিনি শহরের শোরগোল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে, প্রথম থেকেই শহরে কোনদিনই আমার মন বসেনি। একদিন কেল্লাখানের হাওযের উপর ছিলাম। সে সময় আমি পবিত্র কুরআন মজীদ মুখস্থ করছিলাম। সেখানেই একজন দরবেশ আল্লাহ্‌র ধ্যানে ছিলেন। আমি তাঁর নিকটে গেলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি এই শহরেই থাকেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "আপনি নিজের মর্জি মাফিক এই শহরে থাকেন?" তিনি বললেন, "কথা তো তা নয়।" এরপর উক্ত দরবেশ একটি ঘটনার বর্ণনা দেন যে, একবার আমি অত্যন্ত সজ্জন এক দরবেশের সাক্ষাত পেলাম। কামাল দরজার বাইরে সেই বেষ্টনীর মাঝে যেখানে একটি উঁচু জমি আছে এবং যার উপর শহীদগণের চার পার্শ্বের পাঁচিল নির্মিত সেখানেই উক্ত দরবেশ উপবিষ্ট। উক্ত দরবেশ

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃঃ ২. ঐ ৫৩ পৃষ্ঠা;
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২২ পৃষ্ঠা;

আমাকে বললেন, "যদি ঈমান-আমানের মঙ্গল চাও তো এ শহর ছেড়ে চলে যাও।" আমি সেই মুহূর্ত থেকেই শহর ছেড়ে চলে যাবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে আসছি। কিন্তু ঘটনা এমনভাবে মোড় নিচ্ছে যে, পঁচিশ বছর হয়ে যাচ্ছে তবু আমি যাবার সুযোগ পাচ্ছি না।" হযরত খাজা এ কাহিনী বর্ণনার পর বলেন যে, আমি যখন উক্ত দরবেশের এ কথা শুনলাম তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি এ শহরে থাকব না। কয়েকটি জায়গা সম্পর্কে আমার ধারণায় আসত বটে যে আমি সেখানে চলে যাই, কখনও-বা মনে ভাবতাম যে, পিটয়ালী[১] শহরে চলে যাই। সে সময় সেখানে একজন তুর্ক ছিল। কখনও মনে করতাম যে, বিশনালা চলে যাব। সেটা একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা। এরপর আমি সেখানেই চলে যাই এবং তিনদিন সেখানে থাকি। কিন্তু সেখানে ভাড়ায় কিংবা নগদ মূল্যে কোন বাড়ীই পাওয়া যায় নি। উক্ত তিন দিনের প্রতি দিনই কারো না কারো মেহমান হিসেবে কাটাই। একদিন সেখানকার একটি বাগানে—যাকে 'বাগে হায়রাত' বলা হয় গিয়ে মুনাজাত করতে মনে সাধ জাগে। আমি আরয করলাম, খোদাওয়ান্দ! আমি এই শহর ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছি। তবে কোন জায়গাই নিজস্ব মর্জি মুতাবিক এখতিয়ার করব না। যেখানেই তোমার মর্জি সেখানেই আমি চলে যেতে চাই। আকস্মিকভাবে এক গায়েবী আওয়ায শোনা যায়—যার মধ্যে গিয়াছপুরের নাম আসে। আমি গিয়াছপুর কখনও দেখিনি। আর এটাও জানতাম না যে, গিয়াছপুর কোথায়। আমি আওয়ায শোনার পর আমার একজন দোস্তের নিকট যাই। উক্ত দোস্ত ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী একজন নকীব। আমি তাঁর বাড়ী যাই এবং সেখানে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, তিনি গিয়াছপুর গেছেন। আমি মনে মনেই ভাবি যে, তাহলে সেটাই গিয়াছপুর। মোট কথা, আমি গিয়াছপুর আসলাম। সে জায়গায় আজকের মত আবাদী ও লোকবসতি গড়ে উঠেনি। জায়গাটা ছিল অখ্যাত ও অজ্ঞাত। লোকজনও ছিল কম। আমি আসলাম ও বসবাস করতে শুরু করলাম। যখন সুলতান কায়কোবাদ[২] কিলোখড়িকে[৩] নিজস্ব আবাস হিসেবে মনোনীত করেন তখন থেকেই লোক

১. আম্বা জেলার একটি ছোট শহর।

২. সুলতান মু'ইয্যুদ্দীন কায়কোবাদ (হিজরী ৬৮৬ থেকে ৬৮৮ পর্যন্ত) বোগরা খানের পুত্র এবং সুলতান গিয়াছুদ্দীন বুলবনের পৌত্র ছিলেন। রাজত্বকাল তিন বছর।

৩. স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান 'আছারুস্‌সানাদীদ' নামক গ্রন্থে লিখেন যে, মু'ইয্যুদ্দীন কায়কোবাদ ৬৮৩ হিজরীতে একটি কেল্লা নির্মাণ করেন এবং কিলোখড়ি তার নাম রাখেন। যদিও বর্তমানে উক্ত কেল্লার নাম-নিশানাও নেই, কিন্তু সম্রাট হুমায়ুনের

সমাগম সেখানে বাড়তে থাকে। আমীর-উমারা, সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের এবং তৎসহ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। আমি যখন লোকজনের এরূপ ভীড় লক্ষ্য করলাম, তখন মনে মনেই ভাবলাম —এখন দেখছি এখান থেকেও চলে যেতে হবে। আমি এরূপ ধারণায় যখন মগ্ন ছিলাম ঠিক সে মুহূর্তে একজন বুযুর্গ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যিনি আমার উস্তাদও ছিলেন শহরে ইন্তিকাল করেন। নিজের মনেই বললাম, আগামীকাল যখন তাঁর ফাতেহাখানিতে আমি যাব তখনই কোন দিকে বেরিয়ে পড়ার কথা চিন্তা করা যাবে। আপন মনেই এমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেদিনই সালাতুল 'আসর বাদ একজন যুবক আমার নিকট আসে। যুবকটি অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু দুর্বল ও হালকা-পাতলা ধরনের। আল্লাহ্ই জানেন—সে আধ্যাত্মিক পথের কোন পথিকই ছিল—অথবা অন্য কেউ। সে আসা মাত্রই আমাকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করল :

آں روز کہ مہ شدی نمی دانستی۔
کہ انگشت نمائے جہاں خواہی شد

"যেদিন আল্লাহ্ তোমাকে চাঁদ বানিয়েছিলেন সেদিনই তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, তোমার দিকে সারা দুনিয়ার মানুষ অঙ্গুলী সংকেত করবে।"

হযরত খাজা নিজাম (রঃ) বলেন যে, যুবকটি আমাকে আরও কিছু বলেছিল যা আমি লিখে নিয়েছিলাম। এরপর সে বলল, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের পক্ষে মশহূর হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আর যখন কোন ব্যক্তি মশহূর হয়েই যায় তখন এমন হওয়া উচিত যেন কিয়ামতের দিন রাসূল পাক (সঃ)-এর সামনে লজ্জিত হতে না হয়।

এরপর সে বলল যে, এটা কি ধরনের হিম্মত ও মনোবল যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্জনবাস গ্রহণ করা হবে? তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, শক্তি-সাহস ও মনোবলের অধিকারী হলে আল্লাহ্র সৃষ্ট মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ্র ধ্যানে ও স্মরণে মশগুল থাকা সম্ভব। সে কথা শেষ করতেই আমি কিছু খাবার তার সামনে এনে রাখলাম। কিন্তু সে হাত বাড়াল না। তখনই আমি অন্তরে নিয়ত করে ফেলি যে, আমি এখানেই থাকব। যখন আমি এরূপ নিয়ত করে ফেললাম তখন সে অল্প খাবার খেয়ে চলে গেল।[১]

সমাধি সৌধের পাশেই কিলোখড়ি এবং দশ পাঁচটা ঝুপড়ীও সেখানে বিদ্যমান। চতুর্দ্দ অধ্যায় ৪র্থ পৃষ্ঠা;

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৯ পৃঃ

জনস্রোত

গিয়াছপুরে অবস্থানকালীন সময়ে আল্লাহ্‌র বান্দারা হযরত খাজা নিজাম (রঃ)-এর দিকে স্রোতের বেগে আসতে শুরু করে এবং এখান থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক বিজয়ের দরজা খুলে যায়।

তাযকিরা গ্রন্থসমূহ থেকে এটা জানা যায় না যে, কতদিন গিয়াছপুর অবস্থানের পর তাঁর পবিত্র, বরকতময় সত্ত্বা জনতার দৃষ্টি ও লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং গিয়াছপুরের খানকাহ্‌র প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এতটুকু জানা যায় যে, গিয়াছপুরে অবস্থান গ্রহণের পরেও তিনি দীর্ঘকাল সংকট ও অভাব-অনটনের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত করেন। এমন কি বেশ কিছুকাল তিনি ভীষণ গরম ও লু-হাওয়া চলাকালীন সময়েও বেশ দূরে অবস্থিত জামে মসজিদে জুম'আর দিন পায়ে হেটে যেতেন। এরূপ সংকট ও অনটনের পরই স্রষ্টার স্বাভাবিক নিয়মেই কিছুটা সুখ-শান্তি ও স্বস্তির যুগ ফিরে আসে।[১] এবং জনস্রোত এমনভাবে খানকাহমুখী হতে শুরু করে যে, তার সামনে দিল্লীর সুলতানের দরবারী মর্যাদাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

অনুগ্রহ বিতরণকারী ফকীর

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন: পুরাতন অভ্যাগত ও মেহমান, নবাগতের মধ্যে পরদেশী অথবা শহরবাসী যেই তাঁর কাছে আসত, সন্দর্শন ও কদমবুসির সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হ'ত— তিনি কাউকেই বঞ্চিত করতেন না। পোশাক-আশাক, নগদ অর্থ এবং হাদিয়া-তুহফা যাই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আসত সবকিছুই আগত ও বিদায়ী লোকজনের জন্য ব্যয় করা হ'ত এবং যেই আসুক না কেন, কখনই খালি হাতে ফিরে যেত না।[২]

হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ) বলেন:

"বিজয় অভিযানের অবস্থা ও নমুনা এমন ছিল যে, ধন-দৌলতের সমুদ্র দরজার সামনে ঢেউ খেলত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তই নয় বরং 'ইশা পর্যন্ত লোকজনের আসার বিরাম ছিল না। কিন্তু আনয়নকারীর চেয়ে গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। লোকে যাই কিছু আনত তার চেয়ে বেশী পরিমাণেই হযরত খাজা (রঃ)-এর অনুগ্রহ পেত।[৩]

১. দুঃখের পর সুখ অবধারিত—নিশ্চয়ই দুঃখের পর সুখ অবধারিতভাবেই আসে। (আল-কুরআন)

২. সিয়ারুল আওলিয়া,

৩. সিরাজুল মাজালিস, (খায়রুল মাজালিসের অনুবাদ) হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর মালফূজাত;

জাগ্রত হবার পর প্রথম প্রশ্ন

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল দুপুরের আহার গ্রহণের পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠেই সর্বপ্রথম দু'টি সওয়াল জিজ্ঞাসা করতেন। প্রথমত, বেলা কি চলে গেছে? এবং দ্বিতীয়ত, কেউ আসেনি তো? এটা এজন্য জিজ্ঞাসা করতেন যেন কাউকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে না হয়।[১]

দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বিনিময় ও দান

দুনিয়া তাঁর দিকে যে পরিমাণে ঝুকেছিল তার প্রকৃতি ও মানসিকতাও সে পরিমাণে দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি কাঁদতেন। সাফল্য ও জয়যাত্রা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেত ঠিক সম-পরিমাণে তিনি কাঁদতেন এবং অনুরূপভাবেই তিনি প্রয়াস চালাতেন যেন তাঁর খেদমতে আনীত দ্রব্য ও সম্পদসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বিলি-বণ্টিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পরই লোক পাঠিয়ে হেদায়াত দিতেন, যা কিছুই আসুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গেই যেন তা বিলি-বণ্টন করে দেওয়া হয়। যখন সব কিছুই বণ্টিত হয়ে যেত এবং অভাবী ও দুঃস্থ লোকদের নিকট তাদের প্রাপ্য পৌছে যেত তখন তিনি তৃপ্তি ও আরাম বোধ করতেন। প্রতি জুম'আর দিনে হুজরা এবং ভাণ্ডার ঘর এমন করে খালি করে দিতেন যেন তিনি ঘর ঝাড় দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলছেন। এরপর তিনি মসজিদে যেতেন। যদি বাদশাহ কিংবা শাহযাদাদের মধ্যে কেউ তখনো আস্তানায় হাযির হত এবং তাদের নযর-নেওয়াজ ও আগমন খবর পৌছত—তাহলে নির্লিপ্ততার সুরে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে তিনি বলতেন--- কোথায় এসেছে? ফকীরের সময় নষ্ট করতে এসেছে?[২]

জমি-জায়গা ও অতিরিক্ত ধন-সম্পদ থেকে বিরত থাকা

আমীর হাসান 'আলা সজযী বলেন যে, একবার আমি উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একজন আমীর বাগান, অনেক জায়গা-জমি এবং অন্যান্য আসবাব-পত্রের দলীল-দস্তাবিজ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়েছিল এবং স্বীয় একনিষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল। হযরত খাজা (রঃ) তা কবুল করলেন না বরং মুচকি হেসে বললেন, "যদি আমি এটাকে কবুল

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৬ পৃঃ
২. ঐ, ১২০ পৃঃ

করি তবে এরপর লোকে বলাবলি শুরু করবে যে, শায়খ বাগান ভ্রমণে গেছেন এবং নিজ জায়গা-জমি ও ক্ষেত-খামার দেখতে গেছেন। এসব কাজের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমাদের কোন শায়খ ও বুযুর্গ কেউই জায়গা-জমি কবুল করেন নি।"[১]

ফকীরের শাহী দস্তরখান

তিনি নিজে সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। কিন্তু শাহী দস্তরখান দু'বেলাই বিছানো হ'ত এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে এতে রাখা হ'ত। আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, শহরের নাগরিক এবং পরদেশী, নেককার এবং বদকার কারুরই বাছবিচার এতে ছিল না। সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষ এক জায়গায় বসে এবং একই সাথে খাবার খেত। নিয়ে যাবারও অনুমতি ছিল। কেউ কেউ খেত এবং বেঁধে নিয়ে যেত। এই শাহী দস্তরখান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। এই দস্তরখানে বসে শত শত হাযার হাযার দরিদ্র মানুষের সেসব খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হ'ত যারা সেগুলোর নামও শোনেনি। শাহী দরবারের বড় বড় আমীর-উমারা এবং সাম্রাজ্যের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গেরও উক্ত দস্তরখানে শরীক হবার ইচ্ছে হ'ত এবং খাবারের স্বাদ ও গন্ধের কথা স্মরণ করত। লোকদের হেদায়াত তথা সৎপথপ্রদর্শন, সুলূক ও তরবিয়তের সাধারণ ফয়েয ছাড়াও (যার দরজা সব সময় খোলাই থাকত) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর এটাও একটি ফয়েয ছিল যা দিল্লীতে পূর্ণ প্রাচুর্যের সাথে অব্যাহত ছিল এবং তিনি লাখো আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌র লালন-পালনের মাধ্যম ছিলেন। মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী দরবেশের শাহী দস্তরখানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কি সুন্দরই না বলেছেন —

"আজ রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্যের কাহিনীর সাথে নিঃস্ব ও গরীবদের জন্যও কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা হয়, অথচ ইসলামের ইতিহাসে গরীব ও আমীরের মাঝখানে যোগসূত্র রক্ষা করত — ইসলামের এই সব সূফীর খানকাহ্‌। এ সমস্ত বুযুর্গের দরবার সেই দরবার ছিল যেখানে সুলতানও খাজনা পাঠাতেন। স্বয়ং সাম্রাজ্যের যুবরাজ খিযির খান পর্যন্ত উক্ত দরবারের ভক্ত ও অনুরক্তদের অন্তর্গত ছিলেন। সুলতান 'আলাউদ্দীন যিনি সারা ভারতবর্ষ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন — তাঁকেও রাজস্বের একটি অংশ এই বুযুর্গদেরকে প্রদান করতে

---

[১] ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৯৯ পৃঃ

হ'ত।[১] এই খানকারই মাধ্যমে দেশের গরীব ও দরিদ্র শ্রেণীর কাছে তাদের ন্যায্য হিস্যা পৌঁছে যেত।

'প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইসলামী রাজত্বের কোন একটি যুগ এবং সে সময়ে ভারতবর্ষের একটি প্রদেশ ও অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ —

تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

অর্থাৎ "ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ কর এবং দরিদ্র ও অভাবী লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও" কার্যকরী করতে সত্যাশ্রয়ী ও সূফীদের এ সম্প্রদায় মশগুল ছিল না। বিশেষ করে যে সমস্ত বুযুর্গের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উপর তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কায়েম হয়ে যেত তখন গরীব ও দুঃস্থ জনগণের ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হয়ে যেত।[২] ইসলামের এই সমস্ত মনীষীর অবস্থা সম্পর্কে জানুন ও একবার চিন্তা করুন, দেখবেন, আমীর ও গরীবদের মাঝখানে ঐ সমস্ত মনীষী ও বুযুর্গের অস্তিত্ব এবং সত্ত্বা এক সেতুবন্ধ হিসেবে বিরাজ করছে। দেশের ও রাষ্ট্রের গরীব, নিরাশ্রয় ও সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদের এটা একটা আশ্রয় শিবির হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আসছিল। বরং এ সমস্ত খানকাহ্‌র মাধ্যমেই গরীব ও নিঃস্বদের কাছেও ঐ সমস্ত নিয়ামত পৌঁছে যেত যেগুলোর নাম তারা সম্ভবত শোনেওনি।"[৩]

শায়খ (রঃ)-এর খোরাক

শায়খ নিজেও খানায় শরীক হতেন, কিন্তু সেই শাহী-দস্তরখান যার উপর বিবিধ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য ও নিয়ামত ছড়ানো থাকত তাতে শরীক হতেন না। বরং তাঁর খোরাক ছিল সাধারণভাবে এক আধখানা রুটি, কিছু করেলা ইত্যাদি সবজী অথবা কিছু ভাত।[৪]

---

১. নিজামে তা'লীম ২১৪ পৃঃ

২. ঐ ২২০ পৃঃ

৩, ঐ পৃষ্ঠা ২২৮

৪. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৫ পৃঃ

নিয়ম-প্রণালী

দস্তরখানে বসবার কয়েকটি কানুন ও নিয়ম-প্রণালী এরূপ ছিল যে, সবার আগে মুরশিদ (রঃ)-এর নিকটাত্মীয় হতেন। এরপর 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং এরপর অভিজাত মহল।[১]

সমযুগীয় সুলতানের সাথে সম্পর্কহীনতা

চিশতিয়া সিলসিলার বুনিয়াদ ভারতবর্ষের গোটা সাম্রাজ্যের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনই নয় বরং ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সমাজ জীবনের সংস্কার ও সংশোধন এবং তন্মধ্যে রূহানীয়াত (আধ্যাত্মিকতা) ও আল্লাহ্‌র সাথে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্কে প্রাণ সঞ্চারের সাথে সাথে সে যুগের সুলতানদের সাথে সম্পর্কহীনতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এটা এ সিলসিলার একটি প্রতীক চিহ্ন ও চিশতিয়া তরীকার মাশায়িখে কিরামের পবিত্র উত্তরাধিকার ও আমানত হিসেবে পরিগণিত হ'ত। চিশতিয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরাম সীসার ন্যায় মযবুত, সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করার ব্যাপারে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেন। এক দিকে তাঁরা শাহী দরবারের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ প্রবণতা এবং যুগের বিভিন্ন ফেতনা-ফাসাদের উৎখাত সাধন করেন, অপরদিকে নীতি ও আদর্শ এবং 'আকীদার দিক দিয়ে এরূপ সিদ্ধান্তও নেন যে তাদের সরাসরি কোন সম্পর্ক শাহী কিংবা রাজদরবারের সাথে থাকবে না।

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) থেকে আরম্ভ করে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল যে, শাহী দরবারে যাওয়া যেমন চলবে না, ঠিক তেমনি যুগের যিনি সুলতান তাঁর সাথে মুলাকাত করতে যাওয়াও চলবে না। সবাই এ নীতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ছিলেন। এর পরিণতি এই হয়েছিল যে, রাজনীতির তিক্ত কাঁটা তাঁদের আঁচলে জড়িয়ে কখনও তাঁদেরকে বিব্রত করতে পারে নি এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্নমুখী বিপ্লব ও রাজবংশের উত্থান-পতন তাঁদের কেন্দ্রগুলিতে ও তৎপরতার মধ্যে কোনরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। তাঁদের একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা সকল প্রকার রাজনৈতিক বিভেদ ও বৈপরিত্য সত্ত্বেও সঠিক ও অব্যাহত থাকে এবং এটারই কারণে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী এ সিলসিলার পক্ষে তাঁদের মিশন অব্যাহত রাখা ও ভারতবর্ষে নিজেদের প্রভাব-

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০২ পৃঃ

প্রতিপত্তি কায়েম করার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ মিলেছিল। সম্ভবত এরই পরিণতিতে এ সিলসিলা সাধারণ লোকসমাজে জনপ্রিয়তা ও চিরন্তনতা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন (রঃ) যখন থেকে শায়খুল কবীর (রঃ)-এর দ্বারা ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে জয় করতে এবং তবলীগ ও হেদায়াতের জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন তারপর থেকে দিল্লীর সিংহাসনে একের পর এক পাঁচজন বাদশাহ অধিষ্ঠিত হন। এবং তাঁরা অত্যন্ত জাঁকজমক ও দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। কিন্তু মাত্র একবার ছাড়া এবং তাও ধর্মীয় প্রয়োজন হেতু (সামা' হালাল অথবা হারাম সম্পর্কিত বাহাছে) আর কখনও শাহী দরবারে যান নি অথবা তৎকালীন বাদশাহদেরও কাউকে নিজ দরবারে আসবার অনুমতি দেন নি। গিয়াছুদ্দীন বুলবনের রাজত্বকালে তাঁর [শায়খ নিজাম (রঃ)]-এর খ্যাতির দীপ্ত সূর্য ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা মাঝ-আকাশে উপনীত হয় নাই বিধায় সুলতান গিয়াছুদ্দীনের নজর তাঁর উপর পড়ে নাই। সুলতান মু'ইয্‌যুদ্দীন কায়কোবাদ খেলাধুলা, ক্রীড়া-কৌতুক, শিকার ও ভ্রমণেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন।

জালালুদ্দীন খিলজীই প্রথম বাদশাহ ছিলেন যিনি জ্ঞানী, দৃঢ়চেতা, সহিষ্ণু, প্রতিভা ও মনীষার সন্ধানলাভে সক্ষম এবং গুণীজনের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এ সময় হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন কয়েকবার তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু কখনও তা মঞ্জুরী লাভে সক্ষম হয় নি। শেষ পর্যন্ত সুলতান আমীর খসরু (রঃ)-এর সাথে (যিনি সুলতানের সভাকবি ও সেক্রেটারী ছিলেন) এমত পরিকল্পনা করেন যে, একবার আগমন সংবাদ না জানিয়েই হযরত শায়খ (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হবেন। আমীর খসরু (রঃ) সমীচীন মনে করেন যে, স্বীয় মুরশিদকে এ সম্পর্কে অবগত করানো হবে। কেননা আমি তাকে বাদশাহ্‌র আগমন সংবাদ না দিলে সম্ভবত তা আমার জন্য মঙ্গলজনক হবে না। যদিও এ ব্যাপারে বাদশাহ্ আমীর খসরু (রঃ)-কে স্বীয় গোপন অভিসন্ধির অংশীদার বানিয়েছিলেন, তথাপি শায়খ ও মুরশিদের নিকট এ পরিকল্পনা ও অভিসন্ধি গোপন রাখা তাঁর নিকট সমীচীন মনে হয় নি। আমীর খসরু (রঃ) শায়খ খাজা নিজাম (রঃ)-এর নিকট গিয়ে আরয জানান যে, আগামী কাল বাদশাহ আপনার খেদমতে হাযির হবেন। হযরত খাজা নিজামুদীন (রঃ) একথা শোনা মাত্রই স্বীয় মুরশিদ শায়খুল কবীর (রঃ)-এর কবর যিয়ারতের

নিয়তে আজুদহন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। বাদশাহ যখন এ সংবাদ অবগত হন তখন তিনি আমীর খসরু (রঃ)-এর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন—যেহেতু আমীর খসরু (রঃ) তাঁর গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছেন এবং খাজা (রঃ)-এর কদমবুসির সৌভাগ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন। আমীর খসরু (রঃ) এতে উত্তর দেন যে, বাদশাহ্‌র অসন্তুষ্টিতে জীবন হারাবার ভয় ছিল, কিন্তু মুরশিদ (রঃ)-এর অসন্তুষ্টিতে ছিল ঈমান হারাবার ভয়। বাদশাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি এ উত্তর খুবই পসন্দ করেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যান।[১]

সুলতান 'আলাউদ্দীনের পরীক্ষা ও শ্রদ্ধা

সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজী যিনি প্রাচীন ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী এবং সৌভাগ্যবান বাদশাহ—যাঁকে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারও বলা হয়—আপন চাচা সুলতান জালালুদ্দীনের পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রথম দিকে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর প্রতি অনুরাগ ও বীতরাগ বা শ্রদ্ধা ও ঘৃণা কোনটিই ছিল না। কেউ কেউ সুলতানকে হযরত খাজা (রঃ) সম্পর্কে ভুল ধারণা দেবার প্রয়াস পেয়েছিল এবং তাঁর প্রতি ব্যাপক জনস্রোতের গতি ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্যের জন্য বিপদজনক—এমত ধারণা সৃষ্টিরও প্রয়াস চালিয়েছিল। সুলতান 'আলাউদ্দীন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর খেদমতে আপন পুত্র ও যুবরাজ খিযির খানের হাতে বিনীতভাবে লিখিত একটি দরখাস্ত পাঠান যার মধ্যে সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ দেবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। যখন খিযির খান এই আবেদনপত্র নিয়ে খাজা (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন, তখন তিনি কাগজখানা হাতে নিয়েই এবং তা না পড়েই মজলিসে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমি দু'আ' করছি।" এরপর তিনি বলেন, "দরবেশদের বাদশাহ্‌র সাথে কি কাজ? আমি একজন ফকীর মানুষ। শহরের এক কোণে পড়ে আছি। বাদশাহ এবং মুসলমানদের দু'আ' প্রার্থনায় মশগুল। আর এজন্য যদি বাদশাহ্‌র কোনরূপ আপত্তি কিংবা অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ্‌র যমীন অত্যন্ত প্রশস্ত।" সুলতান 'আলাউদ্দীন এরূপ জবাবে অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন যে, আমি জানতাম যে সাম্রাজ্যের কোন ব্যাপারে কিংবা রাজনীতিতে খাজা হযরত (রঃ)-

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

এর কোনরূপ যোগসূত্র নেই। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা চায় যে, আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের সাথে আমার টক্কর বাধুক এবং এভাবে রাষ্ট্র ও দেশ ধ্বংস হয়ে যাক।[১]

বাদশাহ্‌র আগমনের সংবাদে 'উযরখাহী

সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজী সুলতানুল মাশায়িখের নিকট বহু অনুনয় বিনয় করেন এবং বলে পাঠান যে, "আমি হুযূরেরই একজন ভক্ত ও অনুরক্ত মাত্র, আমার অন্যায় ও বেয়াদবী হয়েছে। আমাকে যেন মাফ করা হয় এবং হাযির হবার ইজাযত দেওয়া হয় যেন কদমবুসি করবার সৌভাগ্য ঘটে।" হযরত খাজা (রঃ) বলেন যে, আসবার প্রয়োজন নেই। আমি দূরে থেকেই দু'আ' করছি। আর দূরের দু'আ' অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে থাকে।[২]

ঘরের দু'টি দরজা

সুলতান এরপরও সাক্ষাত লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এতে হযরত বললেন যে, এ ফকীরের ঘরে দু'টি দরজা। বাদশাহ এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন আর আমি অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব।[৩]

ইসলামের জন্য চিন্তা-ভাবনা

যদিও সুলতান 'আলাউদ্দীনের হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নাই, তথাপি তাঁর প্রতি সুলতানের ভক্তি-শ্রদ্ধা বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তথা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত খাজা (রঃ)-এর মুখাপেক্ষী হতেন। এক্ষেত্রে সুলতান দু'আ'র দরখাস্ত পেশ করতেন এবং তিনি আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার সাথে দু'আ' করতেন।

কাযী যিয়াউদ্দীন বার্নী বলেন যে, যখন মালিক নায়েব (মালিক কাফূর) বিরঙ্গীলের অবরোধে ব্যস্ত তখন তেলেঙ্গানার রাস্তা বিপদপূর্ণ হয়ে যায়। রাস্তায় অবস্থিত থানা ও ফাঁড়িগুলিও উঠে যায়। চল্লিশ দিনেরও বেশী হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তা ও মঙ্গলজনক কোন খবরই সুলতানের নিকট পৌঁছুচ্ছিল না। সুলতান ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। দরবারের আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গ আশংকা প্রকাশ করছিল হয়ত বা সৈন্যবাহিনী

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৩৪ পৃঃ
২. ঐ ১৩৫ পৃঃ
৩. ঐ ১৩৫ পৃঃ

কোন দৈব দুর্বিপাকের শিকারে পরিণত হয়েছে, ফলে রসদপত্র ও চিঠিপত্রাদির যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। এরূপ চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কালেই একদিন সুলতান মালিক কারা বেগ এবং কাযী মুগীছুদ্দীন বিয়ানুবীকে হযরত খাজা (রঃ)-এর খেদমতে পাঠান এবং বলে দেন যে, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মঙ্গলামঙ্গলের কোন খবর না পেয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। ইসলামের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও দরদ-অনুভূতি আমার চেয়েও আপনার অনেক বেশী। আপনি যদি বাতেনী চোখের সাহায্যে সৈন্যবাহিনীর কোনরূপ অবস্থা অবগত হন তাহলে আমাকে তা জানিয়ে নিশ্চিন্ত ও খুশী করবেন। সুলতান পয়গামবাহীদের হেদায়াত করে দেন যে, ঐ মুহূর্তে হযরতের মুখ দিয়ে যাই বেরুবে তা সঙ্গে সঙ্গেই হেফাজত করবে এবং এর মধ্যে যেন কোন কম-বেশী না করা হয় এবং সুলতানের প্রেরিত পয়গাম পেঁাছায়। তিনি পয়গাম শোনা মাত্রই বাদশাহ্‌র বিজয়ের বর্ণনা দিতে শুরু করেন এবং বলেন, "এটা তো সামান্য ও নগণ্য বিজয়। আমরা আরও বড় বিজয়ের আশা রাখি।" একথা শুনে মালিক কারা বেগ এবং কাযী মুগীছুদ্দীন অত্যন্ত খুশী মনে ফিরে আসেন এবং সুলতানকে ঐ সুসংবাদ দেন। সুলতান তা শুনে অত্যন্ত খুশী হন। তিনি স্থির নিশ্চিত হন যে, বিরঙ্গীলের বিজয় হয়ে গেছে। ঐ দিন সালাতুল 'আসর সম্পন্ন করার অব্যবহতি পরই মালিক কাফুরের দূত এসে পেঁাছে এবং বিরঙ্গীলের বিজয়ের সংবাদ ব্যক্ত করে। জুম'আর দিন বিজয়-পত্র মসজিদের মিম্বর থেকে পড়ে শোনানো হয়। প্রাঙ্গণে খুশীর কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকে এবং আনন্দ-উৎসবের ধুম লেগে যায়।[১]

আরও একবার যখন মোগলরা দিল্লী আক্রমণোদ্যত হয়েছিল তখন সুলতান স্বয়ং যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি হযরত খাজা (রঃ)-এর খেদমতে আরয করেন, "এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক মুহূর্ত। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন।" এরপর হযরত খাজা নিজাম (রঃ) সমস্ত খানকাহ্‌বাসীদের লক্ষ্য করে বলেন, "আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ কর এবং তাঁরই দরগাহে মুসলমানদের জয়লাভের জন্য দু'আ' করতে থাক।" এরপর সবাই দু'আ' ও মুনাজাতে মগ্ন হয়ে যায় এবং অল্প কিছু পরেই বিজয়ের খবর এসে পেঁাছে। মোগলরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।[২]

কাযী যিয়াউদ্দীন সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজদরবারের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। তিনি বলেন যে, সুলতানের গোটা রাজত্বকালে তাঁর মুখ দিয়ে

১. তারীখে ফিরূযশাহী, ৩৩৩ পৃঃ
২. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃঃ ১৬০

হযরত খাজা (রঃ)-এর শানে কোন অমর্যাদাকর উক্তি কখনই বের হয়নি। যদিও দুশমন ও হিংসুটে স্বভাবের লোকেরা শায়খ (রঃ)-এর শাহী জাঁকজমক ও খানকাহ-মুখী জনস্রোত ও শাহী লঙ্গরখানার মত ব্যাপক ও বিস্তৃত কাণ্ডকারখানাকে সুলতানের চোখে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলতে কল্পনার রঙ মিশ্রিত এমন সব পন্থা-পদ্ধতি এখতিয়ার করত যাতে সুলতানের মনে শায়খ (রঃ)-এর প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। সুলতান কিন্তু কখনও সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করেন নি। বিশেষ করে রাজত্বের শেষ দিকে তিনি হযরতের প্রতি মাত্রাধিক পরিমাণে একনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন।

সুলতান কুত্‌বুদ্দীনের বিরোধিতা ও হত্যা

সুলতান 'আলাউদ্দীনের পর সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র কুত্‌বুদ্দীন মুবারক শাহ সাম্রাজ্যের যুবরাজ খিযির খানকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খিযির খান যেহেতু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মুরীদ ছিলেন এবং তিনিই (খিযির খান) মরহুম সুলতান 'আলাউদ্দীনের সিংহাসনের ন্যায্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন—যাঁর নিকট থেকে কুত্‌বুদ্দীন মুবারক শাহ ক্ষমতার মসনদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন—সেহেতু কুত্‌বুদ্দীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর প্রতি সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকতেন। সুলতান "জামে' মীরি" নামে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সকল বুযুর্গ ও 'উলামায়ে কিরামের উপর নির্দেশ ছিল যেন তাঁরা সেখানে গিয়ে সালাতুল জুম'আ আদায় করেন। সুলতানুল মাশায়িখ বলে পাঠান যে, "আমাদের নিকটেই একটি মসজিদ আছে। তার হক বেশী বিধায় আমরা সেখানেই সালাত আদায় করব।" তিনি অতঃপর জামে' মীরিতে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকেন। এতে বাদশাহ্ ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। উপরন্তু প্রতি চান্দ্র মাসের প্রথম দিনে আত্মীয়-বান্ধব এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শাহী দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ্‌র খেদমতে নযরানা পেশ করত। সুলতানুল মাশায়িখ এ অনুষ্ঠানেও শরীক হতেন না। প্রথা মাফিক রসম পালনের উদ্দেশ্যে স্বীয় খাদেম ইকবালকে পাঠিয়ে দিতেন। এতেও সুলতান আরো বিগড়ে যান। তিনি তাঁর সমস্ত উযীর ও আমীর-উমারাদের নির্দেশ দেন কেউ যেন হযরত খাজা নিজামুদ্দীনের যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে গিয়াছপুর না যায়।

৫—

আমীর খসরু (রঃ) লিখেছেন যে, বাদশাহ্‌র নির্দেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি শায়খের মাথা আনবে তাকে হাযার তংকা বখ্‌শিশ্‌ দেওয়া হবে। একদিন শায়খ যিয়াউদ্দীন রুমীর দরবারে সুলতান কুতুবুদ্দীন এবং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) সামনাসামনিও হয়ে যান। শায়খ একজন মুসলমান হিসেবে সুলতানকে সালাম জানান। সুলতান কুতুবুদ্দীন জবাবদানে বিরত থাকেন। এধরনের ঘটনাবলী চার বছরের শাসনামলে পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকে।[১] চান্দ্র মাসের প্রথম তারিখের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির ব্যাপারে পীড়াপীড়ির ঘটনা সবশেষে ঘটেছিল।

যাই হোক, অবশেষে সুলতান তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী খসরু খান কর্তৃক নিহত হবার পর এই বিরোধিতার অবসান ঘটে।

গায়েবী লঙ্গরখানা

ঐ যুগেই সুলতান কুতুবুদ্দীনের তরফ থেকে এব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি-ভাবে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল যে, দরবারের কোন আমীর-উমারা এবং সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে যেন কোনরূপ নযরানা হযরত খাজা (রঃ)-এর খেদমতে পেশ করা না হয়। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া এটা জানবার পর বিশেষভাবে তাকিদ দেন যেন পূর্বের তুলনায় বেশী করে খানা পাকানো হয় এবং দস্তরখানের পরিধি আরও অধিকতর প্রসারিত করা হয়। হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ) বলেন,

"একবার সুলতান কুতুবুদ্দীনকে কোন হিংসুটে বলে যে, শায়খ আমাদের হাদিয়া-নযরানা কবুল করেন না অথচ আমীর-উমারা ও সরদারদের আনীত নযরানা কবুল করেন। সুলতান কুতুবুদ্দীন এর সত্যতা অবহিত হবার পর নির্দেশ পাঠান যে, কোন আমীর অথবা সরদার শায়খ (রঃ)-এর ওখানে যাবে না। দেখ, তিনি এত পরিমাণ লোকের দাওয়াত কোথা থেকে করেন। অধিকন্তু তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। তাদের উপর দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল যেন তারা কোন আমীর খাজা (রঃ)-এর দরবারে গেলে তা লক্ষ্য রাখে এবং যথাসময়ে গিয়ে বাদশাহ্‌কে অবহিত করে। হযরত শায়খ (রঃ) একথা শোনার পর বলেন, আজ থেকে খাবার বেশী করে পাক করা হোক। বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর একদিন বাদশাহ্‌ লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন, শায়খের খানকাহ্‌র অবস্থা কি? তারা বলল যে, আগে যে পরিমাণ পাক করা হ'ত বর্তমানে তার দ্বিগুণ পাক করা হয়ে থাকে। একথা শোনার পর বাদশাহ অত্যন্ত

১. নিজামে তা'লীম, পৃষ্ঠা ২২০,

লজ্জিত হন এবং বলেন, আমিই ভুলের মধ্যে ছিলাম। তাঁর গোটা কারবারই তো গায়েবী জগতের।"[১]

গিয়াছুদ্দীন তুগলকের রাজত্বকাল এবং সরকারী বিতর্ক সভা

কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ্‌র পর কয়েক মাস খসরু খান অন্যায় ও যবরদস্তি-মূলকভাবে রাজত্ব করেন এবং ইসলামী প্রথা-পদ্ধতিকে হেয় করে ইসলামেরই অবমাননা করেন। ৭২১ হিজরীতে গিয়াছুদ্দীন তুগলক (মালিক গাযী) খসরু খানকে হত্যা করে তুগলক বংশের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। সুলতান গিয়াছুদ্দীন যদিও তেমন বিদ্যাবত্তার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু 'আলিম-'উলামা ও শরীয়তের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) সামা' শুনতেন। একারণে দিল্লীর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে এবং জনগণের আগ্রহ এর প্রতি বৃদ্ধি পায়।[২] শায়খযাদা হুস্‌সামুদ্দীন ফারজাম নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবত হযরত নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছিল, তথাপি মুজাহাদার গভীর আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং 'ইশ্‌কের অমূল্য নিয়ামত ও সম্পদ থেকে লাভবান হতে পারে নি। অধিকন্তু সাম্রাজ্যের উপ-শাসক কাযী জালালুদ্দীন আলুয়ালজীরও আহলে দর্দ ও 'ইশক (মা'রিফতপন্থী)-দের প্রতি এক ধরনের বিদ্বিষ্ট মনোভাব ছিল। কাযী সাহেব এবং অন্যান্য 'উলামায়ে কিরাম শায়খযাদা হুস্‌সামুদ্দীনকে নিজেদের মতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করল এবং সে বাদশাহ্‌র দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই বলে যে, খাজা নিজামুদ্দীন এ যুগের ইমাম। অথচ তিনি সামা' শোনেন যা ইমাম আ'জম আবূ হানীফার মাযহাব মতে হারাম। তাঁরই কারণে হাযার হাযার আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ এই অপ্রিয় ও নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত হচ্ছে। এ মসলা সম্পর্কে সুলতান ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর। তাঁর আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে যে, এতবড় একজন ইমাম এরূপ শরীয়ত-বিগর্হিত কর্মে লিপ্ত! লোকেরা সামা' হালাল হবার ফতওয়া এবং শরীয়তের কিতাবসমূহের বিভিন্ন রেওয়ায়েত বাদশাহ্‌র সামনে পেশ করে। বাদশাহ বললেন যে, যেহেতু 'উলামায়ে দীন সামা'র হারাম হবার সপক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁরা একে নিষেধ করে থাকেন সেহেতু হযরত খাজা (রঃ) এবং শহরের সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে

---

১. খায়রুল মাজালিস, পৃষ্ঠা ২০৩

২. সামা'র হাকীকত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এর আদব ও আহকাম সম্পর্কিত বাহাছ চতুর্থ অধ্যায় "স্বাদ ও বিভিন্ন অবস্থা" দেখুন।

আহ্বান করা হোক। অতঃপর একটি জলসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটি ফয়সালা করা হোক প্রকৃত সত্য কোন্‌টি। মীর খোরদের ভাষায় শুনুন:

"শাহী-প্রাসাদে হযরত খাজা (রঃ)-কে আহ্বান জানানো হ'ল। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) কাযী মুহীউদ্দীন কাশানী এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন নামক দু'জন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ও যুগশিক্ষক সমভিব্যাহারে শাহী প্রাসাদে তশরীফ আনেন। সর্বপ্রথম উপ-শাসক কাযী জালালুদ্দীন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-কে সম্বোধন করে ওয়াজ-নসীহত শুরু করেন এবং কিছু অশোভনমূলক উক্তি করেন। এমন কি এও বলেন যে, যদি এরপরও আপনি সামা'র হালাল হবার দাবি অব্যাহত রাখেন এবং তা শুনতে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন, শরা'র হাকীম হিসাবে আমি আপনাকে শাস্তি দেব। একথা শুনতেই হযরত খাজা (রঃ) বলে ওঠেন, যে পদের গর্বে গর্বিত হয়ে তুমি আজ এই কথা বলছ, তা থেকে তুমি অপসারিত হবে। অতঃপর এর ঠিক বার দিন পর কাযী স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হয়ে দিল্লী থেকে বিদায় নেন। সংক্ষেপে ঘটনা এই যে, উক্ত বিতর্ক মজলিসে সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আমীর-উমারা এবং পদস্থ সরকারী কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহ এবং উপস্থিত সকলেরই হযরত খাজা (রঃ)-এর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সকলেই তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। শায়খযাদা হুস্‌সাম তখন বললেন, আপনার মজলিসে সামা' হয়ে থাকে, লোকেরা নৃত্য করে এবং আহ্ উহ্ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকে। তিনি এধরনের অনেক কথা বললেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চেঁচিও না, বেশী কথা বলার দরকার নেই। আগে বল যে, সামা'র সংজ্ঞা কি ? প্রত্যুত্তরে শায়খযাদা হুস্‌সাম বললেন, আমি জানি না। অবশ্য এতটুকু জানি যে, 'উলামায়ে কিরাম সামা'কে হারাম বলে থাকেন। হযরত খাজা (রঃ) বললেন, সামা'র অর্থ যখন তোমার জানা নেই তখন তোমাকে আমার বলার কিছু নেই, আর বলাও উচিত নয়। এতে শায়খযাদা হুস্‌সাম লজ্জিত হন। বাদশাহ গভীর আগ্রহের সাথে তাঁর তাকরীর (বক্তৃতা) শুনছিলেন। যখনই কেউ জোরে কথা বলতে চেষ্টা করত তখনই তিনি বলতেন, চেঁচিও না। শোন, শায়খ (রঃ) কি বলছেন। মজলিসে উপস্থিত 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে মাওলানা হামীদুদ্দীন এবং মাওলানা শিহাবুদ্দীন মুলতানী নিশ্চুপ ছিলেন; মাওলানা হামীদুদ্দীন এতটুকু বললেন যে, বাদী হযরত খাজা (রঃ)-এর মজলিসের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিলেন তা ঘটনার বিপরীত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। আমি নিজে দেখেছি এবং বহু বুযুর্গ ও দরবেশকেও আমি সেখানে দেখেছি।

ঠিক সেই মুহূর্তে শায়খুল ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (রঃ)-এর দৌহিত্র মাওলানা 'আলামুদ্দীন এসে উপস্থিত হন। বাদশাহ তাঁকে বললেন যে, আপনিও একজন 'আলিম এবং পর্যটকও বটেন। এক্ষণে সামা' নিয়ে বাহাছ হচ্ছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—সামা' শ্রবণ হালাল, না হারাম? মাওলানা 'আলামুদ্দীন বললেন, আমি এসম্পর্কে একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেছি এবং সেখানে এর হারাম ও হালাল হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণও উপস্থাপিত করেছি। আমার গভীর পর্যবেক্ষণের ফলাফল এই যে, যে হৃদয় দিয়ে শোনে তার জন্য সামা' হালাল, আর যে ব্যক্তি নফস (রিপু, প্রবৃত্তি)-এর সাহায্যে শোনে তার জন্য এটা হারাম। এরপর বাদশাহ মাওলানা 'আলামুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করেন,----আপনি বাগদাদ, শাম (সিরিয়া), তুরস্ক প্রভৃতি শহরসহ সর্বত্রই প্রায় ভ্রমণ করেছেন। সেখানকার বুযুর্গ ও মাশায়িখে কিরাম সামা' শোনেন কিনা? সেখানে কি কেউ কাউকে তা শুনতে মানা করে? মাওলানা 'আলামুদ্দীন উত্তরে বললেন যে, ঐ সমস্ত শহরে বুযুর্গ ও মাশায়িখে কিরাম সামা' শুনে থাকেন। আর কেউ কেউ তো দফ এবং শাবানা সহকারে তা শুনেন, কেউ মানা করে না। আর সামা' তো মাশায়িখে কিরামের মধ্যে হযরত জুনায়দ (রঃ), হযরত শিবলী (রঃ)-এর সময় থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে। বাদশাহ মাওলানা 'আলামুদ্দীনের মুখের এমত বর্ণনা শোনার পর নিশ্চুপ হয়ে যান এবং আর কিছুই বলেন নি। মাওলানা জালালুদ্দীন আরয করেন যে, বাদশাহ যেন সামা' হারাম হবার ফরমান জারি করেন এবং ইমাম আ'জম আবু হানীফা (রঃ)-এর মাযহাবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। এতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বাদশাহকে বললেন, আমি চাই যে, আপনি এ ব্যাপারে কোন ফরমান যেন জারি না করেন এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ ফয়সালা পেশ করতে বিরত থাকেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন (যিনি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন)-এর বর্ণনা এই যে, চাশতের প্রথম ওয়াক্ত থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত বাহাছ অব্যাহত থাকে। মজলিসে উপস্থিত কোন ব্যক্তিই এর হারাম হবার সপক্ষে দলীল পেশ করতে পারে নি। অপর আর একটি বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, বাদশাহ ফয়সালা করেন যে, হযরত খাজা (রঃ) সামা' শুনতে পারেন। কেউ এ থেকে তাঁকে নিষেধ করতে পারবে না। কিন্তু এ বর্ণনাটি পরিত্যক্ত। ঐ দিনগুলিতে কেউ হযরত খাজা (রঃ)-কে বলেন যে, এখন তো সামা'র সপক্ষে বাদশাহ্‌র ফরমান মিলে গেছে। যে সময় যে মুহূর্তে চাইবেন, সামা' শুনবেন। এটা তো হালাল হয়ে গেছে। হযরত খাজা (রঃ) বললেন, যদি তা হারাম হয় তবে কারো বলায় তা হালাল হতে পারে না। আর যদি হালাল হয় তবে কারো বলায় তা হারাম

হতে পারে না। মজলিস সমাপ্তির পর বাদশাহ হযরত খাজা (রঃ)-কে অত্যন্ত তা'জীম ও তাকরীমের সঙ্গে বিদায় দেন।[১]

হযরত খাজা (রাঃ)-এর যবানীতে বির্তক সভার অবস্থা

কাযী যিয়াউদ্দীন বার্নী স্বীয় গ্রন্থ "হাসরতনামায়" লিখেন যে, হযরত খাজা (রঃ) উক্ত মজলিস থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে তশরীফ আনেন এবং জোহরের ওয়াক্তে মাওলানা মুহীউদ্দীন কাশানী এবং আমীর খসরুকে ডেকে পাঠান। তিনি ইরশাদ করেন যে, দিল্লীর 'উলামাদের অন্তর হিংসা ও দুশমনীতে ভরা। তারা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত ময়দান পেয়েছে এবং শত্রুতামূলক বহু কথাবার্তা বলেছে। সব চেয়ে এটাই আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম যে, সহীহ্ হাদীছ শোনাটা পর্যন্ত এরা মেনে নিতে পারছে না। এর জবাবে তারা এটাই বলে যে, আমাদের শহরে হাদীছের তুলনায় ফিকাহ্ই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এ কথা শুধু সে-ই বলতে পারে যার হাদীছে নববী (সঃ)-এর উপর আদৌ কোন ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। আমি যখনই কোন সহীহ হাদীছ পড়তে থাকি তখনই তারা নারায হয়ে থাকে যে, এ হাদীছ দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ দলীল দিয়ে থাকেন এবং তিনি আমাদের 'উলামাদের দুশমন বিধায় আমরা তা শুনব না। জানি না এদের আদৌ কোন 'আকীদা আছে কিনা। এরা শাসকের (উলূল আমর) সামনে এরূপ যবরদস্তিমূলকভাবে কাজ-কারবার করে এবং সহীহ হাদীছ পাঠকে থামিয়ে দেয়। এমন 'আলিম আমি দেখিওনি আর এ ধরনের 'আলিমের কথা শুনিওনি যে তার সামনে সহীহ হাদীছ পাঠ করা হয় অথচ সে বলে যে আমি শুনব না। আমি বুঝতে পারি না যে, আসলে রহস্যটা কি। আর যে শহরে এরূপ ধৃষ্টতা ও যবরদস্তি দেখানো হয়, সে শহর কি করে টিকে থাকতে পারে! এর প্রতিটি দালান-কোঠার ইট-কাঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও তা মোটেই তাজ্জবের ব্যাপার হবে না। এর পর বাদশাহ, আমীর-উমারা এবং সাধারণ জনগণ শহরের কাযী ও 'উলামাদের থেকে এটা শুনবে যে, এই শহরে হাদীছের উপর 'আমল করা হয় না। তা'হলে হাদীছে নববী (সঃ)-এর উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা কি করে থাকবে? আমার ভয় হয় যে, না জানি 'উলামাদের এধরনের অশ্রদ্ধা ও বেয়াদবীর কারণে আসমান থেকে কোন বালা-মুসীবত, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী অবতীর্ণ হয়।[২]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ৫২৭-৩২ ;

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫২৭ পৃঃ

দিল্লীর ধ্বংস

এই ঘটনার ঠিক ষষ্ঠ বছরে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর ওফাতের পর সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের পুত্র ও উত্তাধিকারী মুহাম্মাদ তুগলক দিল্লী খালি করার এবং দেবগীরে (দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থানান্তরের ফরমান জারি করেন এবং এব্যাপারে এরূপ জিদ ও ক্ষিপ্ততার আশ্রয় নেন যে, বাস্তবে শহরের প্রতিটি ইট ঝনঝনিয়ে ওঠে এবং দিল্লীর মত কোলাহল-মুখর একটি শহর ঘনবসতির কারণে যেখানে লোকের থাকার জায়গা পাওয়া যেত না এমনভাবে জনশূন্য হয়ে পড়ে যে, বন্য পশু ও হিংস্র প্রাণী ব্যতিরেকে কোন জীবিত প্রাণীর চেহারা পর্যন্ত সেখানে দৃষ্টিগোচর হ'ত না।

মুহাম্মাদ কাসিম তারীখে ফিরিশতায় লিখেন যে, সরকারী কর্মকর্তারা একটি লোককেও দিল্লীর আলো-বাতাসে তিষ্ঠোতে দেয়নি। সবাইকে জড়ে-মূলে দৌলতাবাদ (দেবগীর) পাঠিয়ে দেয়। ফলে দিল্লী এমনিভাবে বিরান ও জনশূন্য হয়ে পড়ে যে, একমাত্র শকুন, শিয়াল ও বন্য জন্তু ছাড়া আর কোন জীবজন্তু কিংবা জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দও সেখানে পাওয়া যেত না।[১]

যে সমস্ত 'উলামা উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ছাড়া অন্যান্যরাও তাদের বদৌলতে দৌলতাবাদে নির্বাসিত হয়। দৌলতাবাদ পেঁৗছার পর সেখানকার দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর মুকাবিলা করতে হয়। হাযার হাযার নর-নারী তো রাস্তাতেই মারা যায়। হাযার হাযার সেখানে পেঁৗছা মাত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শিকারে পরিণত হয়। আর এভাবে হযরত খাজা (রঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়।

সময়ের ব্যবস্থাপনা

আমীর খোরদ হযরত খাজা (রঃ)-এর সময়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখেছেন যে, "প্রতিদিন ইফতারের পর (যা আহলে জামা'আতের সাথেই হ'ত) স্বীয় বালাখানার বিশ্রামস্থলে তশরীফ নিতেন। বন্ধু-বান্ধব ও সেবকবৃন্দ যারা সাধারণত শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসত — মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে তাদেরকে প্রাসাদের উপরেই ডেকে পাঠানো হ'ত। প্রায় এক ঘন্টাকাল সময় পারস্পরিক সহাবস্থান ও সান্নিধ্য এবং সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ঘটত। বিভিন্ন রকমের শুকনো ও তাজা ফল-মূলাদি, সুস্বাদু ও রুচিকর খাবার এবং নানা প্রকার পানীয় দ্রব্যাদি হাযির করা হ'ত। মজলিসে

১. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড ২৪৩ পৃঃ

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এসব গ্রহণ করত। তিনি প্রত্যেকের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করতেন এবং প্রত্যেকের শুভাশুভ অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।"[১]

আমীর খসরুর বৈশিষ্ট্য

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) 'ইশার সালাত সম্পাদনের জন্য অতঃপর নীচে অবতরণ করতেন। জামাতের সাথে সালাত আদায়ের পর পুনরায় প্রাসাদে তশরীফ রাখতেন। কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন, অতঃপর আরাম ও বিশ্রাম সুখ ভোগ করবার জন্য চারপায়ীর উপর শরীর এলিয়ে দিতেন। সে সময় খাদেম তসবীহ্ এনে হযরত খাজা (রঃ)-এর হাতে উঠিয়ে দিতেন। এই সময়ে একমাত্র আমীর খসরু ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর সান্নিধ্যে আসতে সাহস পেত না।[২] তিনি হযরত খাজা (রঃ)-এর সামনে বসে নানা ধরনের কাহিনী ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি খোশমেযাজে থাকা অবস্থায় মাথা নেড়ে দিতেন। সময়ে অসময়ে জিজ্ঞেস করতেন যে, তুর্ক! কি খবর? আমীর খসরু এতটুকু শোনা মাত্রই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মওকা বের করে নিতেন। তিনি একটু সূত্রের উল্লেখ করতেই আমীর খসরু গোটা ফিরিস্তিই পেশ করে দিতেন।

রাত্রের প্রস্তুতি

যখন আমীর খসরু এবং সাহেবযাদাগণ অনুমতি নেবার পর বিদায় হতেন তখন খাদেম ইকবাল এসে পানি ভর্তি কয়েকটি পাত্র উযূর জন্য রেখে দিয়ে বাইরে চলে যেত। এরপর হযরত খাজা (রঃ) স্বয়ং উঠতেন এবং দরজায় শেকল লাগিয়ে দিতেন। তারপর সেখানকার খবর একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ

১. সিয়ারুল আওলিয়া ১২৫ পৃষ্ঠা;

২. হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর সঙ্গে আমীর খসরুর যে গভীর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা তার জীবন-চরিত ও দিওয়ান পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফুলের সাথে বুলবুলের যে সম্পর্ক এবং আগুনের সাথে পতঙ্গের যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে ঠিক তেমনি সম্পর্ক ছিল আমীর খসরুর স্বীয় মুরশিদ হযরত খাজা (রঃ)-এর সঙ্গে। হযরত খাজা (র)-এরও এই সত্যিকার ও খাঁটি 'আশিকের সাথে এতখানি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যে, তিনি বলতেন, من از همه تنگ آیم و از تو تنگ نیایم অর্থাৎ কখনো কোন মুহূর্তে উদাস, নিঃসঙ্গ ও বিরক্ত বোধ করি কিন্তু এমতাবস্থায়ও তোমার সাথে তা হয় না। আরও একবার তিনি বলেছিলেন, "কখনও কখনও নিজেকেও নিজের কাছে বিরক্তিকর ও অসহ্য লাগে. কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা মনে হয় না।" (সিয়ারুল আওলিয়া, ৩০২ পৃষ্ঠা।

জানে না। । আল্লাহই জানেন যে সারা রাত ধরে একান্তে ও নিভৃতে কি সব গোপন আলাপ হ'ত এবং স্বীয় মহান প্রভু প্রতিপালকের সাথে কি গভীর আকুতি ও অনুরাগের কথা হ'ত।

সাহরী

সাহরীর ওয়াক্ত হলে খাদেম এসে হাযির হত এবং বাইরে থেকে দরজায় নক্ (দস্তক) করত। হযরত খাজা (রঃ) দরজা খুলে দিতেন। সাহরী—যার ভিতর বিভিন্ন রকমারী খাদ্যদ্রব্য থাকত—সামনে রাখা হ'ত। তিনি এথেকে খুব অল্প পরিমাণেই গ্রহণ করতেন। অবশিষ্ট অংশটুকুর জন্য বলতেন যে, এগুলি বাচচাদের জন্য হেফাজতে রেখে দাও। খাজা 'আবদুর রহীম যিনি সাহরী নিয়ে যাবার দায়িত্বে ছিলেন, বলেন, অধিকাংশ সময়ই এমন হ'ত যে, তিনি সাহরী গ্রহণ করতেন না। আমি আরয করতাম, হযরত! এমনিতেই ইফতারীর মুহূর্তেও আপনি খুব কমই খান। যদি সাহরীও কিছু গ্রহণ না করেন তবে শারীরিক দুর্বলতা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। একথা শোনা মাত্রই তিনি কাঁদতে থাকতেন এবং বলতেন যে, কত গরীব ও অসহায় মসজিদের কোণায় ও চত্বরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে আছে, অনাহারে রাত কাটিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় এ খানা আমি কিভাবে গলাধঃকরণ করতে পারি। অধিকাংশ সময় তাই দেখা গেছে যে, সাহরীর সময় যা এনেছি তাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছি।

ভোর বেলায়

দিনের বেলায় যারই দৃষ্টি তাঁর চেহারা মুবারকের উপর পড়ত সেই দেখতে পেত প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়িসদৃশ একটি চেহারা, আর চোখ সারা রাত বিনিদ্র যাপনের কারণে লাল। এরূপ কঠোর মুজাহাদার কারণেও তাঁর ভিতর কখনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হ'ত না, কিংবা তাঁর কোন স্বাভাবিক আচার-আচরণে কোনরূপ পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হ'ত না। কেউ বলতেও পারত না যে, তিনি চার শ' অথবা পাঁচ শ' রাকাত সালাত আদায় করতেন কিংবা তিনি এই পরিমাণ তসবীহ পাঠে অভ্যস্ত। তাঁর জীবন ও জিন্দেগী এভাবে কাটত যে, সে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ অবহিত ছিল না।

দিনের বেলায়

প্রত্যহ দিনের বেলা তিনি স্বীয় মাশায়িখের মুসাল্লার (জায়নামায) উপর কেবলামুখী হয়ে গভীর আত্মনিমগ্নতার ভেতর অতিবাহিত করতেন যেন তিনি

আল্লাহ্‌কে দেখছেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকই থাকত। ‘উলামায়ে কিরাম, মাশায়িখ, শ্রদ্ধেয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ইতর ভদ্র, প্রত্যেকের বিদ্যা-বুদ্ধি ও মর্যাদা মুতাবিক যার যে বিষয় সেই বিষয়েই তিনি তার সাথে কথা বলতেন এবং তার সন্তুষ্টি সাধন করতেন। বাহ্যত তিনি তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তিনি মশগুল থাকতেন স্বীয় পরম আরাধ্য-প্রেমাস্পদকে নিয়ে।[১]

মনস্তুষ্টি সাধন ও প্রশিক্ষণ

জোহ্‌রের ওয়াক্ত হ’ত। সালাত আদায়ের পর যে সমস্ত আত্মীয়-বান্ধব কদমবুসির জন্য আসত, তাদেরকে আহ্বান করা হ’ত এবং তাদের মনস্তুষ্টি সাধনের কথাবার্তায় তিনি কিছু সময় অতিবাহিত করতেন। ‘ইবাদত-বন্দেগী, সলূক এবং আল্লাহ্‌র মুহব্বত সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় হেদায়াত করতেন। যবরদস্ত ‘আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তিরও (যারা সে মজলিসে উপস্থিত থাকতেন) সাহস হ’ত না যে, মাথা উঁচিয়ে তাঁর চেহারা মুবারকের প্রতি লক্ষ্য করবে। এটাই ছিল আল্লাহ্-প্রদত্ত তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার প্রকাশ।

ওফাত নিকটবর্তী হ’লে

বয়স আশি বছর অতিক্রান্ত হতেই তাঁর মধ্যে পরলোক যাত্রার সমূহ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। একদিন তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে রাসূলে মকবুল (সঃ)-কে দেখলাম। হুযুর (সঃ) বললেন, “নিজাম! তোমার সান্নিধ্য আমি গভীর-ভাবে কামনা করছি।”[২]

মর্যাদাশীল খলীফাদের এজাযতনামা প্রদান, মুহব্বত ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব

রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি কতিপয় হযরতকে খিলাফতনামা প্রদান করেন এবং এজাযতনামা লিখে দেন। মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবী নিবন্ধ রচনা করেন এবং সায়্যিদ হুসায়ন কিরমানী তা লিপিবদ্ধ করেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) এর উপর দস্তখত করেন। দস্তখতের ভাষা ছিল নিম্নরূপ:

من الفقير محمد ابن احمد ابن على البداؤنى البخارى

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৫ ও ১২৯ পৃষ্ঠা,

২. ঐ, ১৪১ পৃষ্ঠা;

'দীনাতিদীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে 'আলী আল-বাদায়ূনী আল-বুখারীর পক্ষ থেকে।' এই এজাযতনামার উপর ৭২৪ হিজরীর ২০শে যিলহজ্জ তারিখের উল্লেখ ছিল। এ থেকে জানা যায় যে, এটা ওফাতের তিন মাস ২৭ দিন পূর্বে লেখা হয়েছিল।[১]

যে সমস্ত মহাত্মার জন্য এ এজাযতনামা প্রস্তুত করা হয়েছিল তা তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত মহাত্মা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন তাঁদের হাতে তা প্রদান করা হয়। প্রথমে শায়খ কুতুবুদ্দীন মুনাওয়ারকে আহ্বান করা হয়। সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ) তাঁকে খিলাফতনামা প্রদান করেন। ইরশাদ হ'ল,—যাও। এর শুকরিয়া স্বরূপ দু'রাকাত শোকরানা সালাত আদায় কর। বন্ধু-বান্ধব তাঁকে মুবারকবাদ জানান। এ সময়েই শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দিল্লীকে তিনি স্মরণ করেন। তাঁকেও খিরকা, খিলাফত ও এজাযতনামা প্রদান করেন এবং ওসিয়ত করেন। শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমূদ চেরাগে দিল্লী কেবলই দাঁড়িয়েছেন এমনি সময়ে শায়খ কুতুবুদ্দীন মুনাওয়ারকে পুনরায় ডাকা হয়। তিনি এলে হযরত খাজা (রঃ) ইরশাদ করেন—শায়খ নাসিরুদদীন মাহমূদের খিলাফত প্রাপ্তিতে তাঁকে মুবারকবাদ জানাও। অনুরূপ আদেশ শায়খ নাসিরুদ্দীন মাহমূদের প্রতিও করা হয়। অতঃপর উভয়েই উভয়ের খিলাফত প্রাপ্তিতে পরস্পরকে মুবারকবাদ জানান এবং একে অপরে কোলাকুলি করার আদেশ প্রাপ্ত হন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) অতঃপর বলেন, তোমরা উভয়ে পরস্পরের ভাই। কে আগে খিলাফত পেলে আর কে পরে পেলে এ নিয়ে মনে কিছু করবে না।[২]

ওফাতের অবস্থা

ওফাতের ৪০ দিন পূর্বে ইস্তিগরাক ও আশ্চর্যজনক এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমীর খোরদ ওফাতের অবস্থা বিস্তারিতভাবে সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ :

সেদিন ছিল শুক্রবার। জুম'আর দিন। সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর উপর এক অত্যাশ্চর্য অবস্থা বিরাজ করছিল। নূরে তাজাল্লী দ্বারা তাঁর অভ্যন্তরীণ ভাগ উজ্জ্বল ও আলোকিত মনে হচ্ছিল। সালাতের ভিতর বারবার সিজদা দিচ্ছিলেন। এরূপ অদ্ভুত আশ্চর্যজনক অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি ঘরে

১. হযরত খাজা (রঃ)-এর ওফাত হয় ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবিউছছানী মাসে।
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ২২০-২১ পৃষ্ঠা ও ৪৮--৪৯ পৃষ্ঠা।

তশরীফ নেন কান্নার বেগ বাড়তে থাকে। প্রত্যহ বার কয়েক বেহুঁশ ও ইস্তিগরাকের হালতে পৌঁছে যান। আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হন। বলতে থাকেন যে, আজ জুম'আর দিন; দোস্ত তার দোস্তের ওয়াদার কথা স্মরণে আনছে। এরপরই তিনি আপন ভুবনে ডুবে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায়ও তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন—সালাতের ওয়াক্ত কি হয়ে গেছে? আমি কি সালাত আদায় করেছি? যদি জওয়াব দেওয়া হ'ত যে, আপনি সালাত আদায় করেছেন, তখন বলতেন, আবারও পড়ে নিই। এভাবেই প্রতিটি ওয়াক্তের সালাতই তিনি দু'বার পড়তেন। যতদিন তিনি এরূপ অবস্থায় ছিলেন ততদিন এই দু'টি কথারই পুনরাবৃত্তি করতেন,—'আজ জুম'আর দিন'—'আমি কি সালাত আদায় করেছি?'

এ সময়েই একদিন তিনি সমস্ত খাদেম ও মুরীদ যারা তখন উপস্থিত ছিলেন সবাইকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা সাক্ষী থাক যে, যদি ইকবাল (খাদেম) ঘরের আসবাব-দ্রব্যাদির ভেতর থেকে কোন একটি জিনিসও অতিরিক্ত সঞ্চয় করে থাকে তবে আগামীকাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে এজন্য অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। খাদেম ইকবাল আরয করল যে, আমি কোন কিছুই সঞ্চয়ের জন্য মওজুদ করি নাই, ঘরেও রাখি নাই বরং সব কিছুই সাদকাহ্ করে দিয়েছি। প্রকৃতই উক্ত নওজোয়ান এরূপই করেছিল। কয়েকদিনের প্রয়োজনোপযোগী সামান্য কিছু খাদ্যশস্য খানকাহ্‌র ফকীর ও দীনদরিদ্রের জন্য রেখে বাদবাকী সব কিছুই বণ্টন করে দিয়েছিল। আমার চাচা সায়্যিদ হুসায়ন আমাকে অবহিত করেন যে, খাদ্যশস্য ছাড়া আর সব কিছুই অভাবী ও প্রার্থীদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। এ তথ্য অবগত হয়ে সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) স্বীয় খাদেম ইকবালের উপর নারায হন। তাকে ডাকা হয় এবং তাকে তিনি বলেন যে, এই নাপাক ধূলি-কণাকে কেন রেখেছ? ইকবাল আরয করল যে, খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য আর যা কিছু ছিল সব কিছুই বণ্টিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, যেখানে যে আছে সে সব লোকজনকে ডাক। লোকজন উপস্থিত হলে তিনি বললেন, খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার ভেঙে দাও এবং সমস্ত খাদ্যশস্য নির্বিঘ্নে উঠিয়ে নিয়ে যাও। এর পর ঝাড়ু দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেল। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই লোকজন সমবেত হয় এবং খাদ্যশস্য দেখতে না দেখতে নিঃশেষে উঠিয়ে নিয়ে যায়। রোগাক্রান্ত থাকাকালীন কতিপয় বন্ধু-বান্ধব ও খিদমতগার এসে হাযির হয় এবং তারা জিজ্ঞেস করে যে, গরীবদের বর্তমান

আশ্রয়স্থলের অবর্তমানে আমাদের ন্যায় হতভাগা মিসকীনদের অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন, এখানে এত পরিমাণ পাবে যদ্দ্বারা তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন বেশ ভালভাবেই চলে যাবে। আমি কতক বিশ্বস্ত বুযুর্গের মুখ থেকে শুনেছি যে, লোকেরা আরয জানায়, আমাদের মধ্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে হবেন?[১] তিনি বলেছিলেন,—যার ভাগ্য তাকে মদদ করবে। কতক দোস্ত ও খাদেম আমার নানা মাওলানা শামসুদ্দীন ওয়ামেগানীর নিকট আরয জানায় যেন তিনি সুলতানুল মাশায়িখকে জিজ্ঞেস করেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি আপন আপন 'আকীদা অনুযায়ী নিজ আয়ত্তাধীন এলাকার মধ্যে বড় বড় ইমারত বানিয়ে ফেলেছে এবং সবারই নিয়ত এই যে, আপনি তার ইমারতে আরাম করবেন (অর্থাৎ উক্ত ইমারত আপনার দাফনগাহ হবে)। যদি উক্ত অনিবার্য অবস্থা এসে যায় তবে কোন ইমারতে আপনাকে দাফন করা হবে? মাওলানা শামসুদ্দীন এই পয়গাম হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর খেদমতে পেঁছালে তিনি বলেন, আমি কোন ইমারতের নীচেই দাফন হতে চাই না। জঙ্গলের নিরিবিলিতেই আমি মাটির খোরাকে পরিণত হতে চাই। অতঃপর এমনটিই হয়েছিল। তাঁকে ময়দানের বাইরে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক তাঁর কবরের উপর গুম্বজ নির্মাণ করেন।

ওফাতের ৪০ দিন পূর্ব থেকেই তিনি খাদ্য গ্রহণ একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমন কি খাদ্যের ঘ্রাণ পাওয়াকেও তিনি সহ্য করতেন না। কান্নার বেগ এত বেশী ছিল যে, ক্ষণিকের তরেও অশ্রু বিসর্জনে বিরতি ছিল না।

এই সময়েই একদিন আখী মুবারক মাছের শুরুয়া নিয়ে হাযির। ভক্তবৃন্দ বহু চেষ্টা করল যেন তিনি এ থেকে কিছু অন্তত গ্রহণ করেন। সুলতানুল মাশায়িখ জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? বলা হ'ল যে, এটা মাছের অল্প কিছু শুরুয়া। একথা শোনার পর তিনি বললেন, প্রবাহিত পানিতে এটা নিক্ষেপ কর। এ থেকে এতটুকু পরিমাণও তিনি গ্রহণ করলেন না। আমার চাচা সায়্যিদ হুসায়ন আরয করলেন, আজ কয়েক দিন অতিবাহিত হতে চলল—হুযূর খানাপিনা একদম ছেড়ে দিয়েছেন। শেষ অবধি এর ফলাফল কি দাঁড়াবে? তিনি বললেন, সায়্যিদ, যে হুযূর আকরাম (সঃ)-এর মুলাকাতের গভীর আগ্রহী তার পক্ষে দুনিয়ায় পুনরায় খাবার গ্রহণ আদৌ কি সম্ভব। মোট কথা চল্লিশ দিন পর্যন্ত এভাবেই তিনি খানাপিনা থেকে বিরত থাকেন। এক দানাও তিনি গ্রহণ

---

১. সম্ভবত ভাবী আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও খলীফা সম্পর্কেই এ প্রশ্ন ছিল।

করেননি। এর পর তিনি কথাও খুব কম বলেছেন। ওফাতের দিন বুধবার পর্যন্ত এরূপ অবস্থায়ই কাটে।

১৮ই রবিউছ্ছানী ৭২৫ হিজরী বেলা উঠার পর যুহ্দ ও 'ইবাদত, হাকীকত ও মা'রিফত এবং হেদায়াত ও সত্যের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা অস্তমিত হয়ে যায়।

জানাযা পড়ান শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন নুবায়রা শায়খুল ইসলাম বাহা-উদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী। জানাযার পর শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন বলেন :

এখন আমি জানতে পারলাম যে, আমাকে চার বছর পর্যন্ত দিল্লীতে এজন্যই রাখা হয়েছিল যেন আমি এই জানাযার ইমামতি দ্বারা সৌভাগ্য হাসিল করি।[১]

সারাটা জীবন একাকীত্বের মধ্যে কেটেছিল বিধায় তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। রূহানী সিলসিলা ছিল সারা হিন্দুস্তানে পরিব্যাপ্ত এবং এখনও তা অব্যাহত আছে।

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৫২-৫৪ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

চরিত্র ও গুণাবলী

সামগ্রিক গুণাবলী

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত, সামগ্রিক ও সঠিকতম পরিচিতি সেই শব্দসমষ্টির ভিতর নিহিত যা খিলাফত প্রদানের মুহূর্তে তাঁর বহুদর্শী শায়খ ও মুরশিদ (শায়খুল কবীর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি)-এর পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—

باری تعالی ترا علم و عقل و عشق داده است و هر که بدین
صفت موصوف باشد از و خلافت مشائخ نیکو آید

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে 'ইল্ম ও 'আকল এবং 'ইশকের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। আর এ সমস্ত গুণাবলীর যিনি আঁধার হবেন তিনি মাশায়িখে কিরামের তরফ থেকে খিলাফতের অর্পিত যিম্মাদারী অতি উত্তমভাবে আদায়ে সক্ষম।

হযরত খাজা (রঃ)-এর জীবন ও চরিত্র উপরোক্ত গুণাবলীর সামগ্রিকতা দ্বারা সুসজ্জিত। তাঁর চরিত্রে 'ইল্ম, 'আকল ও 'ইশ্ক এই তিনটি দিকই পরিদৃষ্ট হয়। মুহব্বত, প্রকৃত মা'রিফত এবং শ্রেষ্ঠ বুযুর্গগণের তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) ও সোহবত (সাহচর্য) যা উৎকৃষ্টতম প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও সুফল দান করতে পারে এবং যার উৎকৃষ্টতম সমষ্টির নাম শেষ যুগে তাসাওউফের উপর গিয়ে পড়েছে অর্থাৎ ইখলাস ও আখলাক (বিশুদ্ধচিত্ততা ও চরিত্র-ব্যবহার) তার উৎকৃষ্টতম নমুনা তাঁর জীবনে পরিদৃষ্ট হয়।

ইখলাস

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর জীবনে মহামূল্যবান সম্পদ যা তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের উপরই শুধু নয় বরং ইসলামের মনীষীবৃন্দের মধ্যেও একটি সমুন্নত মর্যাদা, শুধু স্বীয় যমানারই নয় বরং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন যুগেও সাধারণ স্বীকৃতি ও চিরন্তন স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং তাঁকে জনপ্রিয়তার বিশিষ্ট পুরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করেছে, তা তওহীদ ও ইখলাসের সেই বিশিষ্ট অবস্থা ও স্বাদ যার মধ্যে মুহব্বত (ঐশী-প্রেম) ও রিযায়ে

ইলাহী (আল্লাহ্র সন্তুষ্টি) ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই আর কাম্য ও লক্ষ্য থাকে না। মুহব্বত ও য়াকীনের প্রেমাগ্নি সকল প্রকারের কণ্টকময় প্রতিবন্ধকতাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দুনিয়া-প্রীতি, জৌলুসপ্রীতি এবং এ ধরনের সকল প্রেমের কামনা-বাসনার মূল উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল।

আমীর হাসান 'আলী সজযী বর্ণনা করেন যে, একবার মজলিসে আলোচনা চলছিল যে, কিছু লোক মসজিদে অবস্থান করে এবং সেখানেই কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে ও নফল আদায় করে। আমি আরয করলাম যে, যদি নিজের ঘরেই অবস্থান করে তবে তা কেমন হবে। তিনি বললেন, ঘরে এক পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মসজিদে একবার সমগ্র কুরআন শরীফ খতম করার চাইতে উত্তম। এ প্রসঙ্গেই এ আলোচনা উত্থাপিত হয় যে, বিগতকালে এক ব্যক্তি দামিশকের জামে মসজিদে সারারাত নফল 'ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকত এই লোভে যে, এতে তার খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে শায়খুল ইসলাম পদে (যা শূন্য ছিল) তার নিযুক্তিও মিলে যেতে পারে। এ কথা শোনার পর হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি বলে উঠেন,

بسوز اول شیخ الاسلامی را وپس خانقاه را و بعد ازان خودرا

"এমন শায়খুল ইসলামের গদীতে আগে আগুন লাগিয়ে দাও, এরপর আগুন লাগিয়ে দাও তার খানকাহ্তে। এরপর খোদ শায়খুল ইসলামকেই জ্বালিয়ে দাও।"[১]

তিনি নিজের সম্পর্কেই শুধু নয়, স্বীয় খলীফা ও স্থলাভিষিক্তদের মধ্যেও (যাদের দ্বারা সত্যতা, আখলাক এবং আত্মশুদ্ধির খেদমত নেওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য) লক্ষ্য করতেন যে, তারা ইখলাসের এমনতরো মকামে পৌঁছে গিয়েছিল যে, জাঁকজমক ও জৌলুসপ্রীতি তাদের অন্তর-মানস থেকে একদম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা ফসীহুদ্দীন প্রশ্ন করেছিলেন যে, বুযুর্গদের খিলাফতের হকদার সাধারণত কারা হয়ে থাকেন। উত্তরে হযরত খাজা (রঃ) বললেন, کسے را که در خاطر او وقوع خلافت نباشد

"তিনিই খিলাফতের হকদার বলে বিবেচিত হবার যোগ্য হয়ে থাকেন যিনি এর প্রত্যাশী নন এবং নন এর প্রতি সামান্যতম আগ্রহীও।"[২]

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ২৪
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন যে, একবার তাঁকে তাঁর একজন বিশিষ্ট খাদেম সম্পর্কে —যাকে ইজাযত প্রদান করা হয়েছিল---অবহিত করা হয় যে, সে কয়েকটি কম্বল একত্রে ভাঁজ করে গদী বানিয়ে বিছিয়ে তার উপর বুযুর্গের ন্যায় বসে এবং আমীর-উমারা, জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার খেদমতে শ্রদ্ধাবনত ও ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে এসে থাকে। এতে তিনি এত মর্মাহত হন যে, সে পরে এলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে তাঁর ইজাযতনামা থেকে বঞ্চিত করেন। দীর্ঘকাল তার প্রতি হযরত খাজা (রঃ)-এর এই বিরক্তিকর মনোভাব অব্যাহত থাকে। যতদিন পর্যন্ত না তার থেকে কোন ওযর প্রকাশ পেয়েছে এবং এ ব্যাপারে মাফ না চেয়েছে ততদিন তাঁর ক্ষমাসুলভ ও স্নেহদৃষ্টি তার প্রতি পতিত হয়নি।[১]

শত্রুর প্রতি উদারতা

আন্তরিকতা তথা বিশুদ্ধচিত্ততা, আত্মবিসর্জন এবং সব কিছুর প্রতি উপেক্ষা ও নিস্পৃহ মানসিকতার মকামে পৌঁছে সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর অন্তর থেকে দুঃখ-বিষাদ, অভিযোগ, প্রতিশোধস্পৃহা এবং অপরকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতাই নিঃশেষ হয়ে যায়। সে শুধু আত্মীয়-স্বজনের প্রতিই স্নেহপ্রবণ, সদয় ও বন্ধুবৎসল হয় না বরং দুশমনের প্রতিও কৃতজ্ঞ ও উদার মনোভাব প্রদর্শন এবং দুশমনের অনুকূলে প্রার্থনাকারীতে পরিণত হয় যেন দুশমনীও তার জন্য ইহ্সান। যে-কোন আহত অন্তরের উপশমের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার অন্তর থেকে বর্ষিত হয় পুষ্পবৃষ্টি। আমীর 'আলা সঞ্জযী বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত খাজা (রঃ) নিম্নোক্ত চরণটি আবৃত্তি করেন:

هر که ما را رنج داد راحتش بسیار باد

"যে আমাকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয় আল্লাহ তাকে সুখে-শান্তিতে রাখুন।" এরপর তিনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতার লাইন দু'টি আবৃত্তি করেন:

هر که او خاری نهد در راه ما از دشمنی
هر گلی کز باغ عمرش بشگفد بی خار باد

"যে আমার রাস্তায় কাঁটা বিছায় আল্লাহ করুন তার জীবনের গুলবাগিচায় যে ফুল ফুটবে তা যেন কাঁটাহীন থাকে।"

সিয়ারুল 'আরিফীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ) বলতেন যে, হিসার আন্দরপতে (গিয়াছপুরের নিকটে অবস্থিত)

১. সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

৬—

ঝজ্জু নামে এক ব্যক্তির হযরত খাজা (রঃ)-এর সঙ্গে সীমাহীন দুশমনী ছিল যার সংগত কোন কারণ ছিল না। সে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলত এবং হযরত খাজা (রঃ)-কে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া যায় সেই ফিকিরেই থাকত। একদিন সে মারা যায়। হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) তার জানাযায় শরীক হন এবং দাফন শেষ হবার পর তার শিয়রে দু'রাকাত নফল আদায় করেন ও মুনাজাত করেন, "হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যা কিছু বলেছে, মন্দ চিন্তা করেছে আমার সম্পর্কে, আমি তা মাফ করেছি। আমার কারণে সে যেন শাস্তি না পায়।"[১]

একবার মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ভেতর কেউ আলাপ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, কোন কোন লোক জনাবেওয়ালাকে মিম্বর ও অন্যান্য স্থানে মওকা মত ভাল-মন্দ বলে থাকে, আমরা যা শুনতে পারি না। এতে হযরত খাজা (রঃ) বললেন, আমি তাদের সবাইকে মাফ করেছি। তোমরাও তাদেরকে মাফ করে দিও এবং এ ধরনের লোকের সাথে তোমরা এজন্য ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। এরপর তিনি আরও বললেন, যদি কখনও দু'ব্যক্তির ভেতর মনোমালিন্য দেখা দেয় তবে সে মনোমালিন্য দূরীভূত করবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা হ'ল একজন তার মন থেকে তথা অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ থেকে শত্রুতার বিষবাষ্প দূর করে দেবে। এতে অপরের মন থেকেও শত্রুতার জোর ও তীব্রতা কমে যাবে।

একদিন তিনি বললেন, দুনিয়ার সাধারণ নীতি এই যে, ভালোর সাথে ভালো এবং মন্দের সাথে মন্দ ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের নীতি এই যে, মন্দের মুকাবিলায় ভালো ব্যবহার করবে। তিনি এও বললেন :

"কেউ যদি তোমার পথে কাঁটা বিছায় আর তুমিও তার পথে কাঁটা বিছাও তাহলে তো সারা দুনিয়াটাই কাঁটায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সর্বসাধারণের ভেতরও সাধারণ নীতি এই যে, সোজা-সরল লোকের সাথে সোজা-সরল ব্যবহার এবং বাঁকা-টেড়া লোকের সাথে বাঁকা-টেড়া ব্যবহার করা। কিন্তু দরবেশের নীতি হ'ল সোজা-সরল লোকের সঙ্গে সোজা-সরল ব্যবহার তো বটেই, এমন কি বাঁকা-টেড়া লোকদের সঙ্গেও সৎ ও উত্তম ব্যবহার করা।"[২]

এক্ষেত্রে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর মাপকাঠি এত উঁচু ও সমুন্নত ছিল যে, মন্দ বলা তো বহু দূরের কথা, মন্দ কামনা করাটাও ছিল তাঁর রুচি ও প্রকৃতির বাইরে। একবার তিনি বলেছিলেন, মন্দ বলাটা নিঃসন্দেহে খারাপ।

---

১. সিয়ারুল 'আরিফীন।

২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ৮৭

কিন্তু মন্দ কামনা অধিকতর খারাপ।[১] যখন এ ধরনের ব্যবহার তাঁর সবার সাথে তখন স্বীয় শায়খ, নিয়ামতপ্রাপ্ত ওলী-আওলিয়া, বন্ধু-বান্ধব এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম হবেই বা না কেন, যাদের ইহসান দ্বারা তিনি পরিপূর্ণরূপে আপ্লুত হয়েছিলেন।

'সিয়ারুল আরিফীন' নামক গ্রন্থে আছে যে, হযরত শায়খ নজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের দৌহিত্র খাজা 'আতাউল্লাহ ছিল একজন বেপরোয়া ও নির্ভীক যুবক। একদিন সে শায়খের দরবারে কাগজ, কালি ও কলম নিয়ে হাযির হল। বলল, আমার জন্য অমুক সর্দারকে একটি সুপারিশপত্র লিখে দিন যাতে সে আমাকে উল্লেখযোগ্য একটা অংকের টাকা দিয়ে দেয়। শায়খ (রঃ) বললেন, উক্ত সর্দারের সাথে যেমন আমার কখনো মুলাকাত হয় নি, তেমনি সেও কখনো আমার এখানে আসেনি। যার সঙ্গে আমার আদৌ পরিচয়ই হয়নি, তাকে আমি এ ধরনের চিরকুট কি করে লিখতে পারি ? এতে সে ভীষণ রাগান্বিত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, আপনি আমারই নানার মুরীদ আর আমাদেরই খান্দানের দানে লালিত, আর কিনা আজই এতদূর অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছেন যে, আপনার দ্বারা আমার জন্য এতটুকু চিরকুট লেখাও চলে না ? এ আপনি কি ধরনের পীর-মুরীদীর জাল বিছিয়ে রেখেছেন এবং আল্লাহ্র মাখলুককে ধোকা দিচ্ছেন? এই বলে সে দোয়াত সজোরে যমীনে নিক্ষেপ করে উঠে চলে যেতে উদ্যত হয়। অমনি হযরত খাজা (রঃ) তার জামার প্রান্তদেশ টেনে ধরেন এবং বলেন, অসন্তুষ্ট হয়ে কোথায় যাচ্ছ ? খুশী হয়ে যাও। এরপর একটা পরিমাণ মত টাকা দিয়ে তাকে খুশী করে বিদায় দেন।[২]

দোষ গোপন এবং মহত্ত্ব ও ঔদার্য

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে আছে যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর দরবারে আগমনকারীদের সাধারণ নিয়ম ছিল যে, বাইরে থেকে যখনই কেউ আসত, শিরনী (মিষ্টান্ন দ্রব্য) অথবা কোন তোহফা খরিদ করে সাথে নিয়ে আসত এবং দরবারে পেশ করত। একবার কতকগুলি লোক এইরূপ নিয়তেই আসছিল। জনৈক মৌলভী সাহেবও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি ভাবলেন, সব লোকই তো বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা পেশ করবে এবং তারা সেগুলি হযরত খাজা (রঃ)-এর সামনে একত্রে রাখবে। এরপর খাদেম সেগুলি

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৫৫৪ ;

২. সিয়ারুল 'আরিফীন।

উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি কি করে জানবেন কে কি এনেছে? অতঃপর তিনি কিছু মাটি রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে কাগজে বেঁধে সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর দরবারে হাযির হন। প্রত্যেকেই যে যার জিনিস সামনে রেখে দেয়। মৌলভী সাহেবও নিজের পুটলিটা যথানিয়মে সামনে রেখে দেন। খাদেম সব কিছু উঠিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত হয় এবং পুটলিটাও উঠাতে যায়। এতে হযরত খাজা (রঃ) বললেন, "এটাকে এখানেই রেখে যাও। এটা হবে আমার চোখের সুরমা।" হযরত খাজা (রঃ)-এর আমল-আখলাক এবং উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে উক্ত 'আলিম সাহেব তওবা করেন এবং তাঁর মুরীদ হন।[১]

স্নেহপ্রবণতা ও আত্মীয়-কুটুম্বিতা

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত খাজা (রঃ)-কে সাধারণ মানবমণ্ডলী এবং ব্যক্তি বিশেষের সাথে সাথে মুসলমান ও আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে এমনই স্নেহপ্রবণতা ও মুহব্বত দান করেছিলেন যে যদি তাকে মায়ের স্নেহপ্রবণতার সঙ্গে তুলনা করা হয় কিংবা তা থেকেও অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয় তবে বাস্তব ঘটনাবলী দৃষ্টে তাকে আদৌ অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে না। মহান ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গদের এই স্নেহপ্রবণতা প্রকৃতপক্ষে নবীয়ে আকরাম (সঃ)-এর সেই স্নেহ-প্রবণতারই উত্তরাধিকারিত্ব যার হাকীকত কুরআনুল করীমের সূরা তওবাহ্‌তে বর্ণনা করা হয়েছে:

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে উহা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদিগের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" (সূরা তওবাহ্‌, ১১৮ আয়াত) অধিকন্তু ইহা সেই হুকুমেরই তামীল যে সম্পর্কে খোদ রাসূলে করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে:

"এবং যারা তোমার অনুসরণ করে সেই সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।" (সূরা শু'আরা, ২১৫ আয়াত)

এই আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা ও স্নেহপ্রবণতা এমনই এক সুদৃঢ় 'ইত্তিহাদ' (ঐক্য) পয়দা করে দিয়েছিল যে, অপরের শারীরিক কষ্টে নিজের কষ্ট এবং অপরের আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে নিজের মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি মিলত। আমীর হাসান 'আলা সজযী বর্ণনা করেন যে, একবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ছায়ায় স্থান সংকুলান না হওয়াতে কেউ কেউ রৌদ্রে বসেছিল। ছায়ায় উপবেশন-

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১৪২ পৃঃ।

কারীদের লক্ষ্য করে হযরত খাজা (রঃ) বললেন, ভাইয়েরা। তোমরা একটু মিলেমিশে বস যাতে তোমাদের ভাইদেরও স্থান সংকুলান হয় এবং তারাও বসতে পারে। এরা রৌদ্রে বসে আছে আর আমি তাদের অগ্নিদগ্ধ করছি।[১]

একবার তিনি জনৈক বুযুর্গের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেন যা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজ অবস্থারই প্রতিনিধিত্ব আর তা ছিল এই যে, "আল্লাহ্‌র মাখলুক আমারই সামনে আহার করে থাকে, আর তাদের খানা আমি আমার কণ্ঠনালীতে অনুভব করি। অর্থাৎ তারা নয়, সে খানা যেন আমিই খাচ্ছি।"[২]

আমীর হাসান 'আলা সজযী বলেন যে, আমি একবার অসময়ে গিয়ে হাযির হই এবং আরয করি যে, আমি এদিকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। একবার হাযিরা দিতে মন চাইল। কোন কোন দোস্ত বলল যে, যদি কেউ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ও কাজে এসে থাকে এবং প্রথম থেকে এখানে আসার আদৌ ইচ্ছা না থাকে তবে হযরত শায়খ (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত না হওয়াটাই সমীচীন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, যদিও নিয়মটা এই, কিন্তু অন্তর তো প্রবোধ মানে না যে, আমি এখানে এসেও হযরত খাজা (রঃ)-এর সঙ্গে একবার সাক্ষাত না করেই ফিরে যাই। আজ আমি সেই নিয়মের খেলাফই করব। যখন দেখা করলাম তখন উত্তর ছিল, এসে ভালই করেছ। এরপর আরও বললেন, বুযুর্গদের নিয়ম এটাই যে, কেউ তাদের নিকট ইশরাকের পূর্বে এবং 'আসরের পরে যায় না। কিন্তু আমার এসব কোন নিয়ম নেই। যখনই মন চাইবে চলে আসবে।[৩]

সাধারণের প্রতি সমবেদনা

এইসব আল্লাহওয়ালা লোকেরা এমনিতে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এবং অন্তর থেকেই এর প্রতি বিমুক্ত, কিন্তু দুনিয়াবাসীর দুঃখ-শোক ও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের চিন্তায় তাঁরা থাকেন বিমর্ষচিত্ত। তাঁরা একদিকে নিজেদের শোক-দুঃখ ভুলে থাকেন, অপরদিকে সারা দুনিয়ার শোক-ব্যথাকে নিজেদের শোক-ব্যথায় পরিণত করেন। একথা বলবার অধিকারী প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই যাঁরা বলেন, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے "সমগ্র দুনিয়ার ব্যথা-বেদনা আমাদের অন্তরে লালিত ও পোষিত।"

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৯১ পৃঃ;
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৭৭ পৃঃ;
৩. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৯৮ পৃঃ।

খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর দৌহিত্র খাজা শরফুদ্দীনকে কোন এক মজলিসে জনৈক সূফী বলেছিলেন যে, খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) আশ্চর্য উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। একাকী থাকেন ; পরিবার-পরিজন কিংবা বাচচা-কাচচার কোন ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। এসব থেকে তিনি এমনই মুক্ত যে, এক বিন্দু চিন্তা-ভাবনাও তাঁকে স্পর্শ করেনি। হযরত খাজা (রঃ)-এর ভক্ত শরফুদ্দীন উক্ত মজলিস থেকে উঠে হযরত খাজা (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। ইচ্ছা করেছিলেন যে নিজেই তা বলবেন। এদিকে হযরত খাজা (রঃ) নিজেই বলেন,

"মিঞা শরফুদ্দীন! সময়ে আমার অন্তরে যে দুঃখ-বেদনার সঞ্চার হয়ে থাকে সম্ভবত অপর কোন ব্যক্তির তা থেকে বেশী হয় না। কোন লোক যখন আমার নিকট আসে, নিজের হাল-অবস্থা আমাকে ব্যক্ত করে তখন তারও দ্বিগুণ ব্যথা-বেদনা ও চিন্তা-ভাবনা আমার অন্তরে সঞ্চারিত হয়। অত্যন্ত কঠোরমনা ও নির্মম-হৃদয় সে যার দীনী ভাইয়ের শোক-ব্যথা তার অন্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। এছাড়াও আরও বলা হয়েছে : المخلصون على خطر عظيم "আল্লাহ্‌র মুখলিস বান্দারা সর্বদাই বড় বিপদের মুকাবিলা করে থাকে।"

হযরত খাজা (রঃ)-এর মতে মুসলমানদের অন্তরকে খুশী করা,[১] তাদের অন্তর প্রশান্তি ও আনন্দে ভরে দেওয়া সর্বোৎকৃষ্ট আমল এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের উত্তম মাধ্যম। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

"আমাকে স্বপ্নে একটি কিতাব দেওয়া হয়। তাতে লেখা ছিল —যতটুকু সম্ভব মানুষের অন্তর খুশী রাখতে এবং আনন্দ ও তৃপ্তিতে তা ভরে রাখতে। কেননা মু'মিনের অন্তর রবুবিয়তের গোপনতম রহস্যের স্থান। জনৈক বুযুর্গ কত সুন্দরই না বলেছেন,

می کوشش کہ راحت بجانے برسد
یا دست شکستۂ بنانے برسد

"চেষ্টা কর যেন মানুষের অন্তর তোমার দ্বারা আরাম পায় অথবা যে গরীব দীন-ভিখারী সে যেন তোমার দ্বারা রুটি-রুযীর বন্দোবস্ত করতে পারে।"

একবার বলেছিলেন,

"কিয়ামতের দিন কোন পণ্যসামগ্রীর এত বেশী দাম হবে না যেরূপ দাম অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখায় এবং অপরের অন্তর-মনকে আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে দেওয়ায়।[২]

১. সিয়ারুল 'আরিফীন
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা।

ছোটদের প্রতি স্নেহ

হযরত খাজা (রঃ) স্বীয় মূল্যবান মুহূর্তের হাযারো রকমের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এবং অধ্যাত্ম্য জগতের উন্নত মার্গে বিচরণ করা সত্ত্বেও কচি মা'সূম বাচচা ও ছোটদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং নিজের ভীষণ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের অন্তর হাসি-খুশী ও মায়া-মমতায় ভরে দিতে আলাদা সময় করে নিতেন। এই বিরাট দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক নিমগ্নতা সত্ত্বেও তিনি বাচচা ছেলে-মেয়েদের প্রতি পুরো লক্ষ্য রাখতেন এবং এমনকি তাদের ছোটখাটো কথাবার্তার দিকেও খেয়াল রাখতেন।

খাজা রফী'উদ্দীন ছিল তাঁর আপন ভাতিজার পুত্র। যদি কখনও খাবার সময় হ'ত এবং সে তখন হাযির না থাকত তবে বড় বড় বুযুর্গ দস্তরখানের উপর উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি তার আগমনের অপেক্ষা করতেন। তিনি আপন ছেলের মতই একাকীত্বে ও মজলিসের জনসমাগমে তাকে তরবিয়ত দিতেনও মন রক্ষা করে চলতেন।[১]

খাজা রফী'উদ্দীন তীর-ধনুক এবং সাঁতার খেলা ও কুস্তি লড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিল। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ অত্যন্ত আদর সোহাগের সাথে তার সঙ্গে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন, তাকে উৎসাহ দিতেন ও উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। এসব বিষয়ের সূক্ষ্যাতিসূক্ষ্য বিষয় এবং খুটিনাটি বিষয়ে তাকে তা'লীম দিতেন যাতে সে খুশী হয়।[২]

যে সমস্ত অভিজাত বংশীয় যুবক এবং অর্থকড়ির দিক দিয়ে সামর্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি স্বীয় যুগের সৌখিন লোকদের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত হযরত খাজা (রঃ) এদেরও খাতির করতেন এবং এটাকে তাদের যৌবন ও তারুণ্যের স্বাভাবিক দাবি মনে করে উপেক্ষা করতেন। অধিকন্তু স্বীয় চরিত্র মাধুর্য, সদ্ব্যবহার এবং স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা তাদেরকে ইসলাহ (সংস্কার-সংশোধন) ও তরবিয়তের অধীনে আনয়ন করতে প্রয়াসী হতেন।

সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা আমীর খোরদ লিখেন যে, আমার চাচা সাইয়িদ হুসায়ন কিরমানী ছিলেন তখন যুবক। সে যুগের স্বাভাবিক প্রবণতা মাফিক যৌবনসুলভ চপল পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে একদিন তিনি হযরত খাজা (রঃ)-এর দরবারে এসে হাযির। হযরত খাজা (রঃ) তাকে দেখে বলেন,

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা, ২. ঐ ২০৩ পৃষ্ঠা;
৩. সিয়ারুল আওলিয়া ২০৩ পৃষ্ঠা

سید بیاد بنشین و سعادت ببر (সাইয়িদ এসে বস এবং সৌভাগ্যের অংশীদার হও।) আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, এই আদর-সোহাগ ও স্নেহ-মমতা এবং খাতির-যত্নের ফলে কত যুবকেরই না ইসলাহ ও তরবিয়ত লাভ সম্ভব হয়েছে, আর কত কঠিন বন্য স্বভাবের লোকই না প্রেম-মুহব্বতের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছে এবং আল্লাহ্র মকবুল বান্দাহ ও কামিল বুযুর্গগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

হযরত খাজা (রঃ)-এর এই সব আখলাক ও গুণাবলী এবং সূফীয়ায়ে কিরামের ন্যায় জীবনচরিত দেখে ইমাম গায্যালী (রঃ)-এর সেই অভিমত ও সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় যা তিনি "সত্যের সন্ধানে" দীর্ঘ সফর এবং বিভিন্ন গ্রুপ ও মানুষের নানা শ্রেণী সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের পর প্রকাশ করেছিলেন, "আমি নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছি যে সূফী সম্প্রদায়ই একমাত্র আল্লাহ্র পথের পথিক, তাঁদের জীবনচরিতই সর্বোত্তম জীবনচরিত, তাঁদের পথই অত্যধিক মযবুত ও সুদৃঢ় এবং তাঁদের আখলাক (চরিত্র-ব্যবহার) সর্বাপেক্ষা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সঠিক ও বিশুদ্ধ। যদি বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানীদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং শরীয়তের সূক্ষ্ম-তত্ত্ববিদগণের সূক্ষ্ম জ্ঞান একত্রে মিলেও তাঁদের জীবনচরিত ও আখলাক থেকে উত্তম কোন কিছু আনয়ন করতে চায়, তবে তা সম্ভব হবে না। তাঁদের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সকল প্রকার গতিবিধি নবুওতের উজ্জ্বল প্রদীপের দীপ্ত আলোকমালা দ্বারা নির্দেশিত ও আলোকপ্রাপ্ত। আর নূরে নবুওত থেকে উজ্জ্বলতর কোন নূর দুনিয়ার বুকে কিই-বা হতে পারে যা থেকে আলো গ্রহণ করা যেতে পারে।"[১]

---

১. আল-মুনকিয মিনাদ্দালাল ('দিশারী' ও 'সত্যের সন্ধান' নামে বাংলায় অনূদিত)।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাদ-আহ্লাদ ও বাস্তব অবস্থাদি

প্রেম-মুহব্বত ও স্বাদ-আহলাদ

হযরত খাজা (রঃ)-এর জীবন-চরিত এবং জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, যা তাঁর গোটা আমল-আখলাক ও সামগ্রিক অবস্থাকে ঘিরে আবর্তিত, তা ছিল ঐশীপ্রেম যা আল্লাহ্-প্রদত্ত নিয়ামত এবং যা তাঁর জীবনের প্রথম প্রভাত থেকেই তাঁর ভেতর ছিল প্রতিভাত। প্রেমের স্ফুলিংগ যা তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবে আশৈশব একদম মিশে গিয়েছিল, শায়খুল কবীরের সাহচর্য এবং চিশতীয়া তরীকার সম্পর্কের কারণে যিনি উত্তপ্ত লৌহশলাকায় পরিণত হয়েছিলেন, তাঁর সারাটা জীবন এবং অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল দিল্লী ও তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে উত্তপ্ত ও আলোকিত করে রেখেছিল এবং ঐ একই কারণে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ ঐশী-প্রেমের ('ইশ্কে ইলাহীর) উত্তাপ দ্বারা উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত ছিল। তাঁর সমগ্র অবস্থা, কর্মব্যস্ততা, আলাপ-আলোচনা ও বৈঠকাদি, কাব্যচয়ন ও নির্বাচন, সংঘটিত ঘটনাবলী ও তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত—মোট কথা প্রত্যেকটি জিনিস থেকেই সেই আধ্যাত্মিকতার রশ্মি এবং সেই উত্তপ্ত 'ইশকের প্রকাশ ঘটত।

ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন আল্লাহ্‌র ওলীদের জীবনের ঘটনাবলীর উপর আলোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন জনৈক বুযুর্গের কাহিনী বর্ণনা করল,—তাঁর ইন্তিকাল হচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে আল্লাহ্‌র নাম তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল। একথা শোনার পর হযরত খাজা (রঃ)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এবং নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদী আবৃত্তি করেন ঃ

آیم بسر کوئے تو پویاں پویاں

رخسارہ باب دیدہ شویاں شویاں

بیچارۂ وصل جویاں جویاں
جاں می دهم و نام تو گویاں گویاں

"তোমার গলীতে চলে আসছি উত্তম ও স্বচ্ছন্দ গতিতে আর গণ্ডদ্বয় চোখের পানিতে ধুয়ে চলছি। তোমার মিলনের প্রত্যাশায় জীবন দিয়ে দিচ্ছি আর তোমার নাম জপে চলেছি।"

এ প্রেমের পরিণতি এই ছিল যে, অন্তরে স্বীয় প্রেমাষ্পদের ধ্যান-ধারণা ছাড়া অন্য কোন কিছুর স্থান ছিল না এবং অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করার মত অবকাশও ছিল না।

আমীর হাসান 'আলা সজযী বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি বলেন, যদি কখনো আকস্মিকভাবে ঐ সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন করতে শুরু করি যা আমি পড়েছি তখন আমার প্রকৃতিতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নিজের মনেই বলি, এ আমি কোথায় এসে পড়েছি। এক্ষেত্রে হযরত খাজা (রঃ) আবু সা'ঈদ আবুল খায়ের (রঃ)-এর ঘটনা বিবৃত করেন। খাজা আবু সা'ঈদ কামালিয়াতের দর্জায় পেঁীছবার পর যে সকল কিতাব তিনি এককালে পাঠ করেছিলেন এবং যা ঘরের এক কোণে শোভা পাচ্ছিল, একদিন অধ্যয়ন করা শুরু করেন। অমনি গায়েবী আওয়াজ ভেসে আসে, হে আবু সা'ঈদ! আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ফিরিয়ে দাও। এখন তো তুমি অন্য জিনিসে মশগুল হয়ে গেছ। হযরত খাজা (রঃ) এই পর্যন্ত পৌঁছেই কেঁদে ফেলেন। প্রেমের এই বাদশাহ্র পরিণতি তো এই ছিল যে, রাতের নির্জন ও গোপন একাকীত্বে অতিবাহিত করবার পর দিনের আলোয় যখন তিনি উপস্থিত হতেন তখন মনে হ'ত—আমীর খোরদের ভাষায়—মত্ততা উপচে পড়ছে। রাত বিনিদ্র কাটাবার কারণে চোখ সাধারণত রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং প্রেমের এই উত্তাপ এবং মত্ততার এই আমেজের পরিণতি এই ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সে বরাবরই তিনি সিয়াম পালন করে চলতেন; অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ, বিনিদ্র রাত্রি যাপন এবং কঠিন মুজাহাদা সত্ত্বেও দুর্বলতা কিংবা শক্তিহীনতার কোন আলামত তাঁর মধ্যে পাওয়া যেত না। আশি বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চেহারায় সেই লালচে আভা এবং তারুণ্য ও খুশীর সেই ঝলকেরই সাক্ষাত মিলত, যা সাধারণত যৌবনেই মেলে। বরং তা যেন দিন দিন বেড়ে চলছিল।[১]

১. সিয়ারুল আউলিয়া।

সামা'[১]

প্রেমের এই উত্তাপ, জ্বালা ও অস্থিরতার উপশমের একটি মাত্র মাধ্যম ছিল, আর তা হল 'সামা' অর্থাৎ 'ইশ্‌কে ইলাহীতে ভরপুর কাব্য এবং আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ শ্লোকমালা শোনা যদ্দ্বারা অন্তর তার তাপ উদ্‌গীরণের সুযোগ পায় এবং অশ্রুর ঝাপটা দ্বারা তার উষ্ণতা হ্রাস করার মওকা মেলে। এরই সঙ্গে মুজাহাদার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ ও প্রকৃতি এবং আহত দেমাগ নফী'র যিক্‌রের কারণে যেন সজীবতা ফিরে পায়। মাওলানা রুমীও সামা'র একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্বয়ং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) নিজ মুখেও 'সামা' সম্পর্কে তথা এর বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বলেছেন, —

'সামা' সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুরীদ, ভক্তি-শ্রদ্ধার অধিকারী আধ্যাত্মিক পথের কঠোর সাধকের জন্যই সাজে — যখন প্রকৃতি ও দেহ আহত ও বিবশ হয়ে পড়ে (যে সামা' থেকে শক্তি ও সজীবতা লাভ করবে)। হাদীছ পাকে বলা হয়েছে, ان لنفسك عليك حقا — তোমাদের উপর তোমাদের শরীরেরও হক রয়েছে। একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত নফস সামা'র মাধ্যমে আরাম ও শান্তি লাভ করার পর পুনরায় কাজের উপযোগী হয়।[২]

মাওলানা কাশানী নামক জনৈক বুযুর্গ বলেন, "রিয়াযত ও মুজাহাদা-কারীদের অন্তঃকরণ ও নফস আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থার

---

১. সামা'র মসলা (বিনা বাদ্যযন্ত্রে)-এর পক্ষে-বিপক্ষে, অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্যময় ও যুক্তিপূর্ণ বিধান এই যে, সামা' আদতে হারাম যেমন নয় তেমনি তা কোন 'ইবাদত-বন্দেগী, আনুগত্য-অনুসরণও নয়—নয় কোন পরম লক্ষ্য, বরং এ একটি ভারসাম্যময় ও নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তাধীনে একটি তদবীর ও চিকিৎসা এবং প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তির জন্য জরুরত মাফিক কখনও মুবাহ্ আবার কখনও কল্যাণকর। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ চিশতীয়া তরীকার বুযুর্গ কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরীর উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও ভারসাম্যময় বলে মনে হয়। এক বৈঠকে সামা' হালাল কি হারাম এ সম্পর্কে বাহাছ হচ্ছিল। কাযী সাহেব বললেন, "আমি হামীদুদ্দীন সামা' শুনি এবং একে মুবাহ মনে করি। এর পেছনে ভিত্তি হল—'উলামায়ে কিরামের বর্ণিত রেওয়ায়েত এবং তা এজন্যও যে আমি অন্তরের ব্যথার রোগী আর সামা হ'ল এর দাওয়াই। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) মদ দ্বারা চিকিৎসা করানো সেই ক্ষেত্রে জায়েয বলেন যখন রোগ নিরাময়ের আর কোন দাওয়াই মেলে না। এরই উপর কিয়াস যে, আমার মনের দুরারোগ্য ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা সঙ্গীতলহরী শ্রবণ। অতএব আমার জন্য তা শোনা হালাল হলেও তোমাদের জন্য তা হারাম।" সিয়ারুল আকতাব কলমী

২. সিয়ারুল আওলিয়া,

আধিক্যবশত কখনো কখনো বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় ভরে যায় এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এর উপর সেই ফয়েয ও প্রশস্ততা —যা সকল আমল ও হালতের ক্ষেত্রে ঢিলেমী ও অলসতার কারণে ঘটে—প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য শেষ যুগে বুযুর্গগণ মিষ্টি ও সুমধুর আওয়াজে রুচিশীল ও শোভন গান এবং উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক কবিতা শ্রবণকে রূহানী চিকিৎসা হিসাবে অনুমোদন করেন— অবশ্য তা যদি শরীয়তের গণ্ডী অতিক্রম না করে।[১]

অতঃপর 'সামা' হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) এবং তাঁর বুযুর্গদের (যাঁরা এমত অবস্থার অধিকারী এবং প্রেমের আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছিলেন) আরাম ও শান্তির উপকরণ—শক্তির খোরাক এবং আপন প্রেমাষ্পদের সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার মাধ্যম ছিল--যাকে ঐ সমস্ত বুযুর্গ মানসিক চিকিৎসার্থে ও প্রয়োজনীয়তার তাকীদে অবলম্বন করতেন আর তাও অবলম্বন করতেন চিকিৎসা ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক দাবি মাফিক। এটা তাদের না 'ইবাদত-বন্দেগী ছিল আর না আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম ; এটা আধ্যাত্মিক সাধন পথে স্থায়ী কোন পদ্ধতি কিংবা রাত্র-দিনের একমাত্র ধ্যান-ধারণাও ছিল না।

এরই সাথে সাথে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) শরীয়ত-বিরোধী গর্হিত বেদ'আত এবং ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়াদি যা অমুসলিমদের প্রভাব থেকে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে প্রবৃত্তি ও খেয়ালী পূজকরা অথবা বিভ্রান্ত সূফীরা সামা'র মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, নিজেকেও যেমন দূরে রাখেন তেমনি স্বীয় অনুসারীদেরও এসব থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকার কড়া তাকীদ দেন। সামা'র আদব সম্পর্কে তিনি বলেন,

"'সামা' চার প্রকার। যথা : হালাল, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ্‌। সামা'র ভাবসাগরে উন্মত্ত ব্যক্তি যদি 'মাহবুবে হাকীকী' তথা প্রকৃত প্রেমাষ্পদের অত্যধিক লক্ষ্যাভিসারী হয় তবে 'সামা' মুবাহ্‌। আর 'মাহবুবে মাজাযী' তথা অপ্রকৃত প্রেমাষ্পদের দিকে হলে তা হবে মাকরূহ। 'মাহবুবে মাজাযী'র পূর্ণ লক্ষ্যাভিসারী হলে তা হবে হারাম আর 'মাহবুবে হাকীকী'র দিকে পূর্ণ লক্ষ্যাভিসারী হলে তা হবে হালাল। সামা'র ব্যাপারে যিনি আগ্রহী হবেন তিনি যেন এই চারটি বিষয়ে জেনেই এ পথে অগ্রসর হন।"

অধিকন্তু তিনি আরও বলেন, "'সামা' মুবাহ হবার জন্য কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। 'সামা' যিনি শুনাবেন তাঁর জন্য শর্ত এই যে, তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি হবেন ; অল্পবয়স্ক কিংবা কোন নারী যেন না হয়। শ্রোতা যা কিছু শুনবেন তা যেন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে মুক্ত না হয়। আর

১. মিসবাহুল হিদায়াত, ১৮০-১৮২ পৃষ্ঠা।

যা কিছু শোনানো হবে তা যেন নির্লজ্জতা ও হাসি-ঠাট্টামূলক কিছু না হয়, আর সামা'র মাধ্যম তবলা, ঢোল, সারেঙ্গী ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র যেন না হয়।"[১]

বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এবং এর উপর নিষেধাজ্ঞা

হযরত খাজা (রঃ) বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং এ ব্যাপারে কারো থেকে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ পেতে দেখলে অত্যন্ত নারায হতেন, আর এক্ষেত্রে কোনরূপ ওযর-আপত্তি তিনি গ্রহণ করতেন না। সিয়ারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"মজলিসে একবার এক ব্যক্তি হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর খেদমতে আরয করল, বর্তমানে বেঁচে আছেন এমন কতিপয় দরবেশ এমন একটি মজলিসে—যেখানে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল—অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর সাথে তারা নাচেও অংশ নিয়েছেন। সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ) একথা শুনে বললেন, তাঁরা মোটেই ভাল কাজ করে নি। যে কাজ শরীয়ত-বিরোধী তা আদৌ পছন্দনীয় নয়। এতে আরও এক ব্যক্তি আরয করল, এই সমস্ত দরবেশ যখন উল্লিখিত মজলিস থেকে বের হয় তখন লোকেরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনারা এ কী করলেন? এ মজলিসে তো বাদ্যযন্ত্র ছিল, আপনারা সামা' কিভাবে শুনলেন এবং নাচেই-বা অংশ নিলেন কিভাবে? তারা জবাবে বলল, আমরা সামা'র মধ্যে এমনিভাবে মগ্ন ও সমাহিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমাদের খেয়াল করার আদৌ কোন অবকাশই ছিল না যে, এখানে কোন বাদ্যযন্ত্র আছে। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ একথা শুনে বললেন, এটা কোন জবাব হ'ল না। এটা তো প্রতিটি নাফরমানী ও অন্যায় কাজের ক্ষেত্রেই বলা চলে।"[২]

হযরত খাজা (রঃ) বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করতেন। তিনি বলতেন,

"যেখানে একজন মহিলার জন্য ইমামের ভুল শোধরাবার নিমিত্ত সালাতের মধ্যে হাতের শব্দে কিংবা তালি বাজিয়ে ইমামকে সতর্ক করবার অনুমতিটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয় নি এবং এটাকে অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে, যেখানে অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুক থেকে পরহেয থাকার ব্যাপারে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে[৩] সেখানে বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা স্বভাবতই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।"

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া ৪৯১—৪৯২ পৃষ্ঠা;
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫২০—৫২১ পৃষ্ঠা;
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৫২২;

সামা'র মধ্যে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর অবস্থা

হযরত খাজা (রঃ) বলতেন, আল্লাহ পাক যাকে ব্যথা-বেদনা ও স্বাদ-উপলব্ধি দান করেছেন তিনি বাদ্যযন্ত্র ব্যতিরেকেই ও একটি মাত্র কলি শ্রবণেই অশ্রু-আপ্লুত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যার স্বাদ ও উপলব্ধির ব্যাপারে আদৌ কোন মাত্রাজ্ঞান নেই তার সম্মুখে পাঠ-আবৃত্তি যতই চলুক না কেন, আর যত বাদ্যযন্ত্রই তার সামনে উপস্থাপিত হোক না কেন, তার উপর কোনটিরই আছর হবে না। কেননা সে তো বেদনার্তদের কেউ নয়। এর সম্পর্ক তো বেদনা-বিধূরতার সঙ্গে---বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নয়।[১]

বস্তুত হযরত খাজা (রঃ)-এর অবস্থা তো এই ছিল যে, 'ইশ্‌ক-ইলাহী ও আধ্যাত্মিক ভাবধারামণ্ডিত কবিতা শুনতেই তিনি অশ্রু-আপ্লুত হয়ে উঠতেন, অথচ লোকে তা জানতে পারত না। খাদেম শুকনো রুমাল দিত আর সে রুমাল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। এরপরই শুধু লোকেরা জানতে পারত হযরত খাজা (রঃ) অশ্রু-ভারাক্রান্ত।[২]

আমীর খোরদ (যিনি নিজেও শৈশবে ও বাল্যে এ ধরনের সামা'র মজলিসে শরীক হতেন এবং অধিকাংশ সময়ই আপন পিতা ও চাচার সঙ্গে এইসব ভাব-গম্ভীর মজলিস ও মত্ততা সৃষ্টিকারী উত্তেজক কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন যা সেখানে পড়া হত) বলেন যে, কখনো কখনো অনেকগুলো কবিতা আবৃত্তি করা হ'ত, কিন্তু কোনরূপ আবেশ-বিহ্বলতা সৃষ্টি হ'ত না। আকস্মিকভাবে কেউ হিন্দী দোহা কিংবা ফারসী প্রেম ও ভক্তিমূলক কবিতা আবৃত্তি করে বস্‌ত আর মজলিসে ভাবের জোয়ার সৃষ্টি হ'ত।

কথিত আছে যে, একবার কয়েরবাক নামক বাদশাহ্‌র একজন আমীর একটি মহফিলের আয়োজন করেন। শহরের নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বুযুর্গ এতে হাযির হন। 'সামা' শুরু হল। কথক অনেক কিছুই শোনাতে থাকে, কিন্তু তাতে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'ল না। শেষ অবধি হাসান বাহদী কাওয়াল নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

در کلبهٔ درویشی در صحبت بیخویشی
مگرار مرا با من هر سوئے مکن افسانه

কবিতাটি আবৃত্তি করতেই হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর উপর

১. সিয়ারুল আওলিয়া পৃষ্ঠা ৫২৩; ২. ঐ, ৫৪ পৃষ্ঠা;

কান্না ও আবেগাপ্লুত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এ অবস্থার প্রতিক্রিয়া মজলিসে উপস্থিত সবাইকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে দেয়।[১]

অন্য আর একটি মজলিসের ঘটনা শুনুন।

বালাখানাতে মজলিস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আমীর খসরু দাঁড়িয়ে এবং সুলতানুল মাশায়িখ অসুস্থতার কারণে চারপায়ীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। হাসান বাহদী শায়খ সা'দী (রঃ)-এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

سعدی تو کیستی که درآئی دریں کمند
چنداں فتادہ اند که ماصید لاغریم

হযরত খাজা (রঃ)-এর অশ্রুরুদ্ধ অবস্থা তখন এবং এতে তিনি গভীর-ভাবে সমাহিত হয়ে যান। খাজা ইকবাল রুমাল এগিয়ে দিয়ে চলছিলেন আর তিনি বারবার চোখ মুছে হাসান বাহদীর দিকে তা ঠেলে দিচ্ছিলেন। কিছু বিলম্বে 'সামা' সমাপ্ত হল। আমীর খসরুর পুত্র আমীর হাজী তার পিতারই গযল আবৃত্তি করতে শুরু করে যার একটি পংক্তি ছিল এইঃ---

خسرو تو کیستی که درآئی دریں شمار
کیں عشق تیغ برسر مردان دیں زدہ است

অমনি হযরত খাজা (রঃ)-এর উপর পূর্বোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল এবং তিনি অনেক বেশী কাঁদলেন।[২]

একবার আমীর খসরু গযল পড়েন যার প্রথম স্তবক ছিল এইঃ

رخ جمله را نمود مرا گفت تو مبین
زیں ذوق مست بیخودم کیں سخن چه بود

তিনি আড় চোখে আমীর খসরুকে একবার দেখলেন। ব্যস! পূর্বোক্ত অবস্থায় তিনি ফিরে গেলেন।[৩]

সাধারণত যে কবিতাতে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর স্বাদ অনুভূত হ'ত ও তিনি আবেগাপ্লুত হতেন, দিল্লীর মজলিস-মহফিল এবং শহরের অলিতে-গলিতে বেশ কিছুকাল যাবত তার চর্চা অব্যাহত থাকত। লোকেরা এথেকে আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করত।[৪] সুলতান 'আলাউদ্দীনও তাঁর দরবারের সভাসদ এবং হযরত খাজা (রঃ)-এর দরবারে যাতায়াতকারীদের বিশেষভাবে

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫১৪ পৃষ্ঠা;
২. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫১৫ পৃষ্ঠা; ৩. ঐ ৫১৬ পৃষ্ঠা ৪. ঐ, ৫১০ পৃষ্ঠা;

তাকীদ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যে কবিতায় হযরত খাজা (রঃ)-এর স্বাদ ও মত্ততা আসবে তা যেন মনে রাখা হয় এবং বাদশাহকে শোনানো হয়। অধিকাংশ সময় এমন হ'ত যে, বাদশাহ যখন এ রকম কবিতা শুনতেন—যে কবিতায় হযরত খাজা (রঃ)-এর মত্ততা ও আবেগ এসেছিল—অত্যন্ত প্রশংসা করতেন এবং বহুক্ষণ ধরে এর স্বাদ গ্রহণ করতেন।

কুরআনুল করীমের স্বাদ

কুরআনুল করীমের স্বাদ গ্রহণ, তাকে হেফজ করার ব্যবস্থাকরণ ও তেলাওয়াতের আধিক্য চিশতীয়া তরীকার তথা চিশতীয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরামের চিরন্তন নীতি। হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) থেকে নিয়ে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) পর্যন্ত সবাই কুরআন মজীদ থেকে বিশেষভাবে স্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ খাস খলীফা ও বিশিষ্ট মুরীদদিগকে কুরআনুল করীম হেফজ করতে এবং এরই মাঝে মগ্ন ও আত্ম-সমাহিত দেখতে চেয়েছেন, আর এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদও করে গেছেন।[১]

খেলাফত প্রদানের মুহূর্তে শায়খুল কবীর (রঃ) হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ)-কে কুরআনুল করীম হেফজ করতে ওসিয়ত করেছিলেন। হযরত খাজা (রঃ) সে ওসিয়ত পূরণ করেছিলেন এবং দিল্লী পৌঁছুতেই এ সিলসিলাও শুরু করে দেন। হযরত খাজা (রঃ) নিজ মুরীদ ও বিশিষ্ট সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে থাকেন — দিতে থাকেন বিশেষ তাকীদ। আমীর হাসান 'আলা সজযী যখন হযরত খাজা (রঃ)-এর ভক্তে পরিণত হন তখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কবিতা রচনা ও কাব্য-চর্চাই ছিল তাঁর সারা জীবনের হবি। হযরত খাজা (রঃ) তাকে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যেন সে কাব্য-চর্চার মুকাবিলায় কুরআনুল করীমের সাধনাকেই উপরে স্থান দেয়। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ গ্রন্থে আমীর বলেনঃ—

بارها لفظ مبارک مخدوم شنیده ام می باید که قرآن
خواندن بر شعر گفتن غالب آید -

অর্থাৎ আমি আমার মখদূমের মুখ থেকে এ ধরনের কথা অনেকবারই শুনেছি যে, কবিতা আবৃত্তির তুলনায় কুরআনুল করীমের তেলাওয়াত অধিকতর হওয়া

১. বিস্তারিত জানবার জন্য দেখুন 'মুসলমানুকা নিজামে তা'লীম ও তরবিয়ত'' ২য় খণ্ড; মাওলানা মানযির আহসান গীলানীকৃত;

উচিত।[১] অতঃপর তাকে কুরআন মজীদ হেফ্জ করার হেদায়াত দান করেন। তারা এক-তৃতীয়াংশ হেফজ করতেই তিনি বললেন,

دیگر ہا اندک یاد گیر و یاد گرفتہ بیشینہ
مکرر می کن

অর্থাৎ অল্প অল্প করে হেফ্জ কর আর হেফ্জকৃত অংশ বারবার দোহ্রাতে থাক।[২]

মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাকের সাহেবযাদা খাজা মুহাম্মাদ হযরত খাজা (রঃ)-এর পক্ষপুটে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন। তাঁকেও তিনি কুরআন মজীদ হেফ্জ করান। খাজা মুহাম্মাদ ইমাম ছিলেন একজন ভাল হাফিজ এবং তাঁর এলহানও (কণ্ঠস্বর) ছিল অত্যন্ত মিষ্ট। তাঁকে তিনি সালাত আদায়ের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পঠিত কিরাত শুনে তাঁর চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত, আমেজ অনুভব করতেন তিনি।[৩] তার অপর এক ভাই খাজা মূসাও ছিলেন একজন হাফিজ ও কারী। স্বাভাবিক নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি দস্তর-খানের উপর বসতেন তখনই সর্বাগ্রে খাজা মুহাম্মাদ এবং খাজা মূসা কুরআন মজীদের কিছু অংশ তেলাওয়াত করতেন। একে দু'আয়ে মায়েদা' বলা হ'ত।[৪] এর পর শুরু হ'ত খানা-পিনা। স্বীয় দৌহিত্র (খাহিরযাদার সন্তানগণ) খাজা রফী'উদ্দীন প্রমুখকেও কুরআন মজীদ হেফ্জ করিয়েছিলেন। তিনি নিজেও নফল নামাযে কুরআন শরীফ পড়তেন এবং বিশিষ্ট খাদেমদের থেকে জানতে চাইতেন যে, এ ব্যাপারে তাদের অভ্যাস-আচরণ কি?

শায়খ (রঃ)-এর সাথে সম্পর্ক

এমনিতেই কোন ব্যক্তি যদি কারো কাছ থেকে কোনরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় (যদি তার স্বভাব-প্রকৃতিতে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রেরণা বিদ্যমান থাকে) তবে তার প্রতি অনুগত হয়ে থাকে এবং তাকে স্বীয় উপকারী বন্ধু মনে করে। কিন্তু হযরত খাজা (রঃ)-এর স্বীয় মুরশিদ-এর সাথে গভীর প্রেমপূর্ণ ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও আত্মিক উন্নতিতেও মুরশিদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই মেহনতের ফল এই হয়েছিল যে, যখন কোন মাহবুব (প্রেমাষ্পদ)-এর প্রশংসা কীর্তন করা হ'ত তখনই তাঁর স্বীয় শায়খ

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃষ্ঠা ২৪৯; ২. ঐ, ৯৩ পৃ.
৩. সিয়ারুল আওলিয়া, ২০০ পৃষ্ঠা; ৪. ঐ, ১৯৯ পৃ.

৭—

ও মুরশিদ-এর স্মৃতি জাগরূক হয়ে উঠত এবং তাকেই তিনি এর সত্যতার মাপকাঠি মনে করতেন।

জামাতের ব্যবস্থাপনা ও দৃঢ় মনোবল

বার্ধক্যের শত দুর্বলতা এবং কঠোর কঠিন মুজাহাদা সত্ত্বেও জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন। সিয়ারুল আউলিয়া প্রণেতা বলেন:

"বয়স আশি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, তবুও জামাতের সাথেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। এজন্য উঁচু বালাখানা থেকে জামাতখানায় অবতরণ করতেন এবং সেখানেই উপস্থিত দরবেশ ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে তা আদায় করতেন। বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও সর্বদা সিয়াম পালন করতেন। বিনা-সিয়ামে খুব কম দিনই অতিবাহিত হ'ত।"[১]

শরীয়তের পাবন্দী এবং সুন্নতের অনুসরণে কর্মপন্থা

হযরত খাজা (রঃ) স্বয়ং সুন্নতে রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও কঠোর ছিলেন।

এ ব্যাপারে তিনি স্বীয় সঙ্গী-সাথী ও খাদেমকুলকেও অত্যন্ত তাকীদ দিতেন। সুন্নত ছাড়াও মুস্তাহাব ও নফল যাতে ফওত হতে না পারে সেজন্যও তাঁর কঠোর তাকীদ ছিল। সিয়ারুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে হযরত খাজা (রঃ) নিম্নরূপ উক্তি করেছেন,—

"রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুকরণ ও অনুসরণে অত্যন্ত মযবুত ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করা উচিত এবং এও দেখা উচিত যেন কোন মুস্তাহাব ও নফলও ফউত হতে না পারে।"[২]

"মাশায়িখে কিরামের জন্য এবং যিনি বায়'আত গ্রহণ করবেন (পীর), তাঁর জন্য শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং তরীকত ও হাকীকতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার। তাহলে তাঁরা আর শরীয়তের খেলাফ কোন কাজ করার জন্য বলতে পারবেন না।"[৩]

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ১২৫ পৃষ্ঠা
২. সিয়ারুল আওলিয়া ৩১৮
৩. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ ১৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

পরোপকার ও গভীর বিশ্লেষণ

জ্ঞানের মর্যাদা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) বাতিনী 'ইলমে কামালিয়াত লাভের সাথে সাথে জাহিরী 'ইলমেও অত্যন্ত উচচ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সেকালের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই তিনি দৃঢ় মনোবল, কঠিন অধ্যবসায় ও সুশৃংখলভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ ও মনীষীবৃন্দ রয়েছেন। সাহিত্য ও ধর্মীয় বিষয়ে তিনি প্রখ্যাত অডিটর জেনারেল শামসুল মুলক মাওলানা শামসুদ্দীন খারিযমী থেকে শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা কামালুদ্দীন যাহিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ মারিকলী থেকে হাদীছের দরস গ্রহণ করেন—যিনি ছিলেন 'মাশারিকুল আনওয়ার' প্রণেতা ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাগানীর শাগরিদ। একই মাধ্যমে তিনি 'হেদায়া' প্রণেতার শাগরিদও বটেন। তিনি কিছু কিতাব শায়খুল কবীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর নিকটও অধ্যয়ন করে 'ইলমের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক

যদিও স্বীয় প্রকৃতিগত মেধা এবং শায়খ-এর বাতিনী নিসবত (সম্পর্ক)-এর প্রভাবে তিনি দিন দিনই শব্দের মুকাবিলায় অর্থ, অর্থের মুকাবিলায় প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং নামের চেয়ে নামকরণের ভেতরেই বেশী নিমজ্জিত হয়ে পড়েন, তথাপিও জ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জ্ঞানের জন্য তাঁর নিষ্ঠা ও আস্বাদন শেষ অবধি অবিচল থাকে।

'সিয়ারুল আওলিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মাওলানা রুকনুদ্দীন চিগর 'আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারীর 'কাশশাফ' ও 'মুফাসসাল' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় এবং এ দু'টি ব্যতিরেকেও কতিপয় কিতাব হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর খাতিরে তাঁর খেদমতে নকল করে পৌঁছিয়েছিলেন।[১] এ দু'টি কিতাবই সুপ্রসিদ্ধ মু'তাযিলী মনীষী 'আল্লামা মাহমূদ জারুল্লাহ যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী) রচিত। প্রথমটি তফসীর গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ। এ থেকেও

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃঃ ৩১৭

তাঁর জ্ঞানের সীমাহীন নিষ্ঠা ও প্রীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থেই রয়েছে যে, সায়্যিদ খামুশ ইবনে সায়্যিদ মুহাম্মাদ কিরমানী একান্ত সান্নিধ্যে 'খামসায়ে নিজামী নামক' গ্রন্থ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর নিকট অধ্যয়ন করতেন।[১] হযরত খাজা (রঃ)-এর সাহিত্যপ্রীতি এত বেশী গভীর ও পবিত্র ছিল যে, আমীর খসরুর মত এক-জন শীর্ষস্থানীয় নামযাদা কবিকেও (যিনি স্বীয় ক্ষেত্রে তুলনাহীন এবং ফারসী সাহিত্যের প্রথম সারির কবিদের অন্যতম) তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছিলেন—করেছিলেন পথ-নির্দেশনা। সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, প্রথম দিকে আমীর খসরু যে সব গযল গাইতেন সেগুলিকে হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর খেদমতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পেশ করতেন। একবার তিনি আমীর খসরুকে বলেছিলেন যে, গযল ইস্পাহানীদের পদ্ধতিতে গাইবে।[২]

হাদীছ ও ফিকাহর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ

সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের দরবারে সামা সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে যে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে হযরত খাজা (রঃ) উক্ত মাসআলার উপর যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন এবং এর উপর যে সমালোচনা পেশ করেছিলেন তা থেকেও তাঁর জ্ঞানগত মরতবা ও মর্যাদা এবং প্রশস্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে হযরত শায়খ 'আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ)-এর পূর্বে 'সিহাহ সিত্তা' হাদীছ গ্রন্থের তেমন পরিচিতি ও প্রচলন ছিল না এবং মানুষের পরিচিতির ও অবগতির সীমারেখা বুখারী ও মুসলিম শরীফের বাইরে অগ্রসর হতে পারেনি। হাদীছের মধ্যে 'মাশারিকুল আনওয়ার' ও 'মিশকাত শরীফ'কেই 'ইল্‌মের পুঁজি এবং হাদীছ শাস্ত্রের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ধাপ মনে করা হ'ত।[৩] সূফীদের মুখে মওযু' ও য'ঈফ হাদীছের আধিক্য ও ছড়াছড়ি এবং বুযুর্গদের মালফুজাত মজলিসগুলিতে বেদেরেগ বর্ণিত হ'ত। আজগুবী ও মনগড়া এবং মওযু' হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান 'আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির পাটনীর পূর্বে এখানে পরিদৃষ্ট হয় না। হযরত খাজা (রঃ)-এর মালফুজাত ও জীবন-চরিত থেকে জানা যায় যে, তিনি এমনি ধরনের অনেক ভিত্তিহীন বর্ণনাকে (যা মুখ-নিঃসৃত ও

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২১৯ পৃঃ   ২. ঐ, ৩০১ পৃঃ

৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন الثقافة الاسلامية فى الهند-এর হাদীছ অধ্যায়।

স্বষ্ট) প্রমাণপঞ্জী হিসাবে উপস্থাপিত করতেন না এবং তাঁর এ ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ছিল যে, সহীহ হাদীছের নির্বাচিত সংকলন হচ্ছে বুখারী ও মুসলিম। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, এই হাদীছ্টি কিরূপ—السخى حبيب الله وان كان كافرا "দাতা কাফির হলেও আল্লাহ্‌র দোস্ত।" তিনি শুনে বললেন, এটা কোন হাদীছ নয়, কোন ব্যক্তির কথিত উক্তি। এক ব্যক্তি আরয করল যে, এটা হাদীছ আরবা'ঈনের অন্তর্গত অন্যতম হাদীছ। তিনি বললেন, যা কিছু বুখারী ও মুসলিমে আছে সেগুলিই সহীহ্।[১]

'ইল্‌মের গুরুত্ব

স্বীয় মাশায়িখে কিরামের মতই হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর দৃষ্টিতেও 'ইল্‌মের অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল এবং তিনি একে আধ্যাত্মিক পথের

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১০৩ পৃঃ

এ ক্ষেত্রে একটা কথা প্রকাশ করে দেওয়া দরকার যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বুখারী ও মুসলিমের মরতবা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এমন মনে হয় যে, সিহাহ্ সিত্তা সাধারণভাবে এবং বুখারী ও মুসলিম বিশেষভাবে ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচলন না হওয়ার কারণে এর সাথে 'উলামায় কিরাম ও বুযুর্গ মাশায়িখ সম্পৃক্ত ছিলেন না; স্বয়ং তিনিও (যদি বিতর্ক সভার রোয়েদাদ সঠিক হয় তবে) বিতর্ক সভায় যে হাদীছগুলিকে সামা হালাল হবার সপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেন সেগুলি কোন সিহাহ্ সিত্তা গ্রন্থেই নেই। তদুপরি মুহাদ্দিছগণের নিকটও হাদীছগুলির মান এমন কিছু উঁচু নয়। বিপক্ষীয় 'উলামায়ে কিরামও—যাঁদের অধিকাংশই সে যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিম-'উলামা এবং বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—যেভাবে আলোচনা ও দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন তা থেকে 'ইল্‌মে হাদীছে তাঁদের অজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ পায় নি, বরং একজন 'আলিমে দীনের এ ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল সে ক্ষেত্রেও ঘাটতি অনুভূত হয়। সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থ, মনগড়া ও আজগুবী হাদীছ এবং হাদীছ-শাস্ত্রের ন্যায়ানুগ ও আপত্তিকর বিষয়াবলী প্রকাশিত না হবার কারণে খানকাহ্‌গুলিতে এমন অনেক রসম-রেওয়াজ এমন কি সিজদা তা'জিমী প্রচলিত ছিল এবং বহুবিধ রেওয়ায়েত বিভিন্ন দিন ও মুহূর্তের ফযীলত সম্পর্কে মশহূর ছিল। এগুলি মাশায়িখে কিরামের মালফুজাতগুলিতে অত্যন্ত জোরেশোরে বর্ণনা করা হয়েছে,—হাদীছের সহীহ্ সংকলন-গুলিতে যার কোনই অস্তিত্ব নেই এবং মুহাদ্দিছগণ এ ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা করেছেন। এসব সামনে রেখেই মুহাদ্দিছকুল ও তাঁদের নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে যাঁরা ভারতবর্ষে হাদীছ শাস্ত্র প্রচার এবং সহীহ ও য'ঈফ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

পথিকদের (সালেকীন) জন্য এবং যে সমস্ত লোক হেদায়াত ও তরবিয়তের খেদমত আঞ্জাম দেন তাঁদের জন্য অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন।

বাংলার একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান যুবক—যিনি পরে আখী সিরাজুদ্দীন নামে মশহূর হয়েছিলেন এবং যিনি পাণ্ডুয়ার মশহূর 'আলিম চিশতীয়া খানকাহ্‌র প্রতিষ্ঠাতা ও হালকার মধ্যমণি ছিলেন—লাখনৌতি থেকে মুরীদ হবার নিয়তে দিল্লী আসেন এবং হযরত খাজা (রঃ)-এর মুরীদ হন। তিনি মাওলানা ফখরুদ্দীন যরাবীকে বলেছিলেন, এই যুবক অত্যন্ত যোগ্যতার অধিকারী। যদি কিছু জাহিরী 'ইল্‌ম হাসিল করতে পারে তবে দরবেশীতে সে সুদৃঢ় অবদান রাখতে পারবে। এ কথা শুনে মাওলানা ফখরুদ্দীন আরয করেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে তাকে কিছু দিন আমার সাহচর্যে রেখে জরুরী মাসআলা-মাসায়েল তা'লীম দিয়ে দিতে পারি। এতে তিনি বললেন, সে আপনার সোহবতের সবচেয়ে বড় হকদার। এরপর মাওলানা ফখরুদ্দীন তাকে নিজের সাথে নিয়ে যান এবং অল্প দিনেই দরকারী 'ইল্‌মের সঙ্গে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করে তোলেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর ওফাতের পর 'ইল্‌মে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য উক্ত হযরত কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থান করেন। অতঃপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং পূর্ব বাংলায় চিশতীয়া-নিজামিয়া সিলসিলার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১]

গভীর জ্ঞানরাজি ও প্রবন্ধাদি

জাহিরী ও বাতিনী 'ইল্‌মের ব্যাপকতা, ইখলাস, নিবিষ্ট চিন্তা ও মুজাহাদার ভিত্তিতে তিনি লাভ করেছিলেন গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান, বিশ্লেষণাত্মক ও পর্যবেক্ষণ-মূলক অভিজ্ঞতা – যা সাধারণত কামিল ওলী-আওলিয়া ও মহান একনিষ্ঠ সাধকদের ভাগ্যে জুটে থাকে – যা অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং ইখলাসের অনিবার্য পরিণতি—তাসাওউফপন্থীরা যাকে ইল্‌মে লাদুন্নীর সমার্থক মনে করেন। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা বলেন, 'ইল্‌ম সম্পর্কিত যখনই কোন আলোচনা হ'ত, কিংবা সমস্য দেখা দিত –তখনই তিনি বাতিনী নূরের আলোকে তার সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতেন।

তিনি উক্ত সমস্যার উপর এমনই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন যে, হাযিরানে মজলিস বিস্মিত হয়ে যেত এবং একে অপরকে বলত যে, এটাতো কোন কিতাবী জবাব নয় বরং তা রব্বানী ইলহাম এবং 'ইল্‌মে লাদুন্নীর

১. সিয়ারুল আরিফীন ইত্যাদি,

ফয়েয। এরই ভিত্তিতে শহরের শ্রেষ্ঠতম 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা 'ইল্‌মে তাসাওউফ অস্বীকার করতেন এবং তাসাওউফপন্থীদের যারা কট্টর বিরোধী ছিলেন তারাও হযরত খাজা (রঃ)-এর ভক্তে পরিণত হন এবং লজ্জিত হন নিজেদের জ্ঞানের পরিমাপে ও অহমিকায়।

শরীয়তের বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান

জ্ঞানের এই গভীরতা, সুন্নতের অনুসরণ এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের উপর সুদৃঢ় ও অবিচল আস্থা তাঁর মন-মগজকে এতখানি শক্ত, সুস্থ, সোজা-সরল বানিয়েছিল যে, তাসাওউফপন্থীদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় দীর্ঘকাল থেকে প্রকাশ্য শরীয়তের খেলাফ চলে আসছিল এবং অনেক স্থানেই তা তাসাওউফপন্থীদের রীতি-নীতি ও স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) সুস্থ মন-মগজে সে সব গ্রহণ করতেন না। তাঁর রুচি, প্রকৃতি ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ অভিজ্ঞতা ছিল এর খেলাফ ও পরিপন্থী।

তাসাওউফপন্থী শিবিরে বহু দিন থেকে এ ধারণা চলে আসছিল যে, বিলায়েত নবুওতের তুলনায় সর্বোত্তম এবং আওলিয়ার মর্যাদা আম্বিয়ায়ে কিরামের থেকে বেশী। কেননা বিলায়েত মা'বুদে হাকীকীর সঙ্গে গভীর সম্পৃক্তি এবং আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির নাম। অপরদিকে নবুওতে (দা'ওয়াত ও তবলীগের কারণে) সৃষ্ট জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। অতঃপর এর মধ্যেও আরও কয়েকটি দল-উপদল সৃষ্টি হয়ে গেছে। এদের কেউ কেউ আবার মনে করেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের বিলায়েত নবুওতের দরজা থেকে উত্তম। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) কিন্তু এসব মতবাদ স্বীকার করতেন না। ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা (রঃ) বলেছেন, এমত মাযহাব বাতিল ও ভ্রান্ত এবং তা এই কারণে যে, যদিও আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন তার একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুহূর্তও আওলিয়াদের সমস্ত সময়-ক্ষণ থেকে বেশী মর্যাদার দাবি রাখে।[১]

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১২০ পৃষ্ঠা। ইমাম রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রঃ) এতটুকু বাড়িয়েছেন যে, আম্বিয়া কিরাম ঠিক যে মুহূর্তে সৃষ্ট জগত নিয়ে ব্যস্ত ও সম্পৃক্ত থাকেন সে অবস্থায়ও তাঁরা আওলিয়াদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মুহূর্ত থেকেও আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক নিবিষ্ট ও সম্পৃক্ত থাকেন। সৃষ্টির প্রতি তাদের সম্পৃক্ততা যেহেতু আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়ে থাকে সেহেতু আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ততা ঐশী আদেশের সমার্থক হয়ে থাকে।

হালাল বস্তু আল্লাহ্‌র পথের প্রতিবন্ধক নয়

তাসাওউফ সম্পর্কে সাধারণভাবে এটাই বুঝানো হয়েছে ও মশহূর করে দেওয়া হয়েছে যে, তাসাওউফ মানেই নিঃসঙ্গ, বেকার তথা কর্মহীন জীবন, আর কর্ম-ব্যস্ততা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মিলনপথের প্রতিবন্ধক তথা আধ্যাত্মিক সাধন পথের জন্য বিষবৎ। হযরত খাজা (রঃ) 'ইল্‌মে মা'রিফাত ও হাকীকতের যে মকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং উপায়-উপকরণ ও রসম-রেওয়াজ তথা আচার-অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে উঠে পরম লক্ষ্য ও আরাধ্যের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তার অর্থ এটাই ছিল যে, তিনি সে পর্যায়কে পেছনে ফেলে বহু দূর সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং বৈধ ও শরা'সম্মত কার্যকলাপের আলোকোজ্জ্বলতা ও তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে উপনীত হওয়া তাঁর দৃষ্টির আওতায় ছিল। হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূ দরায-এর মালফুজাত 'জাওয়ামি'উল কালিম' এ বলা হয়েছে যে, হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বলেছেন, কোন জিনিস যা বৈধ তা আল্লাহ্‌র পথে নিষিদ্ধ ও অধ্যাত্ম্য সাধনার পথে প্রতিবন্ধক নয়। অন্যথায় তা কখনই শরীয়তে বিধেয় ও বৈধ হ'ত না।[১]

কলব (আত্মা) আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্ট হলে কোন বস্তুই ক্ষতিকর নয়

একবার হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র দিকে নিবিষ্টচিত্ত এবং পবিত্র আত্মার দরকার। এরপর যে কাজেই থাক, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।[২]

দুনিয়া পরিত্যাগের হাকীকত

দুনিয়া পরিত্যাগ এবং প্রকৃত যুহ্‌দ ও দরবেশীর হাকীকত বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি বলেন,—

দুনিয়া পরিত্যাগের অর্থ এটা নয় যে, কেউ নিজেকে নগ্ন করে দেবে অর্থাৎ নেংটি পরে বসে যাবে ধ্যানে। বরং এর সঠিক অর্থ এই যে, সে কাপড়ও পরবে, খানাও খাবে এবং যখনই যা কিছু জুটবে তাকে কাজে লাগাবে, কিন্তু

১. জাওয়ামি'উল কালিম, ১৬০ পৃঃ
২. অর্থাৎ শরা'সম্মত জীবনোপকরণ এবং প্রকাশ্য কাজ-কর্ম ইত্যাদি।

তা কখনই পুঞ্জীভূত করবে না এবং নিজের অন্তর-মানসকে কোন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ রাখবে না। আর এটাই দুনিয়া পরিত্যাগের অর্থ।[১]

বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন আনুগত্য

তিনি আরও বলেন, আনুগত্য দুই প্রকার—বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন। বাধ্যতা-মূলক আনুগত্য বলতে বুঝায় তাকেই যার উপকারিতা আনুগত্য পোষণকারীর উপর গিয়ে বর্তায়; যেমন, স'লাত, সিয়াম, হজ্জ এবং তসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি। ইচ্ছাধীন আনুগত্য বলতে তাকেই বুঝায় যার উপকারিতা, শান্তি ও কল্যাণ অন্যেরা লাভ করে; যেমন, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, স্নেহ-প্রীতি, অন্যের সঙ্গে সদয় ব্যবহার ইত্যাদি। এগুলিকে ইচ্ছাধীন আনুগত্য বলা হয়ে থাকে এবং এর ছওয়াবও অসীম ও অপরিমেয়।

বাধ্যতামূলক আনুগত্য গ্রহণীয় হবার জন্য বেশী প্রয়োজন ইখলাসের এবং ইচ্ছাধীন আনুগত্য যেভাবেই করবে ছওয়াব মিলবে।[২]

কাশ্‌ফ ও কারামত আল্লাহ্‌র পথের অন্তরায়

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) আরও বলেছেন যে, ওলী-আওলিয়াদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা তাঁদের নেশা ও মত্ততার পরিণতি। তা এই জন্য যে তাঁরা নেশাধারী। অপর দিকে আম্বিয়ায়ে কিরাম সহীহ্ ও সঠিক বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর জন্য কাশ্‌ফ ও কারামত অধ্যাত্ম সাধনা পথের অন্তরায়স্বরূপ। মুহব্বত দ্বারাই দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।[৩]

আওলিয়া ও আম্বিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান

তিনি আরও বলেন যে, মরতবার স্তর তিনটি,---তন্মধ্যে প্রথম মরতবা যাকে অনুভূতির পরিমাপ বলা হয়; দ্বিতীয়টিকে বুদ্ধির পরিমাপ এবং তৃতীয়টিকে পবিত্রতার পরিমাপ বলা হয়। অনুভূতির পরিমাপের অন্তর্গত বিষয়াদির মধ্যে খানাপিনার যাবতীয় দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি অনুভবযোগ্য বিষয়াদি পরিগণিত। এরপর 'আকল তথা বুদ্ধিগত পরিমাপ যার সম্পর্ক দু'টি 'ইল্‌মের সঙ্গে—একটি অর্জিত এবং অপরটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু 'আলমে কুদ্‌সে পৌঁছে বুদ্ধির সাহায্যে লব্ধ যে-কোন 'ইল্‌মই সর্বজনস্বীকৃত বলে মালুম হতে থাকে। অতঃপর

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃঃ ৭; ২. ঐ, পৃ ১৪;
৩. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ পৃঃ ৩৩;

তিনি আরও বলেন যে, যার উপর 'আলমে কুদসের দরওয়াজা খুলে যায় তার 'আলামত কি হতে পারে? যে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে ('আলমে 'আকল) থাকেন এবং তিনি কোন কোন মাসআলাকে সর্বজনস্বীকৃত অথবা অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করেন এবং এর থেকে তিনি এক প্রকার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। তিনি 'আলমে কুদসে রাস্তা পান না। এ ক্ষেত্রে তিনি জনৈক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, অদৃশ্য জগত থেকে কিছু জ্ঞান ও ঘটনাবলী মনের উপর দিয়ে বয়ে যায়। আল্লাহ চাহে তো আমি সেসব লিখব। এরপর তিনি অনেক কিছুই লিখলেন। অতঃপর বললেন, অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, কিন্তু যা ছিল আসল উদ্দেশ্য তা লিপিবদ্ধ করা গেল না।[১]

দুনিয়ার মুহব্বত ও দুশমনী

একদিন আলোচনা হচ্ছিল যে, কারও দুনিয়ার প্রতি মুহব্বত সৃষ্টি হয়ে থাকে আর কারও হয়ে থাকে ঘৃণা। তিনি বললেন, তিন ধরনের লোক রয়েছে: কিছু লোক রয়েছে যারা দুনিয়ার সঙ্গে মুহব্বত রাখে এবং দিন-রাত এর চিন্তা-ভাবনায় ও স্মরণে থাকে। এদের সংখ্যা বহু। কিছু লোক এমনও আছে যারা দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে এর নাম উচ্চারণ করে এবং সর্বদাই এর দুশমনীতে লিপ্ত থাকে। তৃতীয় প্রকার লোক যারা না দুনিয়ার সাথে মুহব্বতের সম্পর্ক রাখে আর না রাখে ঘৃণার সম্পর্ক এবং দুনিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে না মুহব্বতের সঙ্গে তার নাম উচ্চারণ করে, আর না ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে; এরা প্রথমোক্ত দুই প্রকারের চেয়ে ভাল। এরপর তিনি একটি কাহিনী শোনালেন: জনৈক ব্যক্তি হযরত রাবিয়া বসরী (রঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দুনিয়াকে ভীষণ নিন্দাবাদ করতে লাগল। হযরত রাবিয়া বসরী (রঃ) তাকে বললেন, মেহেরবানী করে এরপর আর এখানে আসবেন না। মনে হচ্ছে আপনি দুনিয়াকে অত্যন্ত ভালবাসেন, এজন্য বারবার দুনিয়ার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন।[২]

তেলাওয়াতে কালামে পাকের মরতবা

একবার তিনি তেলাওয়াতে কুরআন পাকের মরতবা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, প্রথম মরতবা এই যে, যা কিছু পড়বে তার অর্থ হৃদয়ে অনুভূত হবে।

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, পৃঃ ৬৯;
২. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১৮৯ পৃঃ

দ্বিতীয় মরতবা এই যে, তেলাওয়াতকালীন মুহূর্তে আল্লাহ্র 'আজমত ও শান-শওকত মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং তৃতীয় মরতবা, তেলাওয়াত-কারীর অন্তর-মানস আল্লাহ্কে নিয়ে মশগুল ও সম্পৃক্ত হবে।

তিনি বললেন, কুরআন পাঠকালীন নিদেনপক্ষে এতটুকু বোধশক্তি তো প্রতিটি ব্যক্তিরই থাকা উচিত, 'আমি এই নিয়ামতের কতখানি হকদার ছিলাম, আর এই মূল্যবান সম্পদ লাভের এমন ভাগ্যই বা আমার ছিল কোথায়?' যদি এসব হাসিল না হয় তবে তেলাওয়াতকালীন যে ছওয়াব ও পুরস্কারের ওয়াদা প্রদত্ত হয়েছে তা স্মৃতিপটে জীবন্ত ও ভাস্কর করে ধরে রাখা দরকার।[১]

যদিও হযরত খাজা (রঃ), যেমন তিনি কয়েকবারই বলেছেন, কোন লিখিত গ্রন্থ রেখে যান নি,[২] কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গ্রন্থরাজি তাঁরই হাতে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত এবং তাঁরই সাহচর্যে ধন্য ও গৌরবান্বিত সেই সমস্ত মহান খলীফা ও নামজাদা সঙ্গী-সাথীবৃন্দ যাঁরা বিশুদ্ধ আমল ও সঠিক নির্ভেজাল 'ইল্মের বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং যাঁদের অন্তরের সহজ সারল্য, জ্ঞানের গভীরতা ও উপলব্ধির পরিপক্কতা কুরআনুল করীমে বর্ণিত راسخين فى العلم শানের অনুরূপ ছিল। আমীর হাসান 'আলা সজযীর ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ এবং আমীর খোরদ-এর সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর বহু বাণী ও মালফুজাত বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে তাঁর শান-শওকতের প্রকাশ ঘটেছে।

---

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ৭১ পৃঃ

২. ঐ, ৪৫ পৃষ্ঠা ; এবং খায়রুল মাজালিস, ২৫ ;

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফয়েয ও বরকত

ঈমানের নব জাগরণ এবং ব্যাপক ও সাধারণ তওবাহ্

ঐ সমস্ত ফয়েয ও বরকত সম্বন্ধে বর্ণনা করার পূর্বে যা হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ ও তওবাহ করার মাধ্যমে লাখ লাখ মুসলমান লাভ করেছিল এবং এমন এক যুগে যখন মুসলিম হুকুমত সৌভাগ্যের স্বর্ণ-শিখরে আসীন এবং গাফিলতী, আল্লাহ্-বিমুখতা, আত্মপূজার উপায়-উপকরণের ছিল পূর্ণ যৌবন —এমন একটি নতুন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক (রূহানী) প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যাকে প্রতিটি অনুভবকারী ব্যক্তিই অনুভব করেছেন। সমীচীন মনে হচ্ছে যে, তরীকতের বুযুর্গগণের সাধারণ বায়'আত, জনগণকে সৎপথ প্রদর্শন, ইসলামের উপদেশ প্রদান, তওবাহ্‌র হিকমত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে দেওয়া যাক যেন জানা যায় যে, কোন্ অবস্থা ও অনিবার্যতার কারণে এমত তরীকা ও পদ্ধতি এখতিয়ার করা হয়েছিল এবং এর দ্বারা কি ধর্মীয় কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করা গেছে। বর্তমান লেখক ''তারীখে দাও'য়াত ওয়া 'আযীমাত''-এর প্রথম খণ্ডে হযরত সায়্যিদুনা 'আবদুল কাদির জিলানী (রঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা কিছু লিখেছিলাম প্রথমে সেটাকেই কিছুটা সংক্ষিপ্ত ও ছাট-কাট করে উদ্ধৃত করছি—

''শ্রেষ্ঠ যুগসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর জনবসতির বিস্তৃতি, জীবনের দায়িত্ব এবং জীবিকার চিন্তা-ভাবনা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, বিশিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ শুদ্ধি ও সংস্কার এবং প্রশিক্ষণের কাজ নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং বৃহৎ পরিমাপের কোন ধর্মীয় ও আত্মিক বিপ্লবের আশা-ভরসা ও করা যেত না। অতএব তখন সামনে এমন কোন্ পন্থা-পদ্ধতিই-বা খোলা ছিল যার মাধ্যমে মুসলমানরা বিরাট সংখ্যায় নিজেদের ঈমানের পুনর্জাগরণ ঘটাবে, ধর্মীয় দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাসমূহকে পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি ও উপলব্ধির সঙ্গে পুনরায় কবুল করবে যাতে করে তাদের মধ্যে নিজেদের ঈমানী চেতনা ও ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, বিমর্ষ ও মৃত অন্তর-মাঝে পুনরায় প্রেমের উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তাদের ক্লান্ত ও দুর্বল দেহে পুনরায় চলার শক্তি ও প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি হয়, কোন একনিষ্ঠ আল্লাহ-ভীরু বান্দার প্রতি তাদের আস্থা দৃঢ় হয় এবং তাঁর থেকে আত্মিক ও প্রবৃত্তিজাত

রোগ-ব্যাধিতে সুচিকিৎসা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সঠিক আলো ও পথ-নির্দেশনা লাভ সম্ভব হয়। পাঠকরা নিশ্চয় ধারণালাভে সক্ষম হয়েছেন যে, যে ইসলামী হুকুমতের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল হেদায়াতের পথ দেখাবার, সে হুকুমত তার দায়িত্ব পালনে শুধু উদাসীন হয়েই যায় নি বরং তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের আমল ও কৃতকর্মও সে-কাজের জন্য ক্ষতিকর এবং সে-পথের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে তারা এমন বদগুমান, খেয়াল-খুশীর পূজারী ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল যে, নতুন কোন সংগঠন এবং নতুন কোন দা'ওয়াত কিংবা আহ্বান যার ভেতর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সামান্য মাত্র গন্ধ পাওয়া যেত তারা সেটাকে বরদাস্ত করতে পারত না, সঙ্গে সঙ্গেই তা নির্মূল করে দিত। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন ধর্মীয় জীবন, নতুন নিয়ম-শৃংখলা এবং একেবারে গোড়া থেকে নতুনভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করবার জন্য এছাড়া আর কোন্ পন্থা অবশিষ্ট ছিল যে, আল্লাহ্‌র কোন ভক্ত ও একনিষ্ঠ বান্দাহ হুযূর আকরাম (সঃ)-এর প্রবর্তিত তরীকার উপর ঈমান ও আমল তথা শরীয়ত অনুসরণের বায়'আত নেবেন এবং মুসলমান তাঁর হাতের উপর হাত রেখে নিজেদের পূর্ব অলসতা ও জাহিলিয়াতের জীবন থেকে তওবাহ করবে—করবে ঈমানী চেতনার পুনরুজ্জীবন—অতঃপর সেই নায়েবে রাসূল তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ দিবেন, নিজের মূল্যবান প্রভাবমণ্ডিত সাহচর্য, স্বীয় প্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দৃঢ়তা ও স্বীয় প্রাণের উষ্ণতা থেকে পুনরায় ঈমানী উত্তপ্ততা, উষ্ণ প্রেম, একনিষ্ঠতা ও একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সকল কিছু করবার মানসিকতা, সুন্নতে নববী অনুসরণের আবেগ-উদ্দীপনা এবং পারলৌকিক জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করবেন? তাদের এই নতুন সম্পর্ক থেকে অনুভূত হোক যে, তারা একটি জীবন থেকে তওবাহ করেছে এবং সম্পূর্ণ নতুন আর এক জীবনে পদার্পণ করছে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় এমন এক বান্দাহ্‌র হাতের উপর হাত রেখে দিয়েছে যিনি অনুভব করেন যে, ঐ সমস্ত বায়'আত-কারীর সংশোধন, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ এবং তাদের দীনী খেদমত আল্লাহ পাক আমার উপর সোপর্দ করেছেন, আর এই মুহব্বত ও আস্থার কারণে আমার উপর এক নয়া দায়িত্ব বর্তেছে। অতঃপর তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও গবেষণা এবং কুরআনুল করীম ও সুন্নতে নববী (সঃ)-এর মূলনীতি ও শিক্ষা মুতাবিক তাদের ভেতর রূহানী ভাবধারা ও তাকওয়া এবং তাদের জীবনে ঈমান, গভীর প্রত্যয়, ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা এবং তাদের আমল ও অবস্থার ভেতর ঈমানী ভাবধারা ও প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করতে প্রচেষ্টা চালাবেন। এটাই

প্রকৃত হাকীকত সেই সব বায়'আত ও প্রশিক্ষণের যা ধর্মের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগগণ যুগে যুগে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণ এবং মুসলমানদের সংস্কার ও সংশোধনের কাজে পরিচালনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র লাখ লাখ বান্দাকে ঈমানের হাকীকত ও ইহসানের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।"[১]

বায়'আত একটি অঙ্গীকার ও পারস্পরিক ওয়াদা পালনের নাম

বায়'আত পেছনের সমস্ত গুনাহ থেকে তওবাহ এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সঃ)-এর বিধি-বিধান প্রতিপালন এবং সুন্নতে নববীর পূর্ণ অনুসরণ করবার পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিরই নাম। সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ) বায়'আত গ্রহণ করার সময় বায়'আতকারীদের থেকে কি শপথ উচ্চারণ করাতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কি অঙ্গীকারই-বা নিতেন—কোন জীবনী-গ্রন্থেই তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) স্বয়ং স্বীয় শায়খ ও মুরশিদ শায়খুল কবীর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর বায়'আত নেবার তরীকা এবং তাঁর উপদেশাবলীর আলোচনা করেছেন এবং স্বীয় শায়খ-এর সাথে তাঁর যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল—ছিল তাঁকে অনুসরণের যে আবেগ ও প্রেরণা—তা থেকে এ ধারণাই করা চলে যে, তিনিও তেমনিই স্বীয় মুরীদবর্গকে শিক্ষা, ও উপদেশ প্রদান করে থাকবেন।

তিনি বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি শায়খুল 'আলম শায়খ ফরীদুদ্দীন-এর খেদমতে মুরীদ হবার নিয়তে আসত, তিনি তাকে বলতেন, একবার সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়। এরপর সুরা বাকারার শেষ রুকু' امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত পড়াতেন। অতঃপর شهد الله انه لا اله الا الله ان الدين عند الله الاسلام পর্যন্ত পড়াতেন। এরপর বলতেন, "তোমরা এই দুর্বলের হাতের উপর বায়'আত করে তাঁর শায়খ-এর হাতের উপর এবং (এই ধারাক্রম অনুসারে) হযরত পয়গম্বর (সঃ)-এর মুবারক হাতের উপর ও আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে 'আলম-এর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলে যে, নিজেদের হাত, পা ও চোখকে হেফাজত করবে এবং শরীয়ত-নির্দেশিত পথ ও পন্থাসমূহে কায়েম থাকবে।"

বায়'আতের এই শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে ইসলামের বুনিয়াদী 'আকীদাসমূহ যেমন এসে গেছে—তেমনি এসে গেছে "শুনব ও অনুসরণ করব"-এর ওয়াদা ও অভিপ্রায়ের কথাও। একথাও এসে গেছে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে একমাত্র মনোনীত ও গৃহীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এর দ্বারা এ অনুভূতিও জাগ্রত করে

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ৩২৬

দেওয়া হ'ত যে, এই বায়'আত প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র হাতের উপরই করা হয়েছে এবং শায়খ-এর হাত সেই মুবারক হাতেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এর দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন-এর সঙ্গেও অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, বায়'আতকারী তার হাত, পা ও চোখকে পাপরাশি থেকে হেফাজতে রাখবে এবং শরীয়ত নির্দেশিত পথের উপর নিজেকে কায়েম রাখবে। ঈমানের পূর্ণ জাগরণ এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সঃ)-এর সঙ্গে নিজের অঙ্গীকার প্রতিপালনের এর চাইতে উত্তম বোধগম্য তরীকা আর কী হতে পারে? এটা তো বলা যায় না যে, বায়'আতকারীদের শতকরা একশ' ভাগ এ প্রতিজ্ঞার উপর কায়েম থাকত। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বায়'আতকারীদের একটি বিরাট অংশ এই স্বীকোরোক্তি ও অঙ্গীকার রক্ষা করত এবং আল্লাহ্‌র হাযার হাযার লাখ লাখ বান্দাহ এই ঈমানী পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবাত্মক অবস্থার মাধ্যমে নিজেদের শুধ্‌রে নিত।

সাধারণ ও ব্যাপক বায়'আত-এর হিকমত

সাধারণ গণমানুষকে বায়'আত ও হেদায়াতের লক্ষ্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত বুযুর্গ যে খোলাখুলি ও সাধারণ অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন এবং যে-ভাবে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাছাই-মনোনয়ন ছাড়াই লোকদের অনুমতি ছিল যে, তারা বায়'আত গ্রহণ করুক এবং মুরীদ দলভুক্তদের কাতারে শামিল হোক। বিশেষ করে হযরত খাজা (রঃ)-এর দরবারে এ অধ্যায়ে যে প্রশস্ত ও উদার সুযোগ-সুবিধা ছিল, তাতে কারও কারও খট্‌কা সৃষ্টি হতে পারে যে, বায়'আত যখন একটি অঙ্গীকারের নাম এবং এর সম্পর্ক গোটা জীবনের সঙ্গে জড়িত তখন এতে এত খোলামেলা ও উদারতার সুযোগ রাখা হ'ল কেন? হযরত খাজা (রঃ) একবার নিজেই এর উত্তর দিয়েছিলেন এবং এরূপ সাধারণ অনুমতির হিকমত বর্ণনা করেছিলেন।

মাওলানা যিয়াউদ্দীন বার্নী (তারীখে ফিরূযশাহীর প্রণেতা) বলেন যে, আমি একদিন সুলতানুল মাশায়িখের খেদমতে হাযির ছিলাম। ইশরাক থেকে চাশত পর্যন্ত আমি তাঁর হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা শুনতে থাকি। ঐ দিন বিশেষ করে অনেক লোকই বায়'আত গ্রহণ করে। এ দৃশ্য দেখে আমার মনে এ ধারণার সৃষ্টি হ'ল যে, পূর্ব যামানার বুযুর্গগণ মুরীদ করবার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ) স্বীয় বদান্যতা ও করুণার কারণে এক্ষেত্রে সাধারণ অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি

সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সবাইকে মুরীদ বানিয়ে নিচ্ছেন। আমি চাইলাম যে, এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করি। সুলতানুল মাশায়িখ স্বীয় কাশ্‌ফ দ্বারা আমার জিজ্ঞাসা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেন,

"মাওলানা যিয়াউদ্দীন! সব ধরনের কথাই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাক, কিন্তু এটাতো জানতে চাও না যে, কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়াই যে-কোন আগত ব্যক্তিকেই কেন আমি মুরীদ করি।"

একথা শোনার পর আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হ'ল আর আমি তাঁর পা আঁকড়ে আরয করলাম যে, বেশ কিছু কাল থেকে আমার অন্তরে এই সমস্যা তোলপাড় করে ফিরছিল এবং আজও এ ওয়াসওয়াসা আমার মনে এসেছিল। আল্লাহ পাক আপনার মনে একথার উদয় ঘটিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন,—

"আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক যুগে স্বীয় অপার ও পরিপূর্ণ হিকমত-এর একটি বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। এর পরিণাম এই যে, প্রতিটি যুগের লোকজনের জীবনযাপন পদ্ধতি ও আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং তাদের মিযাজ ও প্রকৃতি অতীত যুগের লোকদের প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে মিল খায় না। অল্প লোকের মধ্যেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। আর এটা অভিজ্ঞতারই ফসল। মুরীদ হবার আসল উদ্দেশ্য তো এটাই যে, মুরীদ আল্লাহ ব্যতীত আর সমস্ত কিছুর সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত ও তাঁর প্রতি সমর্পিত করবে যেমনটি তাসাওউফের কিতাব-গুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পূর্ব যামানার বুযুর্গগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মুরীদের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অপর সকল কিছুর সঙ্গে এই সম্পর্কচ্যুতি না লক্ষ্য করতেন, বায়'আতের জন্য হস্ত প্রসারিত করতেন না। কিন্তু সুলতান আবু সা'ঈদ আবুল খায়ের-এর রাজত্বকাল থেকে বুযুর্গ শ্রেষ্ঠ শায়খ ফরীদুল হক ওয়াদ্দীন (কঃ সঃ)-এর সময় কাল পর্যন্ত এ সমস্ত মহান বুযুর্গ ছিলেন দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভীড় এঁদের দরওয়াজায় লেগেই থাকত এবং উঁচু-নীচু প্রতিটি শ্রেণীর লোকই সেখানে সমবেত হ'ত। ঐ সমস্ত আল্লাহ্‌র বান্দা পারলৌকিক দায়িত্বানুভূতির কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে এইসব আল্লাহ-প্রেমিক লোকদের আশ্রয় আঁকড়ে ধরতে চাইল। তখন ঐ সব মহান বুযুর্গও সাধারণ ও বিশিষ্ট সর্বশ্রেণীর লোকদেরই বায়'আত কবুল করেছেন এবং খিরকায়ে তওবা ও তাবাররুক দান করেছেন।

এখন আমি তোমার সওয়ালের জবাব দিচ্ছি—আমি কেন মুরীদ করবার ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করি না এবং নিজেকে নিশ্চিন্ত করি না। এর একটি কারণ এই যে, আমি ধারা-পরম্পরা শুনে আসছি যে, বহু লোক মুরীদ হবার পর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে তওবাহ করে প্রত্যহ নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করতে থাকে এবং অন্যান্য নফল 'ইবাদত-বন্দেগীতেও নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এখন আমিও যদি শুরু থেকেই এ ব্যাপারে শর্ত আরোপ করি যে, তার ভেতর মুরীদ হবার হাকীকত (প্রকৃত তাৎপর্য) অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন যাবতীয় বস্তু থেকে সম্পর্কচ্যুতির নজীর পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং তাকে তওবাহ ও পবিত্রতার খিরকা না দেই, তবে তারা কল্যাণের এ পরিমাণটুকুও —যা ঐ সমস্ত বান্দার কারণে তাদের ভেতর আসছে---তা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমি দেখছি যে, একজন মুসলমান অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে ও বিনয়-নম্রভাবে আমার নিকটে আসে এবং বলতে থাকে যে, সে সমস্ত গুনাহ থেকে তওবাহ করেছে। আমি তার কথা সত্য মনে করে তাকে বায়'আত করে নেই। বিশেষ করে এজন্য যে, বহু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনি যে, অনেক বায়'আতকারীই এই বায়'আতের কারণে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে।"[১]

জনজীবনে এর প্রভাব

এই বায়'আত ও সম্পর্ক যদ্দ্বারা মুসলমানদের প্রতিটি শ্রেণী সমভাবে উপকৃত ও কল্যাণমণ্ডিত হ'ল, সাধারণ জীবন-জিন্দেগী ও সামাজিক জীবন, জনগণের চরিত্র, অভ্যাস, কাজ-কর্ম ও সময়ের গতিধারার উপর এবং শাসকশ্রেণী থেকে শুরু করে শ্রমজীবী শ্রেণী পর্যন্ত মানুষের সামগ্রিক অবস্থার উপর এর কি প্রভাব পড়ল এবং রাজধানী দিল্লীতে যেখানে সারা ভারতবর্ষের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ—আর শত শত নয়, হাযার হাযার বছরের ধনভাণ্ডারের সোনা-দানা ও হীরা-জহরত, শিল্পী ও কারিগরদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত কোণ থেকে উপহার-উপঢৌকন, দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্লাবনের ন্যায় আছড়ে পড়ছিল, সেখানে দীনদারী, আল্লাহ-সন্ধানী, ঐশী প্রেম, তওবাহ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য, পারস্পরিক লেন-দেনে পরিচ্ছন্নতা, স্পষ্ট ভাষণ এবং আমানতদারী তথা বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে কেমনতরো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তারিত

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃঃ ৩৪৬-৩৪৮—মাওলানা জিয়াউদ্দীন বার্নীর 'হাসরতনামার, বরাত দিয়ে উদ্ধৃত।

৮—

বিবরণ সে যুগের বিজ্ঞ দূরদর্শী ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বার্নীর মুখেই শুনুন। তিনি সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন —[১]

"সুলতান 'আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের বুযুর্গগণের মধ্য থেকে তাসাওউফের পদ শায়খুল ইসলাম হযরত নিজামুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম 'আলাউদ্দীন এবং শায়খুল ইসলাম রুকনুদ্দীন দ্বারা অলংকৃত ছিল। দুনিয়ার একটি উল্লেখ-যোগ্য অংশ ঐ সমস্ত পবিত্র আত্মার দ্বারা বরকতময় ও সমৃদ্ধিশালী হয় এবং তাঁদের হাতে বায়'আত করে, তাঁদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় পাপী ও গুনাহগার লোকেরা তওবাহ করে, হাযার হাযার পাপাচারী ও বদকার এবং বেনামাযী তাদের অন্যায় ও পাপাচার থেকে নিজেদের ফিরিয়ে রাখে এবং চিরদিনের জন্য তারা সালাতের পাবন্দ হয়ে যায় এবং গোপনীয়তার সঙ্গে ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আবেগ-উদ্দীপনা প্রকাশ করে। তাদের তওবাহ হয়েছিল সহীহ ও বিশুদ্ধ; বাধ্যতামূলক ও ইচ্ছাধীন তথা ফরয ও নফল ইবাদত-বন্দেগী তাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং বস্তু জগতের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক লোভ ও আকর্ষণ যা মানুষের কল্যাণ ও আনুগত্যের বুনিয়াদ ঐ সমস্ত বুযুর্গের উন্নত ও প্রশংসনীয় চরিত্র এবং দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতি নির্লোভ ও নিস্পৃহ মন-মানসিকতা দৃষ্টে এদের মন থেকে কমে যায়; আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিক) নফল 'ইবাদত ও ওজীফা পাঠের আধিক্য এবং বান্দাহ সুলভ গুণাবলীর অব্যাহত অনুশীলনী দ্বারা তাদের অন্তরে কাশ্‌ফ ও কারামত লাভের আরযূ পয়দা হতে থাকে। সে সব মহান বুযুর্গের 'ইবাদত-বন্দেগী ও কার্যকলাপ এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের বরকতের কারণে জনগণের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যেও সততা ও ঈমানদারীর সৃষ্টি হয়। তাঁদের উন্নত চরিত্র, দীনের জন্য কঠোর-কঠিন মুজাহাদা ও রিয়াযত পরিদৃষ্টে আল্লাহওয়ালা লোকদের মন-মানসে নিজেদের আমল-আখলাকেও পরিবর্তনের খাহেশ সৃষ্টি হয়। এবং ঐ সব দীনী বাদশাহদের মুহব্বত ও আমল-আখলাকের প্রভাবে আল্লাহ তা'আলার ফয়েযের বারিধারা দুনিয়ার বুকে বর্ষিত হতে থাকে, আর আসমানী বালা-মুসীবতের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের যামানার লোকজন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মুসীবত থেকে রক্ষা পায় এবং তাদের একনিষ্ঠ ও ভালবাসামণ্ডিত 'ইবাদত-বন্দেগীর বরকতে

১. তারীখে ফিরূযশাহীর উদ্ধৃত অংশের এ অনুবাদ সায়্যিদ সাবাহুদ্দীন রাহমান এম. এ. (রফীক, দারুল মুসান্নেফীন)-এর গ্রন্থ 'বযমে সূফিয়া" থেকে কাটছাঁট করে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১০৯-২০২ পৃষ্ঠা:

মোগলদের ফেতনা বিলুপ্ত হয় এবং তারাও বিনষ্ট হয়ে যাযাবরে পরিণত হয়। ঐ তিনজন বুযুর্গের অস্তিত্বের কারণে সমসাময়িককালে শরীয়ত ও তরীকতের সকল বিধি-বিধানের বিস্ময়কর শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব লাভ ঘটে। কত না আশ্চর্য ছিল সে যুগ যা সুলতান 'আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের শেষ দশ বৎসরে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। একদিকে সুলতান 'আলাউদ্দীন রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণের জন্য সমস্ত নেশা জাতীয় ও নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি এবং পাপাচার ও অন্যায় বিভিন্ন প্রকার কঠোর শাস্তির মাধ্যমে বন্ধ করে দেন। অপর দিকে সে যুগেই শায়খুল ইসলাম নিজামুদ্দীন বায়'আতের দরওয়াজা সাধারণের জন্য খুলে দেন। গুনাহগার ও পাপীদের খিরকা পরিধান করান এবং তাদেরকে তাদের পাপাচার ও অন্যায় থেকে তওবাহ্ করিয়ে মুরীদ বানান। সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ধনী-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, নিরক্ষর ও শিক্ষিত, আশরাফ ও আতরাফ, শহুরে ও গ্রামবাসী, যুদ্ধ বিজয়ী বীর (গাযী) ও মুজাহিদ, স্বাধীন ও গুলাম সবাইকে তাকওয়া ও পাক-পবিত্রতার তা'লীম দেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, সাধারণ মানুষ, চাকর-বাকর সবাই সালাত আদায় করত এবং অধিকাংশ মুরীদ চাশত ও সালাতুল ইশরাকেরও পাবন্দ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন ও সৎকর্মশীল লোকেরা শহর থেকে গিয়াছপুর পর্যন্ত কতিপয় অবসর বিনোদন কেন্দ্রে চবুতরা কায়েম করে দিয়েছিল, ছাপপড় ফেলে দিয়েছিল, কুয়া খনন করে দিয়েছিল, পানি-ভরতি ঘড়া এবং মাটির লোটা রেখে দিয়েছিল, দিয়েছিল চাটাই বিছিয়ে। প্রতিটি চবুতরা ও প্রতিটি ছাপড়াতে একজন করে চৌকিদার ও একজন কর্মচারী নিযুক্ত করে দিয়েছিল যেন মুরীদ ও তওবাহকারী সৎলোকদের শায়খ নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর আস্তানা পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে, সালাত আদায় করতে কোন বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। চবুতরা ও ছাপড়াতে নফল পাঠকারী মুসল্লীদের ভীড় দেখা যেত। অধিকাংশ লোকের মাঝে চাশ্‌ত, ইশরাক, সালাতুল আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ ও বেলা গড়িয়ে যাবার মুহূর্তের নামাযের প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব নফল সালাত প্রতিটি ওয়াক্তে কে কত রাকা'ত আদায় করেছে এবং প্রতি রাকা'তে কালামে পাকের কোন্ সূরা এবং কোন্ কোন্ আয়াত পড়েছে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হ'ত। অধিকাংশ নতুন মুরীদ শায়খ (রঃ)-এর পুরানো মুরীদদের থেকে গিয়াছ-পুর যাতায়াতের মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করত, শায়খ (রঃ) রাতের বেলায় কত রাকা'ত সালাত আদায় করেন এবং প্রতিটি রাকা'তে কি পড়েন, 'ইশার সালাতের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর কতবার দরূদ পাঠান এবং শায়খ ফরীদ (রঃ) ও

শায়খ বখতিয়ার কাকী (রঃ) দিন-রাতে কতবার দরূদ পাঠিয়ে থাকেন আর সূরা ইখলাস কতবার পড়েন। নতুন মুরীদরা পুরানো মুরীদদের এবম্বিধ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করত। তারা সিয়াম, নফল এবং কম আহার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করত। পুণ্যের ঐ যুগে অধিকাংশ লোকেরই কুরআন পাক হেফজ করার গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। নতুন মুরীদ শায়খ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর পুরানো মুরীদদের সাহচর্যে থাকত। পুরানো মুরীদদের আনুগত্য, 'ইবাদত-বন্দেগী, দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি, তাসাওউফের গ্রন্থাদি পাঠ, মাশায়িখে কিরামের প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং তাঁদের কার্যকলাপ তথা পারস্পরিক লেনদেন বর্ণনা করা ব্যতীত আর কোন কাজ ছিল না। দুনিয়া এবং দুনিয়াদার লোকদের সম্পর্কে কোন আলোচনা তাদের মুখেই আসত না। দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীর মেলামেশার কাহিনীর প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না, সেটাকে তারা দূষণীয় ও পাপ বলে মনে করত। নফল 'ইবাদত-বন্দেগীর আধিক্য ও পাবন্দীর ব্যাপারগুলি ঐ বরকতময় যুগে এমত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল যে, বাদশাহী মহলের অনেক আমীর-উমারা, সৈন্যাধ্যক্ষ, শাহী ফৌজ ও নওকর শায়খ (রঃ)-এর মুরীদ হতেন এবং চাশ্‌ত ও সালাতুল ইশরাক আদায় করতেন। 'আইয়ামবিজ'-এর সিয়াম ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের সিয়ামও পালন করতেন। আর এমন কোন মহল্লাও ছিল না যেখানে এক মাস বিশ দিন পর নেককার লোকদের সম্মেলন হ'ত না, কিংবা সূফীদের সামা'র মহফিল হ'ত না এবং তাঁরা পারস্পরিক কান্নাকাটি করতেন না। শায়খ (রঃ)-এর কতিপয় মুরীদ তারাবীহের নামাযে এবং ঘরেও খতমে কুরআন করতেন। যে সমস্ত লোক এ বিষয়ে একটি স্থিতি অবস্থায় উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল তারা রমযান মাসে, জুম'আর দিনে এবং ধর্মীয় আনন্দ-উৎসবের রজনীগুলিতে ভোর পর্যন্ত জেগে কাটাত, দুই চোখের পাতা কখনও এক করত না। শায়খ (রঃ)-এর মুরীদদের মধ্যে যাঁরা উচচ স্তরের ছিলেন তাঁরা সারা বছর ধরেই রাত্রির এক বা দুই-তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পাঠে কাটিয়ে দিতেন। কোন কোন 'ইবাদত-গোযার ব্যক্তি 'ইশার সময়কার ওযু দিয়েই ফজর আদায় করতেন। শায়খ (রঃ)-এর মুরীদদের ভেতর থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে আমি জানি যে, শায়খ নিজামুদ্দীন (র)-এর ফয়েয ও অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভে কাশ্‌ফ ও কারামতের অধিকারী হয়েছিলেন। শায়খ (রঃ)-এর পবিত্র অস্তিত্ব, তাঁর নিশ্বাসের বরকত এবং তাঁর মকবুল দু'আর কারণে এদেশের অধিকাংশ মুসলমান 'ইবাদত-বন্দেগী, তাসাওউফ ও যুহ্‌দ-এর দিকে

ঝুঁকে পড়া এবং শায়খ (রঃ)-এর মুরীদ হবার দিকেই অগ্রগামী হয়ে গিয়েছিল। সুলতান 'আলাউদ্দীন গোটা পরিবারসহ শায়খ নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর একনিষ্ঠ ভক্তে ও অনুরক্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সবার অন্তরেই সততা ও নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। 'আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বছরে মদ, প্রেমের দালালী, অন্যায় ও পাপাচার, জুয়া ও অশ্লীলতা ইত্যাদির নামও উচ্চারিত হ'ত না অধিকাংশ লোকের মুখে। বড় গুনাহ জনগণের নিকট কুফরীর সমার্থক বলে প্রতীয়মান হ'ত। মুসলমানরা লজ্জাবশত সুদখোরী ও মজুদদারীতে খোলাখুলি লিপ্ত হতে পারত না। দোকানদারদের মধ্যে মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেওয়া ও ভেজাল মেশানোর রেওয়াজ উঠে গিয়েছিল। অধিকাংশ ছাত্র ও বড় বড় লোক যারা শায়খ (রঃ)-এর খেদমতে থাকত, তাসাওউফ ও তরীকতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যয়নের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। কুওয়াতুল কুলূব, ইয়াহ্ইয়াউল 'উলুম, তরজমা ইয়াহ্ইয়াউল 'উলুম,'আওয়ারিফ,কাশফুল মাহজুব,শরাহ্ তাআররুফ, রিসালা কুশায়রী, মিরসাদুল 'ইবাদ, মাকতুবাতে আইনুল কুজাত, কাযী হামীদুদ্দীন নাগোরীর লাওয়ায়েহ ও লাওয়ামেহ্ এবং ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ-এর বহু ক্রেতা ও পাঠক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ লোক পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে মা'রিফত ও হাকীকত সম্পর্কিত কিতাবাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত। এমন কোন পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি ছিল না যার পাগড়ীতে মেসওয়াক এবং চিরুণী দৃষ্টিগোচর হ'ত না। সূফী-দরবেশদের অতিরিক্ত ক্রয়ের কারণে লোটা ও চামড়ার পাত্রের অভাব দেখা দিয়েছিল। মোদ্দা কথা, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-কে অতীত যুগের হযরত শায়খ জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) এবং শায়খ বায়েজীদ বুস্তামী (রঃ)-এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি করেই পয়দা করেছিলেন।"[১]

প্রেমের বাজার

তওবাহ, ঈমানী পুনরুজ্জীবন এবং অবস্থার সংস্কার দ্বারা দিল্লীর প্রতিটি অলি-গলি প্রভাবিত হচ্ছিল এবং শাহী দরবার ও শাহী মহলসহ "বামে হাযার সতূন" পর্যন্ত তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল। একটি নতুন পরিবর্তন এই ছিল যে, মস্তিষ্ক-উদ্ভূত অহংকার ও আত্মিক বিমর্ষতার এই জগতে—যেখানে বাঁশরী ও চিত্তহারী বস্তু ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল অন্য কিছুর অস্তিত্ব ছিল না—

১. তারীখে ফিরূযশাহী; যিয়াউদ্দীন বারনীকৃত ৩৪১-৪৬ পৃ.

সেখানে ঐশী আবেগ-উদ্দীপনার একটি মলয় সমীরণ প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং প্রেমের সওদার ব্যাপক লেনদেন ঘটে। প্রতিটি স্থানে প্রেমের আলোচনা, হাকীকত ও মারিফতের কথাবার্তা এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারাপূর্ণ ও প্রেম সম্বলিত কবিতাবলী গুঞ্জরিত হতে থাকে। সিয়ারুল আওলিয়া প্রণেতা আমীর খোরদ কি সুন্দর লিখেছেন:

"মুহব্বত ও 'ইশ্‌কের কারবারের যুগে একটি বাজার লেগেছে। সামা'র কাহিনী, ইখলাস ও আনুগত্য, প্রীতি ও নম্রতা, অন্তরের প্রশান্তি ও প্রেমিকের পায়ের উপর মাথা রেখে দেওয়া ব্যতিরেকে আর কোন কিছুতেই জনসাধারণের শান্তিলাভ ঘটত না।"[১]

খলীফাদের তরবিয়ত

ইরশাদ ও তরবিয়তের এই সিলসিলা এবং 'ইশ্‌ক ও মুহব্বতের এই তরীকা-পদ্ধতিকে হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্তর এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া এবং বহুদিন পর্যন্ত এই সিলসিলা ও পদ্ধতিকে কায়েম ও বহাল রাখবার জন্য তিনি উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ও যোগ্যতার অধিকারী আপাদমস্তক একনিষ্ঠ খলীফাদের গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। তাদের ভেতর সে সব গুণ ও পরিপূর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াস চালান, যে সব কামিল বুযুর্গদের জন্য অপরিহার্য। তাদের দিয়ে মুজাহাদা (আধ্যাত্মিক পথের কঠোর-কঠিন সাধনা) করান, তাদের কলব (আত্মা)-এর দেখাশোনা করেন, তাঁদের মধ্যে যিনি উচ্চতর যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং 'ইল্‌ম-এর অলংকার থেকেও ছিলেন মহরুম, তিনি তাঁদের পরিপূর্ণ 'ইল্‌ম হাসিলের বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের অন্তর থেকে এখন পর্যন্ত বাহাছ-বিতর্কের নেশা কাটে নি, তাঁদের তিনি শুধরে দেন। যাঁরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগতকে পথ-প্রদর্শন ও সামাজিক জীবনে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখেন কিন্তু তাদের নির্জনবাস, লোকালয় বর্জন, একক ও নিঃসঙ্গ 'ইবাদত বন্দেগী ও মুজাহাদায় আগ্রহ ছিল তাদেরকে তিনি সামাজিক জীবন এখতিয়ার করতে ও আল্লাহ্‌র মাখলুকের জুলুম-অত্যাচার বরদাশ্‌ত করতে বাধ্য করেন। সংস্কার ও তরবিয়তের যে দুনিয়াব্যাপী কর্মকাণ্ডের নীলনকশা তাঁর সামনে ছিল এবং আপন বিশিষ্ট সাথীদের থেকে দীনের দাওয়াত ও তবলীগের যে খেদমত নেবার ছিল সে পথের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব কিছুই তিনি বিদূরিত করেন।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ৫১০ পৃষ্ঠা।

সিয়ারুল আওলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন অযোধ্যার অধিবাসী, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দোস্ত ও খাদেমবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর নিকট থেকে পঠন-পাঠন ও বাহাছ্-বিতর্কের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা হবে। যদিও ঐ সব দোস্তের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী 'আলিম ছিলেন, এবং সুলতানুল মাশায়িখের সোহবত ও সাহচর্যের ফয়েয ও বরকতে আল্লাহ্‌র স্মরণে ছিলেন নিরন্তর মশগুল, তথাপি যে কর্মে তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন তার প্রতি তাঁরা স্বাভাবিকভাবে তখনও কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন। মাওলানা জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে সবাই তাঁর খেদমতে হাযির হলেন। হযরত সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর উপর যিকরে ইলাহীর কারণে এমনি এক নূরে তাজাল্লী ছিল যে, লোকেরা তাঁর সামনে কথা বলার সাহস পেত না। এ ব্যাপারে মাওলানা জালালুদ্দীনের সাহসের কিছুটা সুনাম ছিল। তিনি বললেন যে, যদি ইজাযত দেন তবে সাথী-দোস্তরা কোন সময় বাহাছ্-আলোচনা করতে পারে। সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ) বুঝতে পারলেন যে, এটা এখানে উপস্থিত সমস্ত 'উলামায়ে কিরামের সম্মিলিত ইচ্ছাও বটে এবং মাওলানা জালালুদ্দীন এদের সবার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি বললেন, আমি কি করব, ওদের দিয়ে অন্য কোন খেদমত নেওয়াই তো আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।[১]

মাওলানা সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন মাহমুদ যিনি পরে হযরত খাজা (রঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ও প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং চেরাগে দিল্লী নামেই যিনি সারা দুনিয়াব্যাপী খ্যাতিমান ছিলেন, অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন কোথাও কোন জঙ্গল অথবা পাহাড়ে গিয়ে যিকরে ইলাহীতে মগ্ন হতে। একদিন তিনি আমীর খসরুর মাধ্যমে বলে পাঠান যে, অধম অযোধ্যায় বসবাস করে। লোকজনের ভীড়ে আমার সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যদি ইজাযত দেন তবে আমি কোন বিয়াবান ময়দানে কিংবা কোন পাহাড়ে গিয়ে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলামুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করি। আমীর খসরু যখন এ পয়গাম পৌঁছালেন তিনি বললেন,—

"তাঁকে বলে দিও, তোমাকে জনসমাজে থাকতে হবে এবং মানুষের অমানবিক ও অমানুষসুলভ আচার-আচরণকে বরদাশ্‌ত করতে হবে, আর বদান্যতা ও ত্যাগের দ্বারাই এর উত্তর দিতে হবে।"[২]

১. সিয়ারুল আওলিয়া, পৃ. ৩০৬;
২. ঐ, ২৩৭ পৃষ্ঠা;

মাওলানা হুস্‌সামুদ্দীন মুলতানী খেলাফত প্রাপ্তির পর আরয করেছিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে শহর ছেড়ে দেই এবং কোন ঝর্ণাধারার ধারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করি। কেননা শহরে যে পানি মেলে তা কূয়ার আর সে পানিতে ওযু করলে অন্তরের প্রশান্তি লাভ ঘটে না।[১] এতে তিনি বললেন, না। তুমি শহরেই থাকবে, থাকবে সাধারণ একজন মানুষের মত। মন চাচ্ছে তোমাকে আরামের জায়গায় নিয়ে যেতে এবং এমন জায়গায় রাখতে যেখানে সামাজিকতার কোন বালাই নেই। যখনই তুমি শহরের বাইরে গিয়ে পড়বে এবং কোন ঝর্ণাধারার কিনারে বসবাস করতে শুরু করবে তখন বিদেশী ও শহুরে লোকজন খুঁজে তোমাকে বের করবে, চারদিকে মশহূর হয়ে পড়বে যে, অমুক জায়গায় অমুক দরবেশ অবস্থান করছেন। ফলে জনসাধারণ তোমার সময় নষ্ট করবে। তাছাড়া কূয়ার পানির ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শরীয়তের দৃষ্টি এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদার।

চিশতী খানকাহ্‌

আল্লাহ তা'আলা হযরত খাজা (রঃ)-কে অত্যন্ত মর্যাদাবান খলীফা (প্রতিনিধি) দান করেছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকজন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন:—

(১) মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া (২) শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদ (৩) শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ার হাঁসভী (৪) শায়খ হুসসামুদ্দীন মুলতানী (৫) মাওলানা ফখরুদ্দীন যব্‌রাবী (৬) মাওলানা 'আলাউদ্দীন নীলী (৭) মাওলানা বুরহানুদ্দীন গরীব (৮) মাওলানা ইউসুফ চুন্দিরী (৯) মাওলানা সিরাজুদ্দীন আখী সিরাজ (১০) মাওলানা শিহাবুদ্দীন।

বিশিষ্ট মুরীদবর্গ

(১) খাজা আবুবকর (২) মাওলানা মুহীউদ্দীন কাশানী (৩) মাওলানা ওয়াজীহুদ্দীন পায়েলী (৪) মাওলানা ফখরুদ্দীন মরোযী (৫) মাওলানা ফসীহু-দ্দীন (৬) আমীর খসরু (৭) মাওলানা জালালুদ্দীন (৮) খাজা করীমুদ্দীন সমরকন্দী (৯) আমীর হাসান 'আলা সজযী (১০) কাযী শরফুদ্দীন (১১) মাওলানা বাহাউদ্দীন আদহামী (১২) শায়খ মুবারক গোপামভী (১৩) খাজা মুওয়াইদুদ্দীন কারভী (১৪) খাজা তাজুদ্দীন দাওরী (১৫) খাজা যিয়াউদ্দীন বার্নী (১৬)

১. পানি ভর্তিকারীদের অসতর্কতার দরুন এবং কোন কিছু এতে পতিত হবার আশংকায়।

খাজা মুওয়াইয়িদুদ্দীন আনসারী (১৭) খাজা শামসুদ্দীন খাওয়াহিরযাদা (১৮) মাওলানা নিজামুদ্দীন শিরাজী (১৯) খাজা সালার (২০) মাওলানা ফখরুদ্দীন মিরাবী।

এদের মধ্যে হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-কে তিনি খাস খেলাফতনামা প্রদান করেন এবং নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান। তিনি (হযরত নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী) ছিলেন তাঁর শায়খ (রঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণকারী। তিনি অত্যন্ত নাযুক ও সঙ্গীন অবস্থাতে এবং কঠিন রাজনৈতিক সংকটেও জনগণের হেদায়াতের বাসনায় ইরশাদ ও হেদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল রেখেছিলেন।

ফিরূয তুগলকের সিংহাসনারোহণ এবং এথেকে ভারতবর্ষের যে ফয়েয ও বরকত পেঁৗছেছিল তার ভেতর হযরত সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন (রঃ)-এরই হাত ছিল।[১] পুরো বত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি চিশতীয়া সিলসিলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা রাজধানী দিল্লীতে বসে অত্যন্ত সাফল্য ও কামিয়াবীর সাথে পরিচালনা করেন। অতঃপর আলোর এই প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত হ'ল যিনি দক্ষিণ ভারতেই শুধু নয় বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে 'ইশক ও মুহব্বতের উত্তাপ দিয়ে উত্তপ্ত এবং তাঁর খোশবু দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করে তুলেছিলেন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূদরায—যিনি গুলবার্গে[২] সমাহিত (ওফাত ৮২৫ হিজরী) আছেন।

হযরত সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর অপর খলীফা 'আল্লামা কামালুদ্দীন (ওফাত ৭৫৬ হিজরী) যাঁর বংশধর ও খলীফাবৃন্দ এই সিলসিলাকে এই শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত জোরেশোরে কায়েম রাখেন। এই সিলসিলায় হযরত ইয়াহইয়া মাদানী, শাহ কলীমুল্লাহ্ জাহানাবাদী, মাওলানা শাহ ফখরুদ্দীন দেহলভী, খাজা নূর মুহাম্মাদ মাহারভী, শাহ নিয়ায আহমাদ বেরেলভী এবং খাজা সুলায়মান তৌনসভীর ন্যায় মহান বুযুর্গ রয়েছেন যাঁরা 'ইশকে ইলাহী তথা ঐশী প্রেমের বাজার রেখেছিলেন গরম ও উত্তপ্ত এবং যাঁরা আল্লাহ্র লাখ লাখ বান্দার অন্তর-মানসকে আল্লাহ্র মুহব্বত ও কামনায় ভরপুর করে দিয়েছিলেন।[৩]

---

১. দেখুন তারীখে ফিরূযশাহী, সিরাজ 'আফীফ কৃত

২. হযরত খাজা সায়্যিদ মুহাম্মাদ গেসূদরাযের জীবন বৃত্তান্ত ও কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে হলে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন প্রয়োজন।

৩. এসব বুযুর্গের বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত জানতে হলে দেখুন, "তারীখে মাশায়িখে চিশত" অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামীকৃত।

হযরত চেরাগে দিল্লীর খলীফাদের মধ্যে শায়খ আবদুল মুকতাদির কুন্দী, শায়খ আহমদ থানেশ্বরী এবং শায়খ জালালুদ্দীন হুসায়ন বুখারী—যিনি মখদূম জাহানিয়া জাহাঁগশত নামে পরিচিত, বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের বুযুর্গ এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের লক্ষ্যস্থল ছিলেন।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় খানকাহ্‌র পর দা'ওয়াত ও হেদায়াতের মসনদে ধারাবাহিকভাবে পর পর হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) ও হযরত সায়্যিদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর ন্যায় মহান দুই বুযুর্গ সমাসীন ছিলেন—ভারতবর্ষের পাণ্ডুয়া, লখনৌতি, দৌলতাবাদ, গুলবর্গা, বুরহানপুর, যয়েনাবাদ, মাণ্ডো, আহমাদাবাদ, সফীপুর, মানিকপুর, সলোন নামক বিভিন্ন জায়গায় চিশতীয়া খানকাহ কায়েম হয় যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত করার ন্যায় দাওয়াত ও তবলীগের সিলসিলা কায়েম রাখেন এবং 'ইশক ও মুহব্বত, সততা ও ইখলাস, উচচ মনোবল ও অটুট সংকল্প, খেদমতে খালক তথা সৃষ্টির সেবা, কুরবানী ও আত্মত্যাগ, বদান্যতা ও দানশীলতা, দারিদ্র ও যুহদ, 'ইলম ও মা'রিফতের প্রদীপ আলোকিত রাখেন। এ সবের মধ্যে প্রতিটি খানকাহ এবং তার ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক কার্যাবলীর জন্য একটি বিরাট পুস্তকের দরকার বিশেষ করে বাংলাদেশে শায়খ 'আলাউল হক পাণ্ডবী[১], হযরত নূর কুত্‌বুল 'আলম পাণ্ডবী[১], দাক্ষিণাত্যে শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব—তাঁর খলীফাদের মধ্যে শায়খ যয়নুদ্দীন, শায়খ ইয়াকুব, শায়খ কামালুদ্দীন নাগোরী

১. শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলাউল হক পাণ্ডবীর আসল নাম ওমর। পিতা আস'আদ লাহোরী বাংলার উযীর পদে সমাসীন ছিলেন। শায়খ 'আলাউল হক হযরত মাহবুবে ইলাহীর মশহূর খলীফা মাওলানা সিরাজুদ্দীন 'উছমানী আউদী- যিনি আখী সিরাজ নামে পরিচিত—(ওফাত ৭৫৮ হিজরী)-এর খলীফা এবং পাণ্ডুয়ার মশহূর 'আলিম ও চিশতী খানকাহর প্রতিষ্ঠাতা। সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (ওফাত ৮০৮ হিজরী) তাঁরই খলীফা। ৮০০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২. নাম নূরুদ্দীন, উপাধি নূরুল হক ও কুতবে 'আলম; পিতা শায়খ 'আলাউল হক পাণ্ডবীর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। তাঁর যুগে পাণ্ডুয়ার খানকাহ ছিল তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিশতী খানকাহ। মুজাহাদা, খেদমতে খালক, বস্তুগত স্বার্থের প্রতি নিস্পৃহতা ও আত্মোৎসর্গ এবং 'ইলমে হাকীকতে অত্যন্ত উচচ মরতবার অধিকারী ছিলেন। খলীফার ভেতর হযরত শায়খ হুসসামুদ্দীন হুসসামুল হক মানিকপুরী (ওফাত ৮৫৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যাঁদের পবিত্র সত্তার প্রভাবে বিহার ও অযোধ্যায় চিশতীয়া নিজামিয়া সিলসিলার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। ৮১৮ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। কিতাবাদির মধ্যে "মুনিসুল ফুকারা', 'আনিসুল গুরাবা', 'মাকাতীব কা মাজমু'আ' স্মরণীয়। মালফুজাত ও মাকতুবাতে গজবের সরলতা ও প্রভাব বিদ্যমান। নুযহাতুল খাওয়াতির, ৩য় জিলদ দ্রষ্টব্য।

ফিতানী, অতঃপর তাঁর খলীফা কুত্বে 'আলম 'আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ বিন আল-হুসায়ন (ওফাত ৮৫৭ হিজরী) এবং তাঁর ফরযন্দ ও খলীফা শাহ 'আলম গুজরাটি দারিদ্রের চাটাই-এর আসনে বসে নিজ নিজ যুগে রাজত্ব করেছেন।

মালোয়ায় শায়খ ওয়াহীদুদ্দীন ইউসুফ, শায়খ কামালুদ্দীন, মাওলানা মুগীছুদ্দীন প্রমুখ, অযোধ্যায় হযরত শায়খ মুহাম্মাদ মীনা লাখনবী, শায়খ সা'দুদ্দীন কুদওয়াই খায়রাবাদী, শায়খ 'আবদুস সামাদ ওরফে সফীউদ্দীন সফীপুরী, শায়খ হুসামুল হক মানিকপুরী, শায়খ 'আবদুল করীম মানিকপুরী এবং শাহ পীর মুহাম্মাদ সলোনী ও শাহ পীর মুহাম্মাদ লাখনবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই নিজামিয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গ যাঁরা স্ব-স্ব স্থানে হেদায়াত ও তবলীগ এবং তা'লীম ও তরবিয়তের সিলসিলা অত্যন্ত জোরেশোরেই অব্যাহত রেখেছিলেন। এঁদের থেকে ফয়েয প্রাপ্তদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কেউ বলতে পারবে না।

এসব খালেস চিশতী খানকাহ ব্যতিরেকেও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে এমন সব নামকরা খানকাহ্ও কায়েম ছিল যার মহান বুযুর্গ ও সিলসিলার প্রতিষ্ঠা-তাদের সিলসিলায়ে নিজামিয়ার চিশতী বুযুর্গদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং যাঁরা চিশতীয়া তরীকার ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ও সম্পৃক্ততার অধিকারী ছিলেন। এর ভেতর জৌনপুরের খানকায়ে রশীদী এবং ফুলওয়ারী শরীফের খানকায়ে মুজীবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খানকায়ে রশীদীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত 'আল্লামা মুহাম্মাদ রশীদ জৌনপুরী (ওফাত ১০৮৩ হিজরী)-এর শায়খ তৈয়ব বেনারসী এবং সায়্যিদ আহমাদুল হালীম হুসায়নী মানিকপুরী থেকে চিশতীয়া নিজামিয়া সিলসিলার ইজাযত হাসিল করেছিলেন। খানকায়ে মুজীবীর প্রতিষ্ঠাতা তাজুল 'আরিফীন হযরত শাহ মুহাম্মাদ মুজীবুল্লাহ কাদিরী ফুলওয়ারীর (ওফাত ১১৯১ হিজরী) সিলসিলায়ে চিশতীয়া নিজামিয়া, স্বীয় পীর হযরত খাজা 'ইমাদুদ্দীন কলন্দর এবং হযরত শাহ মু'ঈনুদ্দীন কারজুবীর মাধ্যমে পৌঁছেছিল। শাহ মু'ঈনুদ্দীন কারজুবী হযরত শায়খ পীর মুহাম্মাদ সলোনীর খলীফা ছিলেন।

পরিশেষে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রঃ)-এর পবিত্র সত্তা নিজামিয়া ও সাবিরিয়া সিলসিলার এবং তার বৈশিষ্ট্য ও বরকতের সমষ্টি ছিল। হযরত হাজী সাহেব নিজামিয়া সিলসিলার নিসবত হযরত শায়খ 'আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন, যিনি অযোধ্যার হযরত দরবেশ বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম থেকে নিজামিয়া সিলসিলার ইজাযত লাভ করেছিলেন। হযরত দরবেশ তিন তরীকা (সূত্র) থেকে নিজামিয়া সিলসিলা পেয়েছিলেন।[১]

১. দেখুন "তাযকিরাতুর রাশীদ" ৩য় খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

হযরত খাজা (রঃ)-এর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাব এবং তাঁর খলীফাদের ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক খেদমত

হযরত সুলতানুল মাশায়িখ স্বীয় খলীফা ও মুরীদদের অত্যন্ত যত্ন-তদবীর ও অভিনিবেশ সহকারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারের আমীর-ওমারা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে খাজা মুওয়াইয়িদুদ্দীন ছিলেন একজন উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি। হযরত খাজা (রঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ সম্পর্ক দিনে দিনে এত বেড়ে যায় যে, তাঁর মন-মিযাজ রাজদরবারের প্রতি বিরূপ ও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠে এবং হযরত খাজা (রঃ)-এর খেদমতেই এসে অবস্থান করতে শুরু করেন। সুলতান তাঁর যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতায় ছিলেন মুগ্ধ এবং তিনি তাঁর প্রয়োজন অহরহ অনুভব করতেন। একদা সুলতান তাঁর জনৈক পাহারাদারের মাধ্যমে হযরত খাজা (রঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন এবং বলেন যে, হযরত সবাইকেই তাঁর নিজের মত বানাতে চান। হযরত খাজা (রঃ)-এর জবাবে বলেছিলেন,—নিজের মত কী, আমার চেয়েও উত্তমই বানাতে চাই।

হযরত খাজা (রঃ)-এর সোহবত (সাহচর্য ও সংসর্গ) ও তরবিয়ত দ্বারা শুধুমাত্র ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াজত-মুজাহাদার গভীর আগ্রহ এবং নিজের সংস্কার-শুদ্ধি ও উন্নতির চিন্তাই সৃষ্টি হ'ত না, দাওয়াত ও তবলীগের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা, "আমরু বিল মা'রুফ ওয়াননাহী আনিল মুনকার" তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে হিম্মত ও উচ্চ মনোবল, তৎকালীন যুগের সুলতানদের সামনে কালেমায়ে হক তথা হক-কথা বলার সাহসিকতা এবং নির্ভীকতাও সৃষ্টি হ'ত। এটা ছিল আল্লাহ্‌র নাম এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাহচর্যের অনিবার্য সুফল। যে অন্তরে একবার আল্লাহ্‌র ভয় অনুপ্রবিষ্ট হবে তার অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ্‌র ভয় স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নেবে এবং যে অন্তর দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন—তার উপর কারও ভীতি যেমন কার্যকর হয় না, তেমনি তারও কাউকে ভয় পাবার কোন কারণ থাকে না। যার সামনে স্রষ্টার মহান মর্যাদা এবং সৃষ্ট জগতের যথার্থ অবস্থান ও স্থান প্রকাশিত হয়ে

গেছে সে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌দের শান-শওকত এবং তাঁদের দরবারের জাঁকজমক, তাঁদের গুলাম-নফর ও রাজকর্মচারীদের কাতারবন্দী, সম্মুখ দৃষ্টি ও হাঁক-ডাককে বাচচাদের খেলাধুলা ও ভাঙাগড়ার মিছামিছি কৌতুকের বেশী এতটুকু গুরুত্ব দেয় না এবং জাঁকজমকপূর্ণ কোন প্রদর্শনীর স্থলে সত্য কথনে ও হক-কথা উচচারণে তাদেরকে কখনও বিরত রাখতে পারে না। এটাই তাওহীদবাদিতা ও নির্জনতার স্বাভাবিক পরিণতি, প্রকৃত তাসাওউফের বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ্‌র বান্দা ও কামিল দরবেশের রীতি।

হযরত খাজা (রঃ)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খাদেম ও মুরীদবৃন্দ ঐশী-প্রেম, সত্য কথন ও নির্ভীকতার এমন নমুনা পেশ করে গেছেন যার নজীর মেলা খুবই কঠিন।

তৎকালীন সুলতানদের সঙ্গে নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার নমুনা

সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের শান-শওকত ও জাঁকজমক সম্পর্কে ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই অবহিত। সুলতানকে একবার হাঁসির নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। সেখান থেকে চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত বংশী নামক স্থানে শাহী তাঁবু স্থাপিত হয়। সুলতান মুখলেসুল মুল্‌ক নিজামুদ্দীন মুজিরবারীকে, জুলুম-যবরদস্তি, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য যে ছিল বিখ্যাত—সে সময় হাঁসীর কেল্লা পরিদর্শনের জন্য পাঠান। সে যখন হযরত শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ার (হযরত শায়খ জামালুদ্দীন হাঁসোভীর পৌত্র এবং হযরত সুলতানুল মাশায়িখের খলীফা)-এর বাড়ীর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন জিজ্ঞাসা করে যে, এ বাড়ী কার? লোকজন বলল, এটা শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ারের বাড়ী, যিনি সুলতানুল মাশায়িখের খলীফা। এতে সে বলল, অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, বাদশাহ এতদঞ্চলে পদার্পণ করেছেন অথচ শায়খজী তাঁকে সালাম করবার জন্য একবারও হাযির হলেন না। মুখলেসুল মুল্‌ক বাদশাহ্‌র নিকট ফিরে গিয়ে সব কিছু বিবৃত করল এবং এও বলল যে, হাঁসিতে সুলতানুল মাশায়িখের একজন খলীফা আছেন যিনি জাহাঁপনাকে সালাম দিতে হাযির হন নাই। বাদশাহ একথা শুনে রেগে যান এবং তক্ষুণি হাসান সার বুরহানাকে—যে ছিল একজন অহংকারী ও জাঁকজমক-প্রিয় লোক---শায়খ কুত্‌বুদ্দীনকে আনবার জন্য পাঠান। হাসান সার বুরহানা বাড়ীর নিকটে গিয়ে একাকী পায়ে হেঁটে শায়খজীর দহলিজে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে উপবেশন করেন। শায়খজী তাঁকে ডেকে পাঠান। হাসান সার বুরহানা গিয়ে আরয করলেন যে, বাদশাহ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, এতে কি আমার কোন এখতিয়ার আছে? হাসান বললেন, আমার উপর বাদশাহী হুকুম,

যে-কোনভাবেই হোক না কেন, আমি যেন আপনাকে নিয়ে যাই। শায়খ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিজ এখতিয়ারে যাচ্ছি না। অতঃপর গৃহবাসীদের উদ্দেশ করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করলাম," এই বলেই মুসাল্লা কাঁধের উপর ফেলে এবং লাঠি হাতে পদব্রজেই রওয়ানা হয়ে পড়েন। হাসান সার বুরহানা সওয়ারির কথা বলতেই তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, আমার শক্তি আছে, আমি পায়ে হেঁটে যেতে পারি। বংশী পৌঁছুতে সুলতান খবর পেলেন এবং শায়খকে দিল্লী যাবার নির্দেশ দিলেন। দিল্লী পৌঁছে শাহী দরবারে ডেকে পাঠালেন। শায়খ তৎকালীন নায়েবে বারবাক ফিরূয শাহকে বললেন যে, আমরা ফকীর মানুষ, শাহী দরবারের আদব-কায়দা সম্পর্কে কিছু জানি না। আপনি যেভাবে পরামর্শ দেবেন সেভাবেই তা পালিত হবে। ফিরূয শাহ ছিলেন বিশুদ্ধ 'আকীদার অধিকারী ও ফকীর-প্রিয় মানুষ। তিনি বললেন যে, লোকে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই বাদশাহ্‌র কানে লাগিয়েছে। আপনি যদি কিছু বিনয় ও তা'জীমের সাথে কাজ করেন তবে উত্তম হবে। তিনি শাহী মহলের দহলিজে পা রাখতেই রাজ্যের আমীর-উমারা, ঘোষক (নকীব) সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। সাহেবযাদা নূরুদ্দীন হাঁসি থেকে একই সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল কম এবং তিনি ইতোপূর্বে রাজা-বাদশাহদের দরবার দেখেন নি বিধায় ভীত হয়ে পড়েন। শায়খ কুতুবুদ্দীন মুনাওয়ার তাকে ডেকে বললেন, বাবা নূরুদ্দীন! العظمة والكبرياء لله "শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ্‌র জন্য।" সাহেবযাদা নূরুদ্দীন বলেন যে, একথা শুনতেই আমার ভেতরে একটি শক্তির সঞ্চার হ'ল, সমস্ত ভয়-ভীতি দূর হতে লাগল। রাজ্যের যে সমস্ত আমীর-উমারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা আমার নিকট একদম বকরীবৎ মনে হতে লাগল। সুলতান যখন জানতে পারলেন যে, শায়খজী আসছেন তখনই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তীর-ধনুক হাতে নিয়ে তীরন্দাযীতে মশগুল হয়ে পড়লেন। শায়খ নিকটে আসতেই স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ তাঁকে তা'জীম ও মুসাফাহা করলেন। শায়খ অত্যন্ত শক্তভাবে বাদশাহ্‌র হাত আঁকড়ে ধরেন। বাদশাহ বলেন যে, আমি আপনার এলাকায় গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে অভ্যর্থনাও জানান নি, এমনকি আমার সাথে সাক্ষাতও করেন নি। শায়খজী বললেন যে, এ দরবেশ নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করে না যে, বাদশাহ্‌র সঙ্গে মুলাকাত করবে। এক কোণে পড়ে বাদশাহ ও মুসলিম জনসাধারণের জন্য দু'আ-খায়েরে মশগুল আছি। অক্ষম মনে করে রেহাই দিলে খুশী হই। বাদশাহ এতে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং আপন ভ্রাতা ফিরূয শাহকে বলেন, শায়খজীর

যেমনটি মর্জি তেমনটিই কর। শায়খ মুনাওয়ার বললেন, বাপ-দাদার ভিটে-মাটিতে গিয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে পারাটাই আমার মত ফকীরের লক্ষ্য—উদ্দেশ্য। ফিরূয শাহ এ আকাংক্ষা তৎক্ষণাৎ পূরণ করলেন। শায়খজীর প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ একজন আমীরকে বললেন যে, যে সমস্ত বুযুর্গের সঙ্গে মুসাফাহা করার সুযোগ আমার হয়েছে তাদের মধ্যে যারাই আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাদের হাতে আমি কাঁপুনি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু শায়খ মুনাওয়ার এতখানি শক্তভাবে মুসাফাহা করেন যে, তার উপর আমার কোন প্রভাব পড়েছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বাদশাহ ফিরূয শাহ এবং মাওলানা যিয়াউদ্দীন বার্নীকে তৎকালীন এক লাখ তংকা[১] সমেত শেখ মুনাওয়ারের খেদমতে পাঠান। (তংকা দর্শনে) শায়খ বলেন, এই দরবেশ এক লাখ তংকা গ্রহণ থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। প্রেরিত শাহী প্রতিনিধিদ্বয় ফিরে এসে সুলতানকে সব কিছু অবহিত করেন। সুলতান বললেন, এক লাখ যদি কবুল না করেন তবে পঞ্চাশ হাযারই তাঁর খেদমতে পেশ কর। কিন্তু শায়খ তাও কবুল করলেন না। সুলতান এতে বললেন, যদি শায়খ এটাও কবুল না করেন তবে লোকে আমাকে কি বলবে। শেষ পর্যন্ত তংকার অংক দু'হাযারে এসে দাঁড়ায়। ফিরূয শাহ ও মাওলানা যিয়াউদ্দীন শেষাবধি আরয করলেন যে, এর কম অংকের কথা আমরা বাদশাহ্‌র সামনে কিছুতেই আলোচনা করতে পারি না। শায়খ বললেন, সুবহানাল্লাহ, দরবেশের তো দু'সের চাউল-ডাল এবং এক রত্তি ঘি-ই যথেষ্ট। সে এই হাযার হাযার টাকা দিয়ে কি করবে। অবশেষে অনেক চেষ্টা তদবীর ও তালবাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই কথা বলে যে, শাহী উপহার গ্রহণে একেবারে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে বাদশাহ নিজেকে অসন্তুষ্ট ও অপমানিত বোধ করবেন, তাঁকে মাত্র দু'হাযার তংকা গ্রহণ করতে রাযী করানো হয় এবং তিনি সে তংকা আধ্যাত্মিক পথের সাধকবৃন্দ ও অভাবী লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে হাঁসি ফিরে যান।[২]

যে সময় সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক দিল্লীর অধিবাসীদেরকে দেবগীরে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন তখন তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন যে, তিনি তুর্কিস্থান ও খুরাসানকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করবেন এবং চেঙ্গীয খানের বংশধরদের ভিত্তি

---

১. তংকা বা তঙ্গা ছিল সে যুগের ভারতবর্ষীয় মুদ্রা। এতে এক তোলা রৌপ্য থাকত, তুর্কী শব্দ যার অর্থ সাদা-শুভ্র অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রা।

২. সিয়ারুল আওলিয়া, ২৫৩-৩৫৫ পৃষ্ঠা,

উপড়ে দেবেন। সে সময়েই হুকুম হয় যে, দিল্লী ও তৎসন্নিহিত এলাকার জনসাধারণ, শ্রেণী-নির্বিশেষে যেন হাযির হয়, বড় বড় তাঁবু সংস্থাপিত হয়, ঐ সমস্ত তাঁবুতে মিম্বর স্থাপন করা হয় এবং উক্ত মিম্বরে উঠে শ্রদ্ধেয় 'উলামাবৃন্দ যেন ভাষণ দেন ও জিহাদের উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ দিন হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর খাস খলীফা মাওলানা ফখরুদ্দীন যাররাভী, মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া এবং শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমূদকে ডেকে পাঠানো হয়। শায়খ কুতুবুদ্দীন দবীর ছিলেন হযরত সুলতানুল মাশায়িখের একজন দৃঢ় বিশ্বাসী ভক্ত মুরীদ এবং মাওলানা ফখরুদ্দীন যাররাবীর শাগরিদ। মাওলানা ফখরুদ্দীনকে সর্বাগ্রে শাহী দরবারে আনা হয়। সুলতানের সঙ্গে মুলাকাতে মাওলানা অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কয়েক বারই তিনি বলেন যে, আমি আমার মাথাকে ঐ ব্যক্তির দরবারে কর্তিত ও পতিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আমি হক-কথা বলতে বিরত হব না যেমন, তেমনি এ লোকও আমাকে মা'ফ করবে না। মাওলানা যখন শাহী দরবারে প্রবেশ করেন তখন শায়খ কুতুবুদ্দীন দবীর মাওলানার জুতা উঠিয়ে নেন এবং খাদেমের ন্যায় বগলে চেপে দাঁড়িয়ে পড়েন। সুলতান এতে কিছু বলেন না এবং মাওলানা ফখরুদ্দীনের সঙ্গে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়েন। সুলতান বলেন, আমার ধারণা যে, আমি চেঙ্গীয খানের বংশধরদের সমূলে উৎপাটন করি। আপনারা কি আমাকে এ ব্যাপারে সহ-যোগিতা দেবেন? মাওলানা জবাবে 'ইনশাল্লাহ' বললেন অর্থাৎ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবেই সহযোগিতা করতে পারি। সুলতান বললেন, এটা তো সন্দেহমূলক কথা। মাওলানা বললেন, ভবিষ্যত সংক্রান্ত ব্যাপারে এমনটিই বলা হয়ে থাকে। সুলতান এ কথা শুনে হোচট খেলেন এবং বললেন, আমাকে কিছু নসীহত করুন। মাওলানা বললেন, ক্রোধ দমন করুন। সুলতান বললেন, কোন ধরনের ক্রোধ? মাওলানা বললেন, হিংস্র প্রাণীর ক্রোধ। এবার সুলতান এতখানি ক্রোধান্বিত হন যে, তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু এর বাহ্যিক প্রকাশ থেকে তিনি বিরত থাকেন। এরপর সুলতান খাবার নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেন। খাবার আনা হল। সুলতান এবং মাওলানা দু'জনেই একই পাত্রে খাচ্ছিলেন। মাওলানা এত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন যেন মনে হচ্ছিল যে, তিনি সুলতানের সঙ্গে একই পাত্রে খাবার গ্রহণ পসন্দ করছেন না। সুলতান অধিকতর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের নিমিত্তে হাড়ি থেকে গোশত আলাদা করে করে মাওলানার সামনে রাখছিলেন আর মাওলানা অত্যন্ত বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার সঙ্গে অল্প-স্বল্প খাচ্ছিলেন। অতঃপর দস্তরখানা

বিস্তৃত করা হয় এবং সুলতান মাওলানাকে বিদায় দেন। বিদায় মুহূর্তে একটি পশমী পোশাক এবং টাকার একটি থলে পেশ করেন,—কিন্তু মাওলানার হাতে এ সব খেলাত ও টাকার থলি আসবার আগেই শায়খ কুত্‌বুদ্দীন দবীর (রঃ)[১] হাত বাড়িয়ে সেটাকে নিয়ে নেন। মাওলানা বিদায় হবার পর সুলতান শায়খ কুত্‌বুদ্দীন দবীরকে বলেন, ওহে ধোকাবাজ! তুমি এসব কি করলে? প্রথমে ফখরুদ্দীনের জুতা নিজের বগলে নিলে, অতঃপর তাঁর খেলাত ও টাকার থলিও নিজে সামলে নিলে এবং তাকে আমার তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে, আর সে বিপদ নিজের মাথায় বরণ করে নিলে! শায়খ কুত্‌বুদ্দীন দবীর বললেন যে, মাওলানা ফখরুদ্দীন আমার উস্তাদ এবং আমার মুরশিদের খলীফাও বটেন। আমার জন্য এটাই সমীচীন ছিল যে, তাঁর জুতা শ্রদ্ধাভরে আমি মাথায় তুলে নিতাম—বগলে নেয়া তো অত্যন্ত ছোট ব্যাপার। আর এসব খেলাত ও টাকার থলে এমন কিইবা গুরুত্ব রাখে! সুলতান বললেন, এসব কুফরী 'আকীদা ছেড়ে দাও, অন্যথায় আমি তোমাকে কতল করব। শেষে যখনই মাওলানা ফখরুদ্দীন যাররাবী (রঃ)-এর আলোচনা সুলতানের দরবারে উঠত তখনই সুলতান হাত কচলিয়ে বলতেন, আফসোস! ফখরুদ্দীন আমার রক্ত-লোলুপ তলোয়ারের হাত থেকে বেঁচে গেল।[১]

ইসলামী সালতানাতের পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধান

চিশতীয়া তরীকার মহান বুযুর্গগণ যদিও যুগের সুলতান-বাদশাহ্‌দের সংস্রব বর্জন এবং শাহী দরবার থেকে দূরত্বে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এটাকেই নিজের ও নিজেদের গোটা সিলসিলার চিরন্তন উসূল তথা মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু যুগের সুলতান ও বাদশাহ্‌দের সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনে তাঁরা আদৌ গাফেল ছিলেন না এবং যখনই কোন সঠিক পরামর্শ অথবা কোন নির্বাচন, মনোনয়ন কিংবা নিজের রূহানী প্রভাব ব্যবহার করবার মওকা মিলত তখনই তাঁরা এই সুবর্ণ সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের কয়েকজন শাসক এবং প্রদেশ ও স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলির কয়েকজন প্রশাসক এসব চিশতীয়া সিলসিলার বুযুর্গগণের সঙ্গে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক রাখতেন। এই সম্পর্ক থেকে অনেক অনাসৃষ্টি ও ফেতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং অনেক নিষিদ্ধ ও অনাচারমূলক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন এবং বহু আহকামে শরীয়তের প্রচলন ঘটে।

---

১. সিয়ারুল আওলিয়া, ২৭ ও ২৭৩ পৃষ্ঠা।

৯—

ভারতবর্ষের সুলতানদের মধ্যে সুলতান ফিরূয তুগলক স্বীয় উত্তম চরিত্র, প্রজাবাৎসল্য, দয়া প্রদর্শন, শান্তিপ্রিয়তা, জনকল্যাণ, জুলুম-অত্যাচারের মূলোৎপাটন, ইসলাম প্রচারের আগ্রহ, মাদরাসা কায়েম ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার ছিলেন সম্ভবত অপর কোন শাসকই তেমনটি ছিলেন না। 'সিরাজে আফীফ' এবং 'তারীখে ফিরূযশাহী'তে এই বাদশাহ্‌র গঠনমূলক কার্যাবলী এবং সে যুগের কল্যাণ ও বরকত, শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

তারীখে ফিরিশতার লেখক লিখেছেন:

"তিনি একজন মহান ন্যায়বিচারক, ভদ্র ও দয়ালু, পরোপকারী ও ধৈর্যশীল বাদশাহ ছিলেন। প্রজাবৃন্দ ও সৈন্যবাহিনী সবাই তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল। তাঁর শাসনামলে কেউ জুলুম করতে সাহস পেত না।"[১]

লেখক তাঁর শাসননীতির তিনটি বড় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন:

(১) তিনি কোন মুসলমান কিংবা কোন যিম্মীকে বন্দী অথবা শাস্তি দেন নি। পুরস্কার ও বিভিন্ন প্রকার উপহার-উপঢৌকন প্রদান এবং এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে তিনি জনগণের আত্মিক প্রশান্তি প্রদান করায় কাউকে বন্দী করা কিংবা শাস্তি দেবার দরকার হয় নি।

(২) খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি যা কিছুই প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করা হ'ত তা তাদের সাধ্য অনুযায়ী আদায় করা হ'ত। অতীত সুলতানগণ যে সব অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করার নিয়ম চালু করেছিলেন সে সব তিনি মওকুফ করে দেন। প্রজাদের সম্পর্কে অশান্তি উৎপাদনকারী এবং ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন অভিযোগই তিনি কানে তোলেন নি, বরং তাঁর বদৌলতে দেশের জনগণ ও প্রজাবৃন্দ অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে ও খোশহালে ছিলেন।[২]

(৩) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদে এবং বিভিন্ন প্রদেশগুলির শাসন কর্তৃত্বে তিনি দীনদার ও আল্লাহ-ভীরু লোকদের নিযুক্ত করেন। যারা ছিল অশান্তি উৎপাদনকারী ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং অসৎ প্রকৃতির, সুলতান তাদের কোন পদই দেননি। কেননা তিনি জানতেন الناس على دين ملوكهم অর্থাৎ জনগণ তাদের রাজা-বাদশাহদের অনুসৃত নীতি-নিয়মেরই অনুসারী হয়ে থাকে।[৩]

---

১. তারীখে ফিরিশতা (১ম খণ্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা);

২. শাস্তি দানের সে সব নতুন নতুন তরীকা যা পূর্বতন সুলতানগণ আবিষ্কার করেছিলেন।

৩. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড ২৭১ পৃষ্ঠা:

কিন্তু অনেক লোকই জানেন না যে, ফিরূয শাহ তুগলকের সিংহাসনারোহণ ও তাঁর মনোনয়নের পেছনে হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর বিশেষ হাত এবং তাঁর কামিয়াবী ও সৌভাগ্যের মূলে তাঁর দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ্র ভূমিকা ছিল অনেক বেশী। সিরাজে 'আফীফ-এ বর্ণিত আছে

"সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক ঠাঠ মালিক তুগার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন, তখন তিনি হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীনকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সুলতানের ইন্তিকাল হ'লে এবং সুলতান ফিরূযশাহ শাহী তখতে উপবেশন করলে হযরত শায়খ নাসীরুদ্দীন ফিরূযশাহকে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন যে, তুমি আল্লাহর সৃষ্ট জগতের সঙ্গে ইনসাফ ও সুবিচার করবে, নাকি আমি এসব গরীব ও অসহায় মানুষের জন্য আল্লাহ্র নিকট অপর কোন শাসনকর্তা চাইব। সুলতান ফিরূয জবাব দিয়েছিলেন যে,

با بندگان خدائے تعالی حلم ورز • و اتفاق کنم

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র বান্দাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার, ধৈর্যশীলতা ও ঐক্যের জন্য কাজ করব। হযরত শায়খ এ উত্তর শোনার পর বলে পাঠিয়েছিলেন যে, যদি তুমি আল্লাহ্র মাখলুকের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর তবে আমি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে তোমার জন্য চল্লিশ বছর চেয়ে নিয়েছি (অর্থাৎ তুমি চল্লিশ বছর রাজত্ব করতে পারবে)। আর প্রকৃত ঘটনাও এই যে, সুলতান ফিরূয শাহ চল্লিশ বছরই রাজত্ব করেছিলেন।"[১]

সুলতান মুহাম্মাদ শাহ বাহমনী (৭৫৯-৭৭৬)-কে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বুযুর্গই বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়'আতও করেছিলেন। কিন্তু হযরত শায়খ বুরহানুদ্দীন গরীব (রঃ)-এর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হযরত শায়খ যয়নুদ্দীন (ওফাত ৮০১ হিজরী) এই ভিত্তিতে বায়'আত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন যে, বাদশাহ মদ্যপান ও শরীয়ত-নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত। তিনি বলেছিলেন—

"আল্লাহর সৃষ্ট জগতের উপর হুকুমত করার যোগ্য ও অধিকারী একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামী বিধি-বিধান তথা এর নির্দশনাবলীর হেফাজত করার চেষ্টা করবেন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কোন অবস্থাতেই শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীর ধারে কাছেও যাবেন না।"

১. তারীখে ফিরূযশাহী, পৃঃ ২৮

৭৬৭ হিজরীতে সুলতান যখন দৌলতাবাদে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন তখন তিনি হযরত শায়খকে পয়গাম পাঠান যে, হয় আপনি আমার দরবারে হাযির হবেন অথবা নিজ হাতে আমার খেলাফতের বায়'আত লিখে পাঠিয়ে দিবেন। শায়খ এর জবাবে বলেন যে, একবার কোন এক উপলক্ষে একজন 'আলিম, একজন সায়্যিদ ও একজন হিজড়া (নপুংসক) কাফিরদের হাতে বন্দী হয়। অতঃপর তারা এদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এদের তিনজনকেই পূজার ঘরে নেওয়া হবে। যে মূর্তিকে সিজদা করবে তার জীবন বাঁচবে আর যে তা করতে অস্বীকার করবে তাকে হত্যা করা হবে। প্রথম 'আলিমকে নেওয়া হ'ল। তিনি কুরআনুল করীমের অব্যাহতির বিধানের[১] উপর আমল করেন এবং মূর্তির সামনে মাথা নুইয়ে নিজের জান বাঁচিয়ে নেন। সায়্যিদ সাহেব 'আলিমকে অনুসরণ করেন। এর পর যখন হিজড়ার পালা আসল—তখন সে বলল, আমার সারাটা জীবনই তো কেটে গেছে অশালীন কর্মের ভেতর দিয়ে। তাছাড়া আমি 'আলিমও নই—সায়্যিদও নই যে, এগুলির কোন একটি মর্যাদা ও ফযীলতের দোহাই দিয়ে এমন কাজ করতে পারি। সে নিহত হওয়া-টাকেই নিজের জন্য মঞ্জুর করে নিল এবং মূর্তিকে সিজদা করল না। আমার ইচ্ছাও উক্ত হিজড়ার কাহিনীরই অনুরূপ। আমি তোমাদের সব রকমের জুলুম বরদাশত করব, কিন্তু তোমাদের দরবারে হাযির হব না, আর তোমার হাতে বায়'আতও করব না। একথা জেনে বাদশাহ তো রেগে আগুন। তিনি তক্ষুণি তাঁকে শহর পরিত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। শায়খও নির্দ্বিধায় স্বীয় মুসাল্লা কাঁধে ফেলে সোজা শায়খ বুরহানুদ্দীন (র:)-এর কবরগাহে গিয়ে তাঁর কবরের শিয়রের দিকে নিজের লাঠি পুঁতে দিলেন এবং মুসাল্লা বিছিয়ে তার উপর বসে পড়লেন। বললেন যে, এখন কেউ যদি বাপের বেটা হও তবে আমাকে এ জায়গা থেকে উঠাও। বাদশাহ শায়খ-এর এ ধরনের শক্ত মনোভাব ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করে লজ্জিত হলেন এবং নিজ হাতে নিম্নোক্ত চরণ দু'টি কাগজে লিখে সদর শরীফের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন—من زاں ام تو توزاں باش

শায়খ বললেন যে, যদি সুলতান মুহাম্মাদ শাহ গাযী শরীয়তের রীতি-নীতির হেফাজত ও প্রচলনের প্রয়াস চালান এবং বিজিত এলাকা থেকে সকল পানশালা এক্ষুণি উঠিয়ে দেন, নিজের পিতার সুন্নতের উপর আমল করেন এবং লোকের

---

১. الا ان تتقوا منهم تقاة—তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের (কাফিরদের) নিকট থেকে কোন ভয় বা আশংকা কর তবে তোমরা তাদের সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে সাবধানে থাকবে। আল-ইমরান ৩য় রুকু ;

সামনে শরাব পান না করেন—কাযী, 'উলামা ও প্রধানদের নির্দেশ দেন যে, তারা 'আমরু বিল মা'রুফ ওয়া নাহী 'আনিল মুনকার' তথা 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ'-এর ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালাবে তা হলে ফকীর যয়নুদ্দীন থেকে সুলতানের বড় দোস্ত ও কল্যাণকামী অপর কেউ হবে না। অতঃপর নিম্নোক্ত কবিতাটি নিজের কলম দিয়ে নিজ হাতেই লিখে দেন।

تا من بزیم بجز نکوئی نه کنم
جز نیک دلی و نیکی خوئی نه کنم
آنها که بجائے ما بد بہا کردند -
تا دست رسد بجز نکوئی نه کنم -

অর্থাৎ "যতক্ষণ আমার ধড়ে প্রাণ আছে ততক্ষণ আমার দ্বারা ভাল, সহৃদয়, উত্তম ব্যবহার ও সদয় আচরণ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পাবে না। যে সমস্ত লোক আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছে, যখনই সুযোগ মিলবে আমি তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করব।"

সুলতান মুহাম্মাদ শাহ তাঁর নামের সঙ্গে 'গাযী' সম্বোধন দেখে অত্যন্ত খুশী হন এবং ফরমান জারি করেন যে, শাহী উপাধির সঙ্গে এটা যেন অতিরিক্ত যোগ করা হয়। হযরত শায়খ-এর সঙ্গে মুলাকাত হবার আগেই সুলতান মারহাটওয়াড়ার হুকুমত মসনদে 'আলী খান মুহাম্মাদের হাওয়ালা করেন এবং স্বয়ং গুলবার্গা পৌঁছেন। অতঃপর গোটা রাজ্য থেকে মদের দোকান উৎখাত করে শরীয়তের বিধি-বিধান প্রচলন ও প্রসারে সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন। দাক্ষিণাত্যের চোর-ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারীদের যাদের নাম দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল, চুরি-ডাকাতিই ছিল যাদের একমাত্র নেশা ও পেশা—তাদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করেন। ফলে ছ'সাত মাসের ভেতরেই গোটা দেশ এদের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে যায়। একটি বর্ণনা অনুসারে ছয় মাসের ভেতর চোর-ডাকাতদের বিশ হাযার মাথা কেটে বিভিন্ন দিক থেকে গুলবার্গায় আনয়ন করা হয়। সুলতান এই গোটা সময়টা হযরত শায়খ যয়নুদ্দীনের সঙ্গে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং একনিষ্ঠ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাড়াতে থাকেন। শায়খ (রঃ)-ও সুলতানকে উৎসাহ প্রদান, সম্মান প্রদর্শন এবং দরকারী হেদায়াত ও পরামর্শ প্রদানে কখনও ত্রুটি করেননি।[১]

---

১. তারীখে ফিরিশতা, ১ম খণ্ড ৫৬০-৬২ পৃঃ পুনা সংস্করণ ১৮৩২

চিশতীয়া তরীকার বুযুর্গদের বিরাট বিরাট খানকাহ্ ভারতবর্ষের যে সমস্ত অংশে ও প্রদেশে স্থাপিত হয়, সেখানকার ইসলামী হুকুমত ও তৎকালীন সুলতানদের হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শন এবং ইসলামী হুকুমতের হেফাজতের ক্ষেত্রে এসব বুযুর্গ কখনই অলসতা প্রদর্শন করেন নি। পাণ্ডুয়াতে স্থাপিত বাংলার জগদ্বিখ্যাত খানকাহ সেখানকার ইসলামী হুকুমতের জন্য শক্তির উৎস ও আশ্রয়লাভের মাধ্যম ছিল। যখন সেখানকার ইসলামী রাজত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের ভিত নড়ে উঠল তখন ঐসব দরবেশ এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং তা পুনর্বহালের জন্য সাধ্যমত ও সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রয়াস চালান।[১] অধ্যাপক খালীক আহামদ নিজামী "তারীখে মাশায়িখে চিশ্ত" বা 'চিশতীয়া তরীকার মহান বুযুর্গগণের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

"হযরত নূর কুত্বে 'আলম ছিলেন শায়খ 'আলাওল হকের উপযুক্ত সন্তান। যে যুগে তিনি হেদায়াত ও ইরশাদের মসনদে সমাসীন ছিলেন সে সময় বাংলার রাজনীতি অত্যন্ত নাযুক অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিক্রম করছিল। রাজা গণেশ (যিনি রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়ার জায়গীরদার ছিলেন) বাংলার সিংহাসন দখল করে বসেন এবং মুসলমানদের শক্তি সমূলে বিনাশ করতে দৃঢ়সংকল্প হন। হযরত নূর কুত্বে 'আলম সরাসরি এবং সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ)-এর মাধ্যমে সুলতান ইবরাহীম শারকীকে বাংলাদেশ আক্রমণের দাওয়াত দেন। সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ)-এর সংকলনগুলিতে সেই সব চিত্তাকর্ষক চিঠিপত্র বিশেষভাবে পড়বার মত—যার ভেতর উক্ত রাজনৈতিক টানা-পোড়েন ও সংঘাতের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) যে চিঠি হযরত নূর কুতবে 'আলমের চিঠির জবাবে লিখেছিলেন তা বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় সূফীদের কার্যাবলীর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।"[২]

এই কতিপয় ঘটনা থেকেই অনুমান করা যাবে যে, চিশতীয়া সিলসিলার মহান বুযুর্গগণের তাসাওউফ শুধুমাত্র নির্জনবাস, আত্মহনন ও দুনিয়া-বর্জন ছিল না। তাঁরা নিজ নিজ কালে যুগের ধারাকে বদলাতে এবং যুগের অবস্থাচক্রের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার চেষ্টাও চালিয়েছেন। অত্যাচারী ও জালিম সুলতানের মুখোমুখী হক-কথা বলতে, তাদের ভুল ও অন্যায় প্রবণতার মুকাবিলা করতে ও রুখে

১. বিস্তারিত জানতে হলেদেখুন গুলাম হুসেন সলীমকৃত রিয়াযুস সালাতীন, তারীখে বাঙ্গালা, ১১০ পৃঃ থেকে ১১৬ পৃঃ

২. তারীখে মাশায়িখে চিশত ২০২ পৃঃ

দাঁড়াতে এবং তাদের সলাপরামর্শ দানেও কোনরূপ ইতস্তত করতেন না এবং যখনই তাঁদের মওকা মিলত তাঁরা সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লবী প্রয়াস গ্রহণেও দ্বিধা করতেন না।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

চিশতীয়া সিলসিলার বুনিয়াদ ভারতবর্ষের মাটিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উপর পড়েছিল এবং তার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর হাতে এত অধিক সংখ্যায় মানুষ মুসলমান হয়েছিল যে, ইতিহাসের এই অন্ধকারে তার পরিমাপ করা কঠিন। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যার এই আধিক্য অনেকাংশেই হযরত খাজা চিশতী (রঃ)-এর চেষ্টা-সাধনা ও আধ্যাত্মিকতারই অনিবার্য ফসল। এর মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যা হযরত খাজা (রঃ)-এর রূহানী কুওত, উজ্জ্বল কামালিয়াত এবং আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য ঘটনাবলীর কারণেই মুসলমান হয়েছিল। সে যুগের ভারতবর্ষ যোগ ও তান্ত্রিক সাধনার বিরাট কেন্দ্র ছিল। এখানকার অনেক ফকীর ও সন্ন্যাসী তান্ত্রিক-যোগসাধনা ও আত্মিক শক্তিতে ছিল অত্যন্ত বলীয়ান। কঠোর কঠিন সাধনা এবং বিভিন্ন প্রকার অনুশীলন ও যোগাভ্যাস দ্বারা তারা কাশফ ও সম্মোহনের বিরাট শক্তি আত্মস্থ করে রেখেছিল। তাদের মধ্য থেকে অনেক লোকই এই নবাগত মুসলমান ফকীরকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং তাঁকে তকলীফ দেবার জন্য তাঁর নিকট আসে। কিন্তু তারা সত্বরই জেনে যায় যে, এই বিদেশী মুসাফির দরবেশ তাদের থেকেও আত্মিক ও সম্মোহনী শক্তিতে অনেক বেশী অগ্রসর এবং অবশেষে ফেরআউনের যাদুকরদের মত তারাও পরিমাপ করতে পারে যে, তাঁর কামালিয়াত ও শক্তির উৎসমূল অন্য কিছু। এরই সঙ্গে তাদের চরিত্রের পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বৈরাগ্যসুলভ নির্লোভ জীবন যাপন, ঈমান ও একীনের শক্তি, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং মানবতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দর্শনে বিরুদ্ধবাদীরাও তাদের ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হয়। তাযকিরা ও তাসাওউফের কিতাবগুলিতে এই সিলসিলায় যোগী ও সন্ন্যাসী-দের সঙ্গে মুকাবিলা এবং হযরত খাজা (রঃ)-এর উজ্জ্বলতর আধ্যাত্মিক শক্তি, কাশফ ও সম্মোহনী শক্তির ঘটনাবলী যেরূপ ব্যাপকতর আধিক্যের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও ঐতিহাসিক সনদ থেকে ও প্রাচীনতর সমসাময়িক উৎসের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা কঠিন তবুও ভারতবর্ষের সে সময়কার লোকের আগ্রহ ও প্রবণতা

এবং আজমীরের ধর্মীয় ও আত্মিক কেন্দ্রিকতা দেখতে গেলে এটা মোটেই যুক্তি-বহির্ভূত মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস জনসাধারণকে হযরত খাজা (রঃ)-এর প্রেমিক এবং ইসলাম গ্রহণে উন্মুখ করেছিল তা তাঁর একক আত্মিক শক্তি ছিল না বরং তাঁর আধ্যাত্মিকতা, একনিষ্ঠতা, নিষ্কলুষ চরিত্র এবং সহজ-সরল জীবনযাপন পদ্ধতি যা ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী ও সাধারণ মানুষ এর পূর্বে আর কখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেনি।

হযরত খাজা (রঃ)-এর সিলসিলার ভেতর হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রঃ)-এর প্রচেষ্টা ও তাওয়াজ্জুহ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তাঁর মজলিস ও খানকাহ্‌তে সকল জাতি-ধর্মের এবং সর্ব শ্রেণীর লোকের আগমন ঘটত। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)বলেন,—

"শায়খুল ইসলাম খাজা ফরীদুদ্দীনের খেদমতে প্রতিটি শ্রেণী ও বর্ণের, এবং জাতি-ধর্মের লোক আসত—আসত দরবেশ ও অ-দরবেশও।"

হযরত খাজা (রঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা উচ্চতর যোগ্যতা ও আত্মিক শক্তি দান করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে এটা অসম্ভব নয় যে, ইসলাম প্রচারে সেটারও একটা ভূমিকা ছিল এবং নও-মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ তাঁর আধ্যাত্মিকতা এবং কাশফ ও কারামত দেখেই মুসলমান হয়েছিল। পাঞ্জাব ও পাক-পত্তনের চতুষ্পার্শের বহু জাতি-গোষ্ঠি ও খান্দান তাদের পূর্বপুরুষদের ইসলাম গ্রহণকে হযরত খাজা (রঃ)-এর তাওয়াজ্জুহ ও তবলীগের পরিণতি বলে মনে করেন এবং নিজেদের সম্পর্ক তাঁর দিকে যুক্ত করেন। অধ্যাপক আরনল্ড তাঁর পুস্তক "Preaching of Islam"-এ লিখেছেন:

পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রদেশগুলির অধিবাসীবৃন্দ খাজা বাহাউল হক মুলতানী এবং বাবা ফরীদ পাক-পত্তনীর তা'লীমের কারণে ইসলাম কবুল করে। এ দু'জন মহান বুযুর্গ ত্রয়োদশ শতাব্দীর নিকট শেষ পাদে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আগমন করেন। বাবা ফরীদ শকরগঞ্জ (রঃ)-এর জীবনী আলোচনা যিনি করেছেন, তিনি লিখেছেন যে, ষোলটি জাতিগোষ্ঠীকে তিনি তাঁর তা'লীম ও তালকীন তথা শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান করে ইসলামে দাখিল করেছিলেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, উক্ত গ্রন্থকার উক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির মুসলমান হবার বিস্তৃত বিবরণ লিখেন নি।[১]

১. দাওয়াতে ইসলাম—মওলবী 'ইনায়েতুল্লাহ কৃত অনুবাদ পৃঃ ২৯৭

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) ভারতবাসীদের ভেতর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, শুধুমাত্র বক্তৃতা-বিবৃতি ও বাণী শ্রবণে কোন লোকের পক্ষে তার প্রাচীন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে ফিরে আসা এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করা, বিশেষ করে হিন্দু জাতির পক্ষে যারা নিজেদের গোঁড়ামি, জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা তথা ছুঁৎমার্গকে কঠোরভাবে মেনে চলত তাদেরকে শুধুমাত্র বক্তৃতার চমৎকারিত্বে এবং ওয়াজ-নসীহতের মনোহারিত্বে মুসলমান বানিয়ে ফেলা মোটেই সহজ নয়। তার জন্য প্রভাবশালী ও দীর্ঘ সোহবতের প্রয়োজন।

'ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, একবার একজন মুসলিম ক্রীতদাস হযরত খাজা (রঃ)-এর মুবারক মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার সাথে তার এক হিন্দু বন্ধুকেও নিয়ে আসে। সে বলল, এ আমার ভাই। হযরত খাজা (রঃ) উক্ত ক্রীতদাসকে বললেন, তোমার এ ভাইটির ইসলামের দিকেও কি কিছু প্রবণতা আছে? ক্রীতদাস বলল, একে হযরতের পবিত্র খেদমতে এজন্যেই নিয়ে এসেছি যেন আপনার কৃপাদৃষ্টির বরকতে সে মুসলমান হয়ে যায়। একথা শোনা মাত্রই হযরত খাজা (রঃ)-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কারও বলার কারণে এ জাতির মন-মানস ও অন্তর রাজ্যের পরিবর্তন হয় না। অবশ্য হাঁ! এর যদি আল্লাহ্‌র কোন নেক বান্দার সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য ঘটে তবে আশা করা যায় যে, তার পবিত্র সোহবতের বরকতে সে মুসলমান হয়েও যেতে পারে।[১]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সময়ে যেখানে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) দিল্লীর ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে হেদায়াত ও ইরশাদ-এর আসনে সমাসীন ছিলেন এবং তাঁর খানকাহর দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য খোলা ছিল, আর এটা ছিল সেই যুগ যখন ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ও বিভিন্ন উপলক্ষে লাখ লাখ অমুসলিম দিল্লীতে আগমন করত এবং নিজেদের জাতীয় শুভ ধারণার ভিত্তিতে হযরত খাজা (রঃ)-এর পবিত্র যিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যেও হাযির হ'ত—বিরাট সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। মেওয়াট এলাকায় যা হযরত খাজা (রঃ)-এর কেন্দ্র গিয়াছপুর থেকে দক্ষিণ দিকের খানিকটা সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল এবং সেখানকার অধিবাসী-দের রাহাজানী ও অবাধ্য আচরণের কারণে কিছুকাল পূর্বে সুলতান নাসিরুদ্দীন

১. ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ, ১৮২ পৃষ্ঠা;

মাহমূদের যামানায় শহরের আশ্রয়-প্রাচীর দিল্লী দরজা সন্ধ্যা লাগতেই বন্ধ হয়ে যেত—হযরত খাজা (রঃ)-এর ফয়েয ও বরকতে এবং তাঁর তা'লীম ও তরবিয়তের প্রভাবে সেই মেওয়াটিরাও উপকৃত হয়ে থাকবে এবং এটা আদৌ আশ্চর্য নয় যে, তারা বিরাট সংখ্যায় তাঁরই যামানায় মুসলমানও হয়ে থাকবে।

চিশতীয়া তরীকার খানকাহগুলি নিজ নিজ প্রভাবাধীনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকার অমুসলিম অধিবাসীদেরকে নিজেদের আমল-আখলাক, রূহানী ভাবধারা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব দ্বারা—যার পরিবেশ উক্ত খানকাহ্‌গুলিতে বিদ্যমান ছিল, অবশ্যই প্রভাবিত করেছে। পাণ্ডুয়ার চিশতীয়া খানকাহ্ এবং আহমদাবাদ ও গুলবার্গার চিশতী বুযুর্গদের প্রভাবে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশের মুসলমান হওয়া আদৌ অমূলক কল্পনা নয়। একাদশ শতাব্দীতে চিশতীয়া সিলসিলার মুজাদ্দিদ হযরত শাহ কলীমুল্লাহ জাহাঁনাবাদী ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত শায়খ নিজামুদ্দীন আওরঙ্গাবাদীকে যে সব চিঠি-পত্র লিখেছেন তন্মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এর জন্য তাকীদ ও হেদায়াত লক্ষ্য করা যায়। এগুলি পাঠে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগ-অস্থিরতার পরিমাপ করা যায়। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

در آں کوشید کہ صورت اسلام ووسیع گردد و ذاکرین کثیر –

"ইসলামের সীমানার যেন বিস্তৃতি ঘটে এবং এর অনুসারীর সংখ্যা যেন ব্যাপকভাবে বর্ধিত হয় সেজন্য কোশেশ করবে।"

অধ্যাপক খালীক আহমদ নিজামী লিখেছেন:

'শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর তবলীগী চেষ্টা-সাধনার ফল এই হয়েছিল যে, বহু হিন্দুই ইসলামের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত হয়। কতক লোক যদিও আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে মুসলমান হবার কথা প্রকাশ করত না, কিন্তু অন্তর থেকে তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।'

নিতান্তই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় যে, কেউই ভারতবর্ষের মহান বুযুর্গদের, বিশেষ করে চিশতীয়া সিলসিলার বুযুর্গদের তবলীগী প্রয়াসের ইতিহাস ও বিবরণী লিপিবদ্ধ করার শ্রম স্বীকারে রাযী হয় নি। কিন্তু সমস্ত ঐতিহা-সিকই এ বিষয়ে একমত—ভারতবর্ষের বুকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইসলামের এই সব শ্রদ্ধেয় মহান সুফী ও ফকীর-দরবেশগণই এবং এটাও দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, তাসাওউফের এ ধারাবাহিকতায় চিশতীয়া

সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গগণের প্রাধান্য ও গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং এক্ষেত্রে তাদের অংশ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

'ইল্‌ম-এর খেদমত ও প্রচার

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) এবং তাঁর খলীফাগণ তাঁদের অনুসারীবৃন্দের 'ইল্‌ম হাসিল ও তার পূর্ণতা প্রাপ্তির ব্যাপারে কতখানি উৎসুক ছিলেন তার পরিমাপ হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন (রঃ)-এর কথিত উক্তি এবং স্বয়ং হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ)-এব শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উছ্‌মানী আওদী (আখী সিরাজ—প্রতিষ্ঠাতা, পাণ্ডুয়া খানকাহ্)-এর সঙ্গে কৃত আচরণ থেকে অনুমান করা যাবে। তিনি যতদিন পর্যন্ত 'ইল্‌ম হাসিল ও তার পূর্ণতা অর্জন না করেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে শর'ঈ ও রূহানী ক্ষেত্রে কোন কিছুর ইজাযত দেন নি। এর সুফল এই হয়েছিল যে, ধর্মীয় শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন, দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন এবং 'ইল্‌মের প্রচার ও প্রসার উভয়টিই এই সিলসিলার ইতিহাসে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। এই সহাবস্থান মুসলমানদের অবনতি ও অধঃপতন কাল পর্যন্ত চলেছিল। হযরত খাজা (রঃ)-এর একজন খলীফা মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া ঐ যুগের বহু 'উলামায়ে কিরাম ও মুদাররিসীনের উস্তাদ ছিলেন। শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ) একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন,

سالت العلم من احياك حقا - فقال العلم شمس الدين يحيى -

অর্থাৎ আমি 'ইল্‌মকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমাকে সত্যিকার জীবন কে দান করেছে ; উত্তরে সে মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া (রঃ)-এর নাম উল্লেখ করল।

শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-এর বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্ত-অনুরক্তদের মধ্যে কাযী 'আবদুল মুকতাদীর কুন্দী (ওফাত, ৭৯১), তাঁর প্রিয় শাগরিদ শায়খ আহমাদ থানেশ্বরী (ওফাত, ৮২০ হিঃ), এবং মাওলানা খাওয়াজগী দেহলভী (ওফাত, ৮০৯ হিঃ) ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'উলামা, উস্তাদকুল-শিরোমণি ও 'ইল্‌মের মুজাদ্দিদবর্গের অন্যতম ছিলেন। কাযী 'আবদুল মুকতাদির এবং মাওলানা খাওয়াজগীরের প্রিয় শাগরিদ শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে 'উমর দৌলতাবাদী (ওফাত, ৮৪৯ হিঃ) ভারতীয় উপমহাদেশের গৌরব ও মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতেন। আর মালিকুল 'উলামা কাযী শিহাবুদ্দীনের নাম ভারতবর্ষের জ্ঞানের ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে বিরাজিত ও বিকশিত ছিল। তাঁর 'শরাহ কাফিয়া' ('শরাহ হিন্দী' নামে আরব ও অনারব সর্বত্রই

মশহূর)-এর টীকাকারদের মধ্যে 'আল্লামা গাযরূনী এবং মীর গিয়াসুদ্দীন মনসূর শিরাজীর ন্যায় মহান ব্যক্তিও রয়েছেন। ইনিই তিনি যিনি রোগাক্রান্ত হলে সুলতান ইবরাহীম শারকী পানির পেয়ালা ভরে তার পক্ষে সাদ্‌কা করেন এবং দু'আ' করেন যে, মালিকুল 'উলামা আমার সালতানাতের 'ইয্‌যত ও আবরূ স্বরূপ। তাঁর মৃত্যু যদি অবধারিত হয়েই থাকে তবে তাঁর পরিবর্তে আমাকেই যেন কবুল করা হয়।

এই সিলসিলার একজন বুযুর্গ 'আলিম মাওলানা জামালুল আওলিয়া শিবলী লোদী (ওফাত, ১০৪৭ হিঃ) যাঁর প্রখ্যাত ও নামকরা শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে মাওলানা লুতফুল্লাহ কুর্দী, শায়খ মুহাম্মাদ তিরমিযী কালপভী, শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ জৌনপুরী এবং সায়্যিদ ইয়াসীন বানারসীর মত মহান 'আলিম ও যমানার শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ রয়েছেন। মাওলানা লুতফুল্লাহ কুর্দীর শাগরিদ ছিলেন হিন্দুস্তানের মশহূর 'আলিম মাওলানা আহমাদ মিঠৌভী ওরফে হামীদ আহমাদ, কাযী 'আলীমুল্লাহ্ কুচেন্দোভী এবং মাওলানা 'আলী আসগর কনৌজী যাঁরা দরস ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন-এর তৎপরতা অব্যাহত রাখেন এবং বড় বড় খ্যাতনামা 'আলিম ও মুদাররিস তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্র (হালকায়ে দরস) থেকে উপযুক্ততা ও পরিপূর্ণতা হাসিল করে বের হয়ে আসেন। টিলাওয়ালী মসজিদের প্রখ্যাত দারুল 'উলূম যার দায়িত্বে ছিলেন শাহ পীর মুহাম্মাদ লাখনোভী (ওফাত ১০৮৫ হিঃ) এই সিলসিলার তা'লীম ও রূহানীয়াতের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। স্বয়ং দরসে নিজামী[১] (যার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত)-এর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিজামুদ্দীন (ওফাত, ১১৬১ হিঃ)-এর বিখ্যাত খলীফা এবং বংশধর এই সিলসিলার সঙ্গে রূহানী সম্পর্ক রাখতেন। এছাড়া সাধারণভাবেও চিশতীয়া তরীকার মহান বুযুর্গগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ, গভীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানপ্রীতি একটি ঐতিহাসিক সত্য যা হযরত নূর কুতবে 'আলম, হযরত জাহাঙ্গীর আশরাফ সিমনানী, হযরত শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদীর চিঠিপত্রে এবং পাণ্ডুয়া, গুলবার্গা, মানিকপুর, সলোন ইত্যাদি খানকাহগুলির শিক্ষামূলক তৎপরতা ও এর প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন থেকে সহজেই আঁচ করা যায়।

শেষ কথা

চিশতীয়া সিলসিলার ইতিহাসের এই উজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত করার পূর্বে একটি তিক্ত সত্য প্রকাশ করে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে,

---

১. বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী প্রদত্ত শিক্ষা-পদ্ধতি।---অনুবাদক।

তাসাওউফ ও রূহানী ভাবধারার ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে, প্রত্যেকটি সিলসিলার প্রারম্ভ জোরালো উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রবল আবেগ-অনুপ্রেরণা দ্বারাই হয়েছে। অতঃপর তা গতানুগতিকতা এবং পরিশেষে রসম-রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এখানেও যে সিলসিলার প্রারম্ভ 'ইশক, মুহব্বত, যুহ্‌দ ও আত্মোৎসর্গ, দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা, রিয়াযত ও মুজাহাদা, দাওয়াত ও তবলীগ দিয়ে হয়েছিল, তার ভেতর ক্রমান্বয়ে এমন সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এর ব্যবস্থাপনায় তিনটি উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াশীল বস্তু রয়ে গেছে।

(ক) ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের 'আকীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, এর প্রচারে সীমাহীন আগ্রহ এবং এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যায়গুলোর ঘোষণা ও অবাধ আলোচনা।

(খ) মহফিলে সামা'র আধিক্য, ভাবাবেগ ও নৃত্যের মাত্রাতিরিক্ততা।

(গ) শরীয়তের বাধা-নিষেধ বহির্ভূত ওরস অনুষ্ঠানের আয়োজন, তার ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি।

সে সমস্ত আমল, রসম-রেওয়ায ও 'আকীদা—যার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য খালেস ও বিশুদ্ধ দীনের এসব দৃঢ়চেতা ও মনোবলসম্পন্ন মুবাল্লিগবৃন্দ ইরান ও তুর্কিস্তানের দূরদূরান্ত থেকে এসেছিলেন—ক্রমে ক্রমে তাঁদের খানকাহ্‌গুলি এমন রূপ লাভ করেছিল যে, অমুসলিম জনবসতিগুলির জন্য এটা একটি বিব্রতকর সমস্যা ও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ভেতর (যে সবের সংস্কার ও সংশোধনের নিমিত্ত ইসলামের এসব মুবাল্লিগ জল-স্থল অতিক্রম করে তশরীফ এনেছিলেন) কার্যত পার্থক্য কি? 'তাওহীদ' শব্দের ব্যবহার এবং তাওহীদের দাওয়াত ওয়াহদাতুল ওজুদের অর্থের ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সুন্নত ও শরীয়তের অনুসরণ—যে বিষয়ের উপর ঐ সমস্ত বুযুর্গ এত বেশী জোর দিয়েছিলেন জাহেরী-পন্থীদের প্রতীক চিহ্ন এবং হাকীকত অজ্ঞ-লোকদের আলামত হিসাবে রূপলাভ করে। শরীয়ত ও তরীকত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের নাম হিসাবে মেনে নেওয়া হয়---যার মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্নতাই নয়, পারস্পরিক বিরোধও বর্তমান। বাদ্যযন্ত্র ও সামা'র যান্ত্রিক উপকরণসমূহ যেগুলিকে পূর্ববর্তী যুগের বুযুর্গগণ এত কঠোর-কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন তা এই তরীকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ব্যথা-বেদনা ও 'ইশকের উপাদান যা ছিল চিশতীয়া তরীকার পুঁজি ও মূলধন,—আজকের এ বাজারে এর এত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে যে, সত্য-সন্ধানীকে আজ আফসোসের সঙ্গে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, দারিদ্র যে তরীকার ছিল গর্ব ও অহংকার, আজ তাই আমীরী চাল-চলন ও শাহী ঠাট-বাটে পরিণত হয়েছে।

এ সবের থেকে বেশী বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং ইতিহাসের সকরুণ পরিণতি এই যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত বান্দাহ্‌র জীবনের লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্‌র সকল বান্দাহ্‌র মাথাকে দুনিয়ার তামাম আস্তানা থেকে উঠিয়ে একক আল্লাহর আস্তানার দিকে ঝুকিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য সব বস্তুতে আটকে পড়া অন্তরকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া এবং যাঁদের দাওয়াত ও জীবন-জিন্দেগী ছিল আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ)-এর জীবন ও জিন্দেগীর প্রতিচ্ছবি আর নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর—

ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذ الملئكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون -
(ال عمران ع - ٨)

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে যে, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও,' এটা তার জন্য শোভন নয় ; বরং সে বলবে—তোমরা রাব্বানী[১] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।"

"ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফির হতে বলবে ?" (সূরা আল-'ইমরান-৮ম রুকূ')

—যামানার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে স্বয়ং তাঁরাই প্রার্থীত বস্তু ও লক্ষ্য এবং তাঁদের আস্তানাগুলিই সিজদাস্থল ও উপাস্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

মাখদূমুল মুল্‌ক—

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ ইয়াহইয়া মুনায়রী (রহঃ)

প্রথম অধ্যায়

জীবনের ঘটনাবলী ও বিভিন্ন অবস্থা

জন্ম থেকে বায়‘আত ও ইজাযত লাভ পর্যন্ত

খান্দান

নাম আহমাদ, শরফুদ্দীন উপাধি, মাখদুমুল মুলক বিহারী তাঁর খেতাব। পিতার নাম ছিল শায়খ ইয়াহ্ইয়া। ইনি ছিলেন যুবায়র বিন ‘আবদুল মুত্তালিবের অধঃস্তন পুরুষের অন্তর্গত। এ দিক থেকে তাঁর খান্দান কুরায়শ বংশের প্রধান শাখা হাশিমী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুনায়রী (রঃ)-এর পিতার পিতামহ মাওলানা মুহাম্মদ তাজ ফকীহ স্বীয় যুগের বিখ্যাত ‘উলামা ও মাশায়িখে কিরামের অন্তর্গত ছিলেন। আল-খালীল (শাম)[1] থেকে আবাস স্থানান্তর করে বিহারের অন্তর্গত মুনায়র[2] নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। কতক গ্রন্থকার তাঁকে সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরীর সমসাময়িক বলেছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ তাজ ফকীহ (রঃ)-এর ব্যক্তিত্বের কারণে মুনায়র এবং তৎ-পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। কিছুকাল পরে তিনি মুনায়র-এ অবস্থান করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনের

---

১. বর্তমানে এ শহর হাশিমী রাষ্ট্র জর্দানের একটি শহর, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে প্রায় ১৫/১৬ মাইল দূরে অবস্থিত এবং হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর দাফনগাহ হবার সৌভাগ্য লাভে ধন্য। শরীফ ও নেককার লোকদের এটা প্রাচীন বসতি। স্থনটি আবহাওয়ার মিষ্টি আমেজ, অধিবাসীদের বিনয়-নম্র ব্যবহার, মেহমানদারী ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য মশহূর।

২. এখন সাধারণভাবে “মিনায়র” নামে মশহূর। কিন্তু প্রাচীন উৎস ও বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এর আসল উচচারণ ‘মুনায়র’ ছিল। ফারহাঙ্গে ইবরাহিমী—যার অপর নাম শরফনামা ইবরাহিমী এবং শরফনামা আহমাদ মুনায়রীও আছে এবং যা ৮৬২ হিজরী থেকে ৮৭৯ হিজরীর মধ্যবর্তীকালের রচনা—এর ভূমিকায় এর লেখক ইবরাহীম কাওয়াম ফারূকী তাঁর কবিতার একটি চরণে কিতাবের নাম এভাবে ছন্দোবদ্ধ করেছেন شرف نامۂ احمد منیری এ চরণটি তখনই ছন্দোবদ্ধ সমপাল্লার হতে পারে যখন এটাকে ‘মুনইয়ারী’ পড়া হবে। এই কিতাবের আলোচনায় নিম্নে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর তালিকা-সূচীতে ইংরেজীতেও এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে (Munyari) অর্থাৎ মুনায়রী।

বাকী অংশ খালীলেই অতিবাহিত করেন। তাঁর খান্দান দস্তুরমত মুনায়রেই থেকে যায়।

শায়খ আহমাদ শরফুদ্দীন (রঃ)-এর নানা শায়খ শিহাবুদ্দীন জগজ্জোত (রঃ) সুহরাওয়ারদীয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরামের অন্যতম ছিলেন। পিতৃভূমি ছিল কাশগড়। সেখান থেকে তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং জাঠলী নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। জাঠলী পাটনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। শায়খুশ শুয়ূখ হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ারদী (রঃ)-এর মুরীদমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন। যুহ্‌দ, পরহেযগারী ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচচ মরতবার অধিকারী ছিলেন এবং এ কারণেই "জগজ্জোত" অর্থাৎ 'দুনিয়ার আলো' উপাধিতে মশহূর হন। তাঁর এক কন্যার গর্ভে শায়খ আহমাদ শরফুদ্দীন (রঃ) এবং অপর কন্যার গর্ভে শায়খ আহমাদ চরমপোশ (রঃ)-এর মত নামী বুযুর্গ পয়দা হন।[১] তিনি ছিলেন হযরত ইমাম হুসায়নের বংশধর। এদিক দিয়ে শায়খ শরফুদ্দীন (রঃ)-এর মাতৃকুল সায়্যিদ বংশধর।

জন্ম

৬৬১ হিজরীর শা'বান মাসের শেষ জুম'আর দিনে মুনায়র নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। شرف آگیں ছিল জন্ম তারিখ। শায়খ শরফুদ্দীনের ভাই ছিলেন তিনজন —যাঁদের নাম যথাক্রমে —শায়খ খলীলুদ্দীন, শায়খ জলীলুদ্দীন ও শায়খ হাবীবুদ্দীন।

শিক্ষা

হযরত শায়খ শরফুদ্দীনের পড়াশোনা করার মত বয়স হতেই তাঁকে মকতবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে যুগে সবগুলি মুসলিম দেশেই সাধারণত নিয়ম ছিল যে, ছাত্রদেরকে তাদের পাঠ্য পুস্তকের প্রতিটি শব্দাক্ষরসহ মুখস্থ করানো হ'ত এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত কিছু কিতাবও। এর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রের স্মৃতি-

---

১. 'সীরতুশ শরফ' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে. মুনায়র নামক কসবাটি ৫৭৬ হিজরীতে মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়। গ্রন্থকার একটি ঐতিহাসিক নজীর তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপঃ

এর দ্বারা এটা স্বীকার করতে হয় যে, মুনায়র বিজয় ৫৮৮ হিজরীতে শিহাবুদ্দীন ঘোরীর ভারতবর্ষ বিজয়েরও আগের ঘটনা। মুসলমানরা কি তাহলে গযনী রাজত্বের পূর্বেই বাংলা-বিহার সীমান্তে প্রবেশ করেছিল এবং তারা ইসলামী উপনিবেশ ও কর্তৃত্ব স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল? বিষয়টি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গবেষণার বিষয়।

ভাণ্ডার যেন শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে হযরত শায়খ এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিকে তাঁর কতিপয় লেখায় সমালোচনা করেছেন এবং স্মৃতিশক্তি ও সময়ের এ ধরনের অপব্যবহারে আফসোস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, একমাত্র কুরআনুল করীম ছাড়া এ জাতীয় কিতাবকে এভাবে রফ্ত করানো— যা ধর্মের দৃষ্টিতেও কোন সুফল বহন করে না—অবান্তর প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। মা'দানুল মাআনী' নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলেন:

শৈশবে আমার উস্তাদ মহোদয়গণ আমাকে অনেক কিতাবই মুখস্থ করিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মাসাদির, মিফতাহুল লুগাত ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মিফতাহুল লুগাত বিশটি অংশের সমষ্টি একটি গ্রন্থ যার একটি খণ্ডের মত আমাকে মুখস্থ করান। এর পরিবর্তে কুরআন মজীদই আমাকে মুখস্থ করাবার দরকার ছিল।[১]

নিতান্ত আফসোসের বিষয় এই যে, কোন 'তাযকিরা' গ্রন্থে তাঁর প্রাথমিক উস্তাদগণের নাম এবং সেসব কিতাব ও 'ইল্‌মের বিস্তারিত বিবরণ নেই যা তিনি দেশে থেকে শিখেছিলেন। এতটুকু অনুমান করা চলে যে, তিনি মুনায়র থেকেই মাঝারী রকমের শিক্ষা লাভ করেন এবং সে যুগের বড় বড় উস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করার মত যোগ্যতা অর্জন করেন।

মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং সোনার গাঁও সফর

দেশে থেকে শিক্ষালাভের যতখানি সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সম্ভব ছিল তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ ফায়দা উঠাবার পর আল্লাহ পাক তাঁকে 'ইল্‌ম হাসিলে পরিপূর্ণতা এবং আরও অধিকতর তরক্কী দানের উদ্দেশ্যে অন্যবিধ ইন্তেজাম করেন। দিল্লীর প্রখ্যাত উস্তাদ মহোদয়গণের মধ্যে মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা যিনি সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের রাজত্বকালে জ্ঞানমার্গের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন,—সম্ভবত সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে[১] তাঁর নিকট ব্যাপক লোক সমাগমের ফলে এবং হিংসুকদের

১. মি'অদানুল মা'আনী মতবায়ে শরফুল আখবার, ৪৩ পৃষ্ঠা ;

১. যদি এটা মেনেও নেয়া হয় যে, মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মুনায়র আগমনের সময় শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ কমপক্ষে বারো বছর বয়স্ক ছিলেন তাহলে এ সময়টা হবে হিজরী ৬৭৩ সাল, সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল। ইনি ৬৬৪ হিঃ—৬৮৬ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ থেকে জানা যায় যে, মাওলানা আবু তাওয়ামা (রঃ) সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের ইঙ্গিতেই হিজরত করেছিলেন।

ঈর্ষাকাতরতায় বাদশাহ্‌র ইঙ্গিতে দেশত্যাগে বাধ্য হন এবং সে যুগের ভারতবর্ষের মুসলিম সাম্রাজ্যের শেষ সীমান্ত শহর সোনার গাঁও[১] অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিহার প্রদেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করা কালে তিনি কয়েকদিন মুনায়রে অবস্থান করেন। সম্ভবত সে সময় দিল্লী থেকে সোনার গাঁও যেতে এটি সরাইখানার ন্যায় কাফেলার বিশ্রামস্থল ও জনবসতি ছিল। অধিবাসীবৃন্দ জানতে পারে যে, দিল্লীর একজন যবরদস্ত 'আলিম মুনায়র আসছেন। "মানাকিবুল আসফিয়া"[২] লেখকের বর্ণনা মতে—শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া শায়খ মাওলানা শরফুদ্দীনের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, নেক আমল ও তাকওয়া দৃষ্টে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং বলেন যে, 'ইল্‌মে দীন বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষালাভ এমনি 'ইল্‌ম ও আমলের অধিকারী ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে করা উচিত। অতএব তিনি তাঁর পিতামাতার নিকট সোনার গাঁও যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের ইজাযত লাভের পর তিনি মাওলানা শরফুদ্দীনের সাহচর্য অবলম্বন করলেন এবং সোনার গাঁও গমন করেন। স্বয়ং শায়খ তদীয় গ্রন্থ "খাওয়ানে পুর নে'মত"-এর ষষ্ঠ মজলিসে উস্তাদ মুহতারাম সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে নিম্নরূপ ভাষার আশ্রয় নেন:

مولانا شرف الدين ابو توامه ایں چنیں دانشمندے کہ در زمانہ هندوستان مشار اليه بودند و ہیچ کس را در علم ایشان شبیہ نہ بود -

অর্থাৎ "মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রঃ) এমন একজন 'আলিম ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিই ছিল যাঁর প্রতি নিবদ্ধ এবং জ্ঞানের জগতে

১. মুসলিম রাজত্বকালে সোনার গাঁও ছিল পূর্ববঙ্গের রাজধানী। এখন এটা একটা অখ্যাত জায়গা যা অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে আছে এবং Painam (পয়নাম) নামে ঢাকা জেলার অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র নদ এর থেকে দু'ক্রোশ দূর দিয়ে প্রবাহিত। সোনারগাঁওয়ের চারপাশে বহু সংখ্যক মসজিদের নিশানা পাওয়া যায় যা থেকে বুঝা যায়--কোন এককালে এটি একটি বড় বিরাট মুসলিম শহর ছিল। শেরশাহ যে শাহী সড়ক তৈরি করেছিলেন এটা তার শেষ পর্যায়।

২. "মানাকিবুল আসফিয়ার" লেখক মাখদুম শাহ শু'আয়ব ফিরদাউসী। ইনি হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ মুনায়রী (রঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং শায়খ 'আবদুল 'আযীয ইবনে মাওলানা মুহাম্মাদ তাজ ফকীহ (রঃ)-এর পৌত্র। এদিক দিয়ে এ গ্রন্থ শায়খ শরফুদ্দীন (রঃ)-এর জীবন বৃত্তান্তের প্রাচীনতম ও খান্দানী উৎস।

তাঁর সমকক্ষ তখন কেউ ছিল না।"[১] সোনার গাঁও পোঁছে তিনি 'ইল্‌ম হাসিলের ভেতর একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়ে যান।

'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা বলেন যে, জনাব মুনায়রী (রঃ) অধ্যয়ন ও পাঠাভ্যাসে এতখানি নিমগ্ন ছিলেন এবং সময়ের এতখানি মূল্য দিতেন যে, ছাত্র ও আগন্তুকদের সাধারণ দস্তরখানে হাযির হওয়া এবং সবার সঙ্গে খানায় শরীক হওয়া ও সেখানে অধিক সময় অতিবাহিত করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা তাঁর নিবিষ্টতা ও প্রকৃতির এ ধরনের গভীর দাবি দৃষ্টে তাঁর জন্য স্বতন্ত্র ইন্তেজাম করেন। তাঁর খাবার অতঃপর তাঁর নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হ'ত।[২]

শায়খ শরফুদ্দীনের এ সময়টা গভীর নিবিষ্টতা ও একাকীত্বের মাঝে অতিবাহিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, সোনার গাঁও অবস্থানকালে দেশ থেকে যে সব চিঠিপত্র এসে পৌঁছুত তিনি সেগুলিকে একটি ঝুড়িতে নিক্ষেপ করতেন এবং এগুলি এই ধারণায় পড়তেন না যে, না জানি এর কারণে তাঁর প্রকৃতিতে বিশৃংখল, মানসিক বিপর্যয় ও অশান্তির কারণ ঘটে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পথে তা বাঁধাবিঘ্নের সৃষ্টি করে।[৩]

শায়খ মুনায়রী (রঃ) সোনার গাঁওয়ে মাওলানার খেদমতে প্রচলিত সর্ব প্রকার জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও কল্যাণকর জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভের পর মহান উস্তাদের মনে খাহেশ সৃষ্টি হয় যেন তিনি (শায়খ মুনায়রী) সে সমস্ত 'ইল্‌মও হাসিল করেন যা সে যুগের তরুণ ও উৎসাহী যুবকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে শিক্ষালাভ করত। যেমন, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি। শায়খ মুনায়রী (রঃ) এতে আপত্তি করেন এবং বলেন যে, আমার জন্য ধর্মীয় শিক্ষাই যথেষ্ট।

বিবাহ

মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রঃ) মূল্যবান রত্নসম এই যুবকের উপযুক্ত সম্মান ও কদর প্রদান করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হন নি। স্বীয় কন্যাকে শায়খ শরফুদ্দীন আহমাদ ইয়াহ্‌ইয়া মুনায়রী (রঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে

---

১. "খাওয়ানে পুর নে'মত" ১৫ পৃষ্ঠা, মতবায়ে আহমদী ;
২. "মানাকিবুল আসফিয়া" ১৩১-৩২ পৃষ্ঠা ;
৩. সীরতুশশরফ ৪৬ পৃঃ ও নুযহাতুল খাওয়াতির ২য় খণ্ড, ৯ পৃঃ

তাঁকে জামাতারূপে গ্রহণ করেন। সোনার গাঁওয়ে অবস্থানকালেই শায়খ মুনায়রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শায়খ যাকীউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন

কতক জীবনী-রচয়িতার বর্ণনামতে---শিক্ষা সমাপনান্তে যখন তিনি চিঠির ঝাপি খোলেন তখন প্রথম চিঠি খুলতেই তিনি তাতে পিতা-শায়খ ইয়াহইয়া (রঃ)-এর ইন্তিকালের সংবাদ দেখতে পান। এ সংবাদ মিলতেই তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে এবং সন্তানের মনে উছলে ওঠে মাতৃভক্তি রসের ফল্গুধারা। তিনি দেশে ফিরবার জন্য শ্রদ্ধেয় উস্তাদের নিকট ইজাযত চাইলেন এবং পুত্র শায়খ যাকীউদ্দীনকে সাথে নিয়ে মুনায়র প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

শায়খ ইয়াহ্‌ইয়া মুনায়রী (রঃ)-এর ইন্তিকাল হয় ঐতিহাসিকদের মতে ৬৯০ হিজরীর ১১ই শা'বান তারিখে। এজন্য এটা স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর (শায়খ শারফুদ্দীন) দেশে প্রত্যাবর্তন কাল ছিল ৬৯০ হিজরীর কোন এক মাস। এর চেয়ে বেশী বিলম্বের সুযোগ এজন্য নেই যে, শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী—যাঁর হাতে তিনি দিল্লী গিয়ে বায়'আত হয়েছিলেন—ইন্তিকাল করেন ৬৯১ হিজরীতে। এজন্য মুনায়র প্রত্যাবর্তন এবং দিল্লী পৌঁছা ৬৯০ হিজরীর শেষ কিংবা ৬৯১ হিজরীর প্রথম দিককার ঘটনা বলে স্বীকার করতে হয়। এ যুগে সফরে দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা এবং সোনার গাঁও থেকে দিল্লী পর্যন্ত দূরত্ব দৃষ্টে এ বর্ণনা স্বীকার করে নিতে কিছুটা কষ্ট হয় এবং এ ঘটনাও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয় যে, তিনি ৬৯০ হিজরী পর্যন্ত চিঠি খুলে দেখেননি আর পিতার ইন্তিকালের পর পরই তাঁর চিঠির ঝাপি খোলার সুযোগ হয়, আবার তাও খুলতেই হাতে পড়ে পয়লাতেই তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ সংক্রান্ত চিঠিটা। কাজেই শায়খ মুনায়রী (রঃ)-এর দেশে ফেরার একমাত্র কারণ শুধুমাত্র একটি চিঠির আকস্মিক পাঠই বলা ঠিক হবে না, বরং এ থেকে এটা অবশ্যই প্রকাশ পায় যে, তিনি ৬৯০ হিজরীর পূর্বে তাঁর স্বদেশভূমি মুনায়রে প্রত্যাবর্তন করেননি কেননা এই প্রত্যাবর্তনকালে কোন জীবনীকারই তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার সাক্ষাতের কোন বর্ণনা উল্লেখ করেননি। ''মানাকিবুল আসফিয়া'' গ্রন্থে (যা তাঁর সম্পর্কে জানবার একটি খান্দানী উৎসও বটে) বলা হয়েছে:

''সেখান থেকে তিনি মুনায়র প্রত্যাবর্তনের নিয়ত করলেন। মায়ের খেদমতে উপস্থিত হয়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র (শায়খ যাকীউদ্দীন)-কে তাঁর দাদীর কোলে তুলে

---

১. ''সীরতুশশরফ'' ৫২ পৃষ্ঠা;

দিলেন এবং বললেন যে, একেই আপনার সন্তান মনে করুন। আর আমাকে ইজাযত দিন যেন যেখানে ইচ্ছা আমি যেতে পারি এবং মনে করবেন যে, শরফুদ্দীন মারা গেছে। এরপর তিনি দিল্লী রওয়ানা হয়ে যান এবং দিল্লীর মহান বুযুর্গগণের খেদমতে হাযির হন।"[১]

যাই হোক তাঁর উচ্চ মনোবল, সত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও নিষ্ঠা এবং 'ইশ্কে ইলাহীর সুপ্ত স্ফুলিংগ তাঁকে এর ইজাযত দেয়নি যে, তিনি জাহিরী 'ইল্মে পরিপূর্ণতা লাভকেই যথেষ্ট মনে করে মুনায়রে অবস্থান করবেন এবং জাহিরী 'আলিমদের ন্যায় দরস ও তাদরীস তথা পঠন ও পাঠনকেই একমাত্র পেশা হিসাবে আঁকড়ে ধরবেন। অল্পবয়স্ক পুত্র যাকীউদ্দীনকে নিজ মায়ের হাওয়ালা করেন এবং বলেন যে, একেই আমার স্মৃতি ও খান্দানের আশার বাতি জেনে নিজের কাছে রাখুন, অন্তরকে প্রবোধ দিন এবং আমাকে দিল্লী যাবার অনুমতি দিন যেন আমার পরম লক্ষ্য ও আরাধ্যকে আমি লাভ করতে পারি।

দিল্লী সফর ও একজন মহান বুযুর্গের নির্বাচন

যাই হোক ৬৯০ হিজরীর শেষ ভাগে কিংবা ৬৯১ হিজরীর প্রথম পাদে তিনি দিল্লী রওয়ানা হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ জলীলুদ্দীন ছিলেন সফরসঙ্গী। অনুমান করা যায় যে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী উস্তাদের তা'লীমের ফয়েয ও বরকতে এবং স্বীয় প্রকৃতিগত সূক্ষ্ম উপলব্ধি থেকে তাঁর মধ্যে সমসাময়িক 'উলামা ও মাশায়িখে কিরামকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস এবং জাহিরী 'ইল্মের মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছিল। দিল্লী পৌঁছে তিনি সে যুগের বিখ্যাত বুযুর্গদের দরবারে হাযিরা দেন এবং তাঁদেরকে এই দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন যে এঁদের মধ্যে কাকে তাঁর মুরশিদ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু জীবনীকারদের বর্ণনানুসারে দিল্লীর বুযুর্গানে দীন ও মাশায়িখে কিরামের মধ্যে কেউই তাঁর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল না। মানাকিবুল আসফিয়ার বর্ণনা মুতাবিক তিনি সবার দরবারে হাযিরা দেবার পর বলেন, "এটাই যদি হয় পীর-মুরীদী তবে আমিও একজন পীর।"[২] اگر شیخی اینست ماهم شیخیم শুধুমাত্র হযরত সুলতানুল মাশায়িখ শায়খ নিজামুদ্দীন (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শায়খ মুনায়রী (রঃ) ও সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ)-এর মাঝে কিছু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়। সুলতানুল মাশায়িখ (রঃ) তাঁর

---

১. মানাকিবুল আসফিয়া, ১৩২ পৃষ্ঠা,

২. মানাকিবুল আসফিয়া, ১৩২ পৃষ্ঠা;

বিভিন্ন প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তরও দিয়েছিলেন। হযরত খাজা (রঃ) তাঁকে ভক্তি ও সম্মান করেন এবং পানের একটি থালা পেশ করেন এবং বলেন, سیمر غ نیست نصیب دام ما نیست "একটি বাজপাখী উচ্চে উডডীয়মান, কিন্তু আমাদের জালের ভাগ্যে নেই তাকে ধরার ও বন্দী করার।"[১]

এরপর তিনি দিল্লী থেকে পানিপথ আসেন এবং শায়খ বু'আলী (শরফুদ্দীন) কলন্দর পানিপথীর খেদমতে হাযির হন। সেখানেও তিনি তাঁর লক্ষ্য ও আরাধ্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হন। তিনি বলেন,

شیخ است اما مغلوب حال است بہ تربیت دیگرے
نمی پروازد"

অর্থাৎ শায়খ আছে, কিন্তু পরাজিত অবস্থায়, অন্যের তরবিয়ত দিতে সে অপারগ ও অক্ষম।[২]

শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)

দিল্লী ও পানিপথ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ জলীলুদ্দীন খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ) প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁর তরীকা ও গুণাবলীর বর্ণনা দেন। শায়খ মুনায়রী (রঃ) বললেন যে, দিল্লীর যিনি কুত্‌ব ছিলেন (অর্থাৎ হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া) তিনিই যখন একটি পান পাতা দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন তখন আর অন্যের কাছে গিয়ে কি করব? ভাই যখন বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তখন তিনি সাক্ষাতের জন্য মন স্থির করেন এবং দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি এমনি শান-শওকতের সঙ্গে দিল্লী পেঁৗছেন যে, তাঁর মুখে পান-পোরা ছিল আর কিছু পান ছিল রুমালে বাঁধা অবস্থায়। খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)-এর দৌলত-খানার নিকটে পেঁৗছতেই তাঁর এক ধরনের কাঁপুনী দেখা দেয় এবং তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে পড়েন। এতে তিনি আশ্চর্য হন এবং বলেন যে, ইতিপূর্বেও আমি অন্যান্য মাশায়িখে কিরামের দরবারে হাযির হয়েছি, কিন্তু কোথাও এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হইনি।

তিনি হযরত শায়খ ফেরদৌসী (রঃ)-এর খেদমতে গিয়ে পেঁৗছুলেন। তার

১. মানাকিবুল আসফিয়া ১৩২ পৃষ্ঠা,

২. ঐ ১৩২ পৃষ্ঠা;

উপর শায়খের নজর পড়তেই তিনি বললেন যে, মুখে পান, আবার রুমালে পানের পাতা, অথচ দাবি যে আমিও শায়খ।—একথা শুনতেই তিনি মুখ থেকে পান বের করে ফেলেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ভদ্র ও বিনীতভাবে উপবেশন করেন। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর তিনি বায়'আতের জন্য দরখাস্ত করেন। হযরত খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ) এ দরখাস্ত কবুল করেন এবং তাঁকে সিলসিলাভুক্ত করে নেন[১] এবং ইজাযত প্রদান করে বিদায় দেন।

১. মানাকিবুল আসফিয়া, ১৩২ পৃষ্ঠা;

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষে ফিরদৌসিয়া সিলসিলা এবং এর মহান বুযুর্গগণ

খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (রঃ)

বুযুর্গকুল শ্রেষ্ঠ "আওয়ারিফুল মা'আরিফ" প্রণেতা ও সুহ্রাওয়ারদীয়া তরীকার ইমাম শায়খ শিহাবুদ্দীন 'উমর সুহরাওয়ারদীর মহান পিতৃব্য শায়খ-ই-তরীকত খাজা যিয়াউদ্দীন আবুন নাজীব 'আবদুল কাহির সুহরাওয়ারদী (রঃ), (ওফাত ৫৬৩ হিজরী)-এর শ্রেষ্ঠতম খলীফাবৃন্দের মধ্যে আবুল জনাব আহমাদ ইবনে 'উমর যিনি সাধারণত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (রঃ)[১] নামে সমধিক খ্যাতির অধিকারী—একজন বুযুর্গ ছিলেন। খাওয়ারিযম ছিল তাঁর জন্মভূমি। তিনি তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিক তরীকার সাধন পথের একজন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বুযুর্গকুল শিরোমণি শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ারদীও রূহানী সম্পর্কের দিক থেকে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনে করে এবং স্বীয় মুরশিদের স্থলাভিষিক্ত ও গদ্দীনশীন জেনে তাঁর অত্যন্ত আদব ও সম্মান করতেন। "আওয়ারিফুল মা'আরিফ" (যা এর প্রণেতার যুগের পর থেকে আজ পর্যন্ত তরীকতের আগ্রহী পথিকের জন্য সংবিধান ও সঞ্জীবনী সুধাস্বরূপ) যখন তিনি প্রণয়ন করেন তারপরই তা শায়খ নাজমুদ্দীন (রঃ)-এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি তা পড়ে দেখেন এবং সাধারণ্যে গৃহীত হবারও চিরস্থায়িত্ব লাভের জন্য দু'আ' করেন।

হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন (রঃ)-এর উপর তাওহীদ ও আত্মবিলোপ, মুহব্বতও 'ইশ্কে ইলাহীর পরিবেশেরই প্রাবল্য ছিল। তিনি গোপন রহস্য ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ দরজার অধিকারী ছিলেন। মানাকিবুল আসফিয়ার লেখক বলেন:

---

১. তাঁর উপাধি ছিল কুবরা। যেহেতু ছাত্রাবস্থায় বাহাছ ও বিতর্ক সভায় তিনি প্রতিপক্ষকে সহজেই ঘায়েল করে দিতেন, ফলে তাঁর উপাধি পড়ে যায় الطامة الكبرى (বড় আপদ)। ব্যবহারের আধিক্যে الطامة বাদ পড়ে গিয়ে শুধুমাত্র "কুবরা" থেকে গেছে। দেখুন খাযীনাতুল-আসফিয়া—২৫৯ ;

"তিনি তাওহীদ, মা'রিফাত, তরীকত ও হাকীকতের উসূল ও কায়দা-কানূনের ব্যাপারে অত্যন্ত বিরাট এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে ইশারা-ইঙ্গিত দিতেন। আরবী, ফারসী ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে তাঁর লেখা ছিল প্রচুর। এসব লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে "তাবসিরা" এবং সলুকের তরীকা বর্ণনামূলক একটি ছোট্ট পুস্তিকা সারা ভারতীয় উপমহাদেশে মশহূর ছিল।"

'মানাকিবুল আসফিয়ার' গ্রন্থকার তাঁর কিছু কবিতা এতে উদ্ধৃত করেছেন যার ভেতর 'ইশ্‌ক ও মত্ততার আশ্চর্যজনক অবস্থা, দুঃখ-জ্বালা ও দ্রবীভূত হওয়া এবং পাগলপারা ও আত্ম-নিমগ্নতার আশ্চর্য এক বিশ্ব দৃষ্টি-গোচর হয়।

তিনি ৬১০ হিজরীর ১০ই জমাদিউল আওয়াল খাওয়ারিযম-এ তাতারীদের বিরুদ্ধে পুরুষসিংহের ন্যায় লড়তে লড়তে শাহাদতবরণ করেন। খলীফা-বৃন্দের মধ্যে শায়খ মাজদুদ্দীন বাগদাদী, ('মিরসাদুল 'ইবাদ' প্রণেতার শায়খ) শায়খ সা'দুদ্দীন হামুবিয়া, বাবা কামাল জুনায়দী, শায়খ রাযীউদ্দীন 'আলীলালা, শায়খ সায়ফুদ্দীন বাখরযী, শায়খ নাজমুদ্দীন রাযী, শায়খ জামালুদ্দীন মক্কী এবং মাওলানা বাহাউদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মানাকিবুল আসফিয়া'তে বলা হয়েছে যে, খাজা ফরীদুদ্দীন 'আত্তারও তাঁর মুরীদভুক্ত ছিলেন।[১]

ভারতীয় উপমহাদেশে কুবরোবী সিলসিলার আগমন

হযরত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (রহঃ)-এর তরীকাকে 'তরীকায়ে কুবরোবিয়া' বলা হয়। তিনটি পথে এ তরীকা ভারতবর্ষে পৌঁছে। তন্মধ্যে একটি আমীর সায়্যিদ 'আলী ইবনুশ শিহাব হামদানী কাশ্মীরি (রঃ) (ওফাত ৭৮৬ হিজরী)-এর মাধ্যমে—যিনি শায়খ শরফুদ্দীন মাহমূদ ইবনে 'আবদুল্লাহ্ আল-মাযবেকানীর খলীফা ছিলেন। তিনি আবার শায়খ 'আলাউদ্দীন সিমনানী (রঃ) থেকে ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তিনি তিনটি মাধ্যম ও সূত্রে খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (রঃ) থেকে ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। সায়্যিদ 'আলী হামদানী (রঃ) ৭৭৩ অথবা ৭৮০ হিজরীতে কাশ্মীর আগমন করেন এবং তাঁর ঐকান্তিক তবলীগ ও ফলপ্রসূ চেষ্টা-সাধনার ফলে কাশ্মীরের অধিকাংশ জনবসতি মুসলমান হয়ে যায়। কুবরোবিয়া হামদানিয়ার এ সিলসিলা কাশ্মীরে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে। এই সিলসিলার একজন মহান বুযুর্গ ছিলেন মাওলানা ইয়াকুব সরফী কাশ্মীরি (ওফাত ১০০৩ হিজরী) যিনি স্বীয়

---

১. মানাকিবুল আসফিয়া, ৯৯ পৃষ্ঠা,

যুগে হাদীছ্ ও তাফসীর শাস্ত্রের একজন বড় 'আলিম 'আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী মক্কীর ছাত্র এবং ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (রঃ)-এর শিক্ষকদের অন্তর্গত। এ সিলসিলা কাশ্মীরে এখন পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

কুবরোবিয়া তরীকা ভারতীয় উপমহাদেশে পৌঁছুবার দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল আমীরুল কবীর শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ কুত্‌বুদ্দীন মুহাম্মাদ মাদানী (ওফাত ৬৭৭ হিজরী) যিনি হযরত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (রঃ)-এর অন্যতম খলীফা ছিলেন। তিনি সুলতান কুত্‌বুদ্দীন আইবেকের অথবা সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের যমানায় ভারতবর্ষে আসেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত দিল্লীতে শায়খুল ইসলাম পদে সমাসীন ছিলেন। অতঃপর কড়া (মানিকপুর) জয় করে তিনি সেখানেই বসবাস শুরু করেন।[১] তিনি একই মাধ্যমের খলীফা ছিলেন শায়খ "আলাউদ্দীন জুয়ূরী (ওফাত ৭৩৪ হিজরী)-এর। এ সিলসিলা বড় বড় মাশায়িখ সৃষ্টি করে। এ সিলসিলাই সিলসিলায়ে জুনায়দীয়া নামে দাক্ষিণাত্যের কিছু কিছু অংশে এখনও বিদ্যমান আছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ফিরদৌসিয়া সিলসিলার আগমন

এ সিলসিলারই একটি শাখা ফিরদৌসী নামে পরিচিতি লাভ করে। হযরত খাজা নাজমুদ্দীন কুবরা (রঃ)-এর একজন মহান খলীফা ছিলেন খাজা সায়ফুদ্দীন বাখরযী (রঃ)। এঁরই খলীফা খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ) ফিরদৌসী সিলসিলার মহান বুযুর্গগণের ভেতর সর্বাগ্রে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন[২] এবং এখানে অবস্থান ও বসবাস করা শুরু করেন। ফিরদৌসিয়া তরীকার বুনিয়াদ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

---

১. তাঁর বংশে ভারতীয় উপমহাদেশের বড় বড় 'উলামা, মাশায়িখ ও মুজাহিদ পয়দা হন যাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদ আদম বিন্নূরী (রঃ)-এর খলীফা হযরত শাহ 'আলামুল্লাহ্ নক্‌শবন্দী রায়বেরেলবী, হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (রঃ), হযরত মাওলানা খাজা আহমাদ নাসীরাবাদী (রঃ) অত্যন্ত মশহূর ছিলেন। "নুযহাতুল খাওয়াতির" এর লেখক মাওলানা সায়্যিদ 'আবদুল হাই এ বংশেরই একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

১. হযরত শায়খ রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীর পূর্বে এই সিলসিলার 'ফিরদৌসী' নামকরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণভাবে এই সিলসিলার মহান বুযুর্গগণ এবং তাঁদের সিলসিলাকে 'কুবরোবিয়া' বলা হয়। এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতপক্ষে হযরত শায়খ রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীর সময় থেকে। সেই সময় থেকে এই সিলসিলার বুযুর্গগণ ফিরদৌসী নামে কথিত হন।

খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ)

খাজা বদরুদ্দীন (রঃ)-এর তরীকার বৈশিষ্ট্য ফানা (ধ্বংস ও আত্মবিনাশ) ও আত্মবিলোপ, ইচ্ছাশক্তি ও গ্রহণশক্তি পরিত্যাগ এবং কারামত ও অতি অদ্ভুত কার্যকলাপ জনসমক্ষে গোপন রাখা। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশে চিশতীয়া সিলসিলা সর্বজনগ্রাহ্য ও জনপ্রিয় হতে চলেছিল। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) হেদায়াত ও ইরশাদের মধ্যাহ্ন গগনে দীপ্ত সূর্যের ন্যায় অবস্থান করছিলেন। খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ)-কে এমনই একটি যুগে এবং এমনি এক পরিবেশে এমন একটি তরীকার বুনিয়াদ স্থাপনের কাজ করতে হয় যার মধ্যে সাধারণ সম্প্রীতির সর্বজনগ্রাহ্যতার উপকরণ কম ছিল এবং যাঁর বুযুর্গগণ আধ্যাত্মিক অবস্থার গোপনীয়তাকে প্রকাশ্য অবস্থার উপর আগ্রহভরেই অগ্রাধিকার দিতেন। "মানাকিবুল আসফিয়া" প্রণেতা যিনি নিজেও ফিরদৌসী তরীকার একজন অনুসারী ছিলেন—লিখেছেন,—

"তাঁর তরীকা ছিল শততারিয়া 'ইশকিয়া। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ইল্‌মে দীন হাসিল করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে, আমল করবে খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই। কেননা আমলবিহীন 'ইল্‌ম যেমন কল্যাণবর্জিত, তেমনি ইখলাস (নিষ্ঠা)-বিহীন আমলও ফলপ্রসূ নয়। কারামত (অলৌকিকতা) লাভের প্রত্যাশী হবে না। 'ইবাদত-বন্দেগীতে দৃঢ়তা ও অবিচল নিষ্ঠাই প্রকৃত কারামত। ভারতীয় উপমহাদেশে ফিরদৌসিয়া তরীকার উসূল ও কায়দা-কানূনের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ) এবং তাঁর মহান পীর-মুরশিদগণের হাতে। এর পূর্বে সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট-জনেরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে অত্যদ্ভুত কার্যকলাপ ও কারামতের ভিত্তিতেই পীর-মুরীদী করতেন। জানা যায় যে, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর যমানায় ভারতীয় উপমহাদেশে বহু মুহাক্কিক তরীকতপন্থী ছিলেন, যেমন শায়খুল

মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতার বর্ণনা দৃষ্টেও এটাই প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন: খাজা রুকনুদ্দীন ভারতবর্ষে এরূপ শান-শওকতে আগমন করেন যে, আরব ও আরব-বহির্ভূত অঞ্চলে তাঁর ফয়েয ও প্রভাব পেঁাছে যায়। তিনি স্বীয় তরীকতের পীরদের শেজরার প্রভাব সৃষ্টি করেন এবং "মাশায়িখে ফিরদৌসী" নামে বিখ্যাত হন। এই শেজরার সঙ্গে জড়িত যাঁরা তাঁরা নিজেদের সিলসিলাকে এ নামেই ডেকে থাকেন এবং ফিরদৌসী নামে স্মরণ করেন। বহু পুরনো প্রবাদ: (الالقاب تنزل من السماء ذلك فضل الله يوتيه من يشاء -) আসমান থেকে নাম অবতীর্ণ হয়। এটা আল্লাহর দান, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। মানাকিবুল আসফিয়া, ১২৫ পৃঃ

ইসলাম শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রঃ), শায়খুল ইসলাম শায়খ নাজমুদ্দীন সুগরা (যিনি দিল্লীর শায়খুল ইসলাম ছিলেন), শায়খুল ইসলাম খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ), শায়খুল ইসলাম শায়খ মু'ঈনুদ্দীন সজযী (রঃ)-যিনি খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার (রঃ)-এর পীর ছিলেন। আল্লাহ পাক এঁদের সবার প্রতি রহমত নাযিল করুন। কিন্তু বিশিষ্ট ও সাধারণ জনগণের ধাবমান গতি যে ভাবে হযরত খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ)-এর দিকে ছিল তা ঐ সমস্ত বুযুর্গের কারও প্রতিই তেমন ছিল না। এর কারণ হযরত খাজা কুতবুদ্দীন (রঃ) থেকে অত্যদ্ভুত কার্যাবলী ও কারামত বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হ'ত।''

'মানাকিবুল আসফিয়া'র লেখক তাঁর মিযাজ ও প্রকৃতি এবং তাঁর তরীকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আরও লিখেছেন,

''খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ)-এর ধরন-ধারণ ভারতবর্ষের অপরাপর বুযুর্গের ধরন-ধারণ থেকে আলাদা ছিল। ভারতবর্ষের বুযুর্গগণের অধিকাংশই সংসার-তরণীর কর্ণধার ছিলেন এবং কেউ কেউ রিয়াযত ও মুজাহাদার মধ্যে কাল কাটাতেন। খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ)-এর তরীকা ছিল শত্তারিয়া 'ইশকিয়া তরীকা। এ তরীকার ভিত্তিভূমি ছিল অবলম্বিত ইচ্ছাধীন 'ফানা'র উপর এবং এ তরীকার সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)গণের আমল موتوا قبل ان تموتوا অর্থাৎ ''মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরণ কর''-এর উপর। এটা আল্লাহ্র রাহের এবং রূহানীয়াত গগনের দ্রুত উড্ডয়নগামী পাখী। এই প্রথম পদক্ষেপেই কলহ-কোন্দল অতিক্রম করে যায় এবং জীবনের উপর সহজেই বাযী ধরে। সাধকের বিরাট ব্যাঘ্র-পুরুষ হওয়া আবশ্যক। যারা এ পথে (আধ্যাত্মিক পথে) পদক্ষেপের অভিসারী তারা যেন নিজেকে ''ফানী'' (ধ্বংসশীল) রূপে পরিগণিত করে।''[১]

খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী রাহমতুল্লাহি 'আলায়হি সামা গাইতেন এবং আবেশে বিভোল ও বিহ্বল হয়ে যেতেন। তিনি সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর যুগে ওফাত পান। কোন্ সনে ওফাত পান তার কোন উল্লেখ তাযকিরা গ্রন্থে মেলেনি।[২]

খাজা রুকনুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)

খাজা বদরুদ্দীন সমরকন্দী (রঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন খাজা রুকনুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)। 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতার বর্ণনা মুতাবিক তাঁরা শৈশবেই

১. মানাকিবুল আসফিয়া, ১২৩ পৃঃ

২. নুযহাতুল আসফিয়ার মতে মৃত্যু সন ৭১৬ হিজরী। 'নুযহাতুল খাওয়াতির' লেখকের বিচার-বিশ্লেষণ অনুযায়ী এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'খাওয়াতির'—লেখকের মতে, তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে।

আপনাপন শায়খের প্রশিক্ষণাধীনে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, এবং তাঁদের থেকেই জাহিরী ও তরীকতের তা'লীম হাসিল করেছিলেন, এবং তাঁদের থেকে খেলাফত-নামা প্রাপ্তির পর তাঁদেরই স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁদের যমানা থেকেই এ সিলসিলা ফিরদৌসিয়া সিলসিলা নামে অভিহিত হয়।

শায়খ রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীও আল্লাহ্‌র প্রেমে ও ধ্যানে আবেগ-বিহ্বল হয়ে যেতেন। তাঁর ইন্তিকালও সপ্তম শতাব্দীর শেষে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর যুগেই হয়।[১]

খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)

খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী শায়খ 'ইমাদুদ্দীন দেহলভীর সাহেবযাদা এবং খাজা রুকনুদ্দীন ফিরদৌসীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও খলীফা ছিলেন। তিনি সারাটা জীবনই স্বীয় শায়খ ও বুযুর্গ চাচার খেদমতে কাটিয়ে দেন। অতঃপর তাঁর ওফাতের পর তিনি গদ্দীনশীন হন এবং ফিরদৌসী সিলসিলার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তাওহীদ ও 'ইশকে ইলাহীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এমন একজন মুহাক্কিক, মুজতাহিদ, ইমাম ও তরীকা প্রতিষ্ঠাতাকে তরবিয়ত দান করেন যিনি শুধু যে তাঁর মহান পীরের নামকেই ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে জীবিত রেখেছিলেন তা নয়, বরং অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব ভারতকে স্বীয় রূহানী ফয়েয ও 'ইশকের উত্তাপ ও উষ্ণতা দ্বারা জীবন্ত ও সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং স্বীয় উচচ বিশ্লেষণী শক্তি, মহান মকাম ও দুর্লভ জ্ঞানের ভিত্তিতে 'আঈনুল কুযাত হামদানী (রঃ), খাজা ফরীদুদ্দীন 'আত্তার (রঃ) এবং মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ)-এর স্মৃতিকেই জাগিয়ে তুলেছিলেন। 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :

"তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করাকেই নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ এবং এর সব উপকরণ থেকে তিনি

---

১. 'খাযীনাতুল আসফিয়া' উল্লিখিত তারিখ ৭২৪ হিজরী সঠিক নয়। তার আরও একটি প্রমাণ—এটাও তাঁর খলীফা শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)-এর ওফাত সন সম্মিলিত মতে ৬৯১ হিজরী এবং একথা যুক্তিবিরুদ্ধ যে, তিনি তাঁর খলীফা ও গদ্দীনশীন-এর পরেও ৩৩ বছর বেঁচে থাকবেন এবং হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর খলীফার হাতে বায়'আত করবেন। এজন্য "নুযহাতুল খাওয়াতির" প্রণেতার এই বর্ণনা অত্যন্ত সহীহ ও বিশুদ্ধ মনে হচ্ছে যে, তাঁর ইন্তিকাল সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে হয়েছিল।

ছিলেন মুক্ত। 'আমার আওলিয়াগণ আমার পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে' (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওলীগণ সৃষ্টির চোখে এমনভাবে অবগুণ্ঠিত থাকেন যে, আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউ তার খবর জানতে পারে না)-এর মহান প্রতিভূ ছিলেন তিনি। তাঁর মুরীদগণের মধ্যে বড় বড় 'আরিফ ও মুহাক্কিক 'আলিম ছিলেন। মাওলানা 'আলম আন্দসমী (রঃ)[১] 'ফতওয়ায়ে তাতারখানি' প্রণেতা তাঁর মুরীদ ছিলেন। উচচ আধ্যাত্মিক ভাবধারপুষ্ট কবিতা তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে। খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)-এর সমস্ত কামালিয়াত অন্তরালে ছিল।[২]

---

১. এর অর্থ মাওলানা ফরীদুদ্দীন 'আলম ইবনুল 'আলা হানাফী আন্দরপতী। ৭৭৭ হিজরীতে 'ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া' প্রণয়ন করে স্বীয় দোস্ত আমীরে কবীর তাতার খানের নামে নামকরণ করেন। ফিরুষ শাহ্‌র অভিপ্রায় ছিল যে, সেটা তার নামে নামকরণ করা হবে। কিন্তু তিনি তা কবুল করেন নি। সম্ভবত ৭৮৬ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'নুযহাতুল খাওয়াতির ২য় খণ্ড;

২. মানাকিবুল আসফিয়া, ১২৬ পৃষ্ঠা;

তৃতীয় অধ্যায়

মুজাহাদা, নির্জনবাস, লোকালয়ে অবস্থান এবং ইরশাদ ও প্রশিক্ষণ

দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন

'মানাকিবুল আসফিয়া' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ) বায়'আত করার পর তাঁকে লিখিত ইজাযতনামাও প্রদান করেন। শায়খ শরফুদ্দীন আরয করেন, আমার তো এখনও জনাবের খেদমতে কিছুদিন থাকবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি এবং আমি সুলূক (আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তর)-এর তা'লীমাতও খন পর্যন্ত জনাবের খেদমত থেকে হাসিল করিনি। এ ধরনের গুরুত্ববহ, দায়িত্বপূর্ণ এবং নাযুক কর্ম কিভাবে সম্পাদন করব? খাজা নাজীবুদ্দীন (রঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দেন যে, এই গোটা কারবারটা তো অদৃশ্য হস্তের ইশারায় সাধিত হয়েছে এবং তার তরবিয়ত নবুওতের তরফ থেকে হবে। এরপর তিনি তাঁকে বিদায় দেন এবং বলেন,

"পথিমধ্যে যখন কোন খবর শুনতে পাবে তখন যেন ফিরে না আস।" অতঃপর দুই-এক মনযিল পথই মাত্র অতিক্রম করেছিলেন এমনি সময়ে তিনি হযরত খাজা সাহেব (রঃ)-এর ওফাতের সংবাদ অবগত হন। তিনি ওসিয়ত মাফিক সফর অব্যাহত রাখেন এবং মুনায়র-এর দিকে রওয়ানা হন।[১]

প্রেমের উচ্ছ্বাস

তিনি যখন খাজা নাজীবুদ্দীন (রঃ) থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর অন্তরে বেশ আঘাত লাগে। 'ইশ্‌কে ইলাহী তথা বিভু প্রেমের উত্তাপ তাঁর অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। তিনি বলেন,—

"আমি যখন খাজা নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসীর সঙ্গে মিলিত হলাম তখন থেকেই আমার দীলে একটি ক্লেশ ও ব্যথা এসে আসন গ্রহণ করে যা দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতরভাবে বর্ধিত হতে থাকে।"[২]

---

১. মানাকিবুল আসফিয়া ১৩২-৩৩ পৃঃ

২. ঐ, ১৩৩ পৃঃ

যখন তিনি বেহ্য়া [১] নামক স্থানে পৌঁছেন এবং ময়ূরের ঝংকার শোনেন তখন তাঁর দীলের মাঝে একটি ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে এবং সকল ধৈর্য ও সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। অতঃপর তিনি গিরীবন চক জঙ্গলের পথ ধরেন এবং আত্মগোপন করেন। ভাইসহ সফরের সঙ্গী-সাথীরা অনেক খোঁজা-খুঁজি সত্ত্বেও কোনরূপ সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়। অবশেষে তারা ইজাযতনামা এবং খাজা নাজীবুদ্দীন (রঃ)-এর তাবাররুক নিয়ে ফিরে আসেন এবং এসব কিছুই ওয়ালিদা সাহেবার হাওয়ালা করেন।[২]

রাজগীরের জঙ্গলে

কথিত আছে যে, তিনি বার বছর পর্যন্ত বেহ্য়ার জঙ্গলে কাটান। তখন কেউ তাঁকে জানতেও পারেনি। এরপর তাঁকে রাজগীর[৩]-এর জঙ্গলে দেখা গেছে। কিন্তু কারও সাক্ষাত লাভের সুযোগ ঘটেনি। এই পাহাড় ও জঙ্গলটি প্রতিটি ফিরকা এবং প্রতিটি ধর্মের ও জাতিগোষ্ঠীর রিয়াযতে লিপ্ত সাধক ও 'আবেদ শ্রেণীর লোকদের নির্জন বাসের জন্য প্রসিদ্ধ। গৌতম বুদ্ধও বছরের পর বছর ধরে এখানে বসে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাল কাটান। যে সময় মাখদূম সাহেব (রঃ) এখানে মুজাহাদাহ্ এবং রিয়াযতে মশগুল ছিলেন সে সময় এখানে স্থানে স্থানে হিন্দু যোগীরাও নির্জনবাস করছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে সে সব হিন্দু যোগীদের সঙ্গে তাঁর কতিপয় কথোপকথনের বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের

---

১. বেহ্য়া মুনায়র থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে পশ্চিমে শাহআবাদ' (আরা) জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে এটি ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি স্টেশন।

২. মানাকিবুল আসফিয়া, ১৩৩ পৃঃ

৩. ডক্টর হান্টার গেজেটিয়ার-এ লিখছেন, রাজগীরের পাহাড় দু'টি কেল্লার সমান্তরাল রেখার আকারে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে চলে গেছে—যার মাঝে একটি সংকীর্ণ উপত্যকা রয়েছে—যার স্থানে স্থানে নালা ও গুহা কর্তন করছে। এই পাহাড় যা কোথাও হাযার ফুটের অধিক উচ্চ নয়, বিরাটাকৃতি প্রস্তর খণ্ড দ্বারা মণ্ডিত এবং ঘন ঝোপঝাড় দ্বারা আবৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। প্রাচীনত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। কেননা এর উপর অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মের পুরাতন স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া যায়। জেনারেল কানিংহাম বলেন যে, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (HIVEN TSIANG) যে কপুটিকা (KAPOTIKA) পাহাড়ের উল্লেখ করেছেন তা এটাই। উষ্ণ প্রস্রবণ এখানে বহু। ডঃ বুকানিন হ্যামিল্টন বলেন যে, এই রাজগীরই সেই রাজগৃহ যেখানে গৌতম বুদ্ধের আবাস ছিল এবং যা প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল। নতুন রাজগীরের দুই-তৃতীয়াংশ বর্গমাইল পুরাতন শহর থেকে দূরে অবস্থিত। সীরতুশ্‌শরফ ৬৫-৬৭ সংক্ষিপ্ত;

পাদদেশে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ সংলগ্ন হযরত মাখদূম (রঃ)-এর হুজরা আজও বর্তমান। 'মাখদূম কুণ্ড' নামেও একটি ঝরণা বিখ্যাত হয়ে আছে।

এই বারটা বছরের পুরো সময়কাল তিনি রিয়াযত ও মুজাহাদাহ্, নির্জনবাস ও মুরাকাবা, অত্যাশ্চর্য ও ভবঘুরে অবস্থা এবং আত্মহারা ও অচৈতন্য অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিবাহিত করেন। জঙ্গলের পাতা খাদ্যের কাজ দিত। সে সময়কার কঠোর রিয়াযত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার তিনি স্বীয় মুরীদ কাযী যাহিদকে বলেছিলেন যে, 'আমি যে রিয়াযত করেছি সে রিয়াযত যদি পাহাড় করত তবে সে গলে পানি হয়ে যেত। কিন্তু শরফুদ্দীন কিছুই হ'ল না।'' তাঁর বর্ণিত একটি ঘটনা এবং বলার ধরন থেকে জানা যায় যে, তিনি উক্ত রিয়াযত, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় খুব বেশী তৃপ্ত ছিলেন না। গোসলের একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি 'আযীমত-এর খেলাফ মনে করে শরীয়ত-প্রদত্ত রুখসতের উপর আমল করেন নি। ভীষণ শীতে তিনি ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার কারণে বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই অপ্রয়োজনীয় কষ্টের পুরস্কার এই মিলেছিল যে, সেদিনের ফজরের সালাত কাযা হয়ে গিয়েছিল।[১]

বিহারে বসবাস এবং খানকাহ্ নির্মাণ

সে যুগেই সুলতানুল মাশায়িখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর একজন খলীফা, যাঁর নামও ছিল মাওলানা নিজামুদ্দীন, বিহারে বসবাস করতেন। তিনি মাওলানা নিজাম মওলা নামে মশহূর ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, কেউ কেউ রাজগীরের জঙ্গলে গিয়েছিল এবং মাখদূম সাহেব (রঃ)-এর সঙ্গে তাদের মুলাকাতও হয়েছে তখন তাঁর মনেও সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল। তিনি এবং তাঁর কতিপয় ভক্ত-অনুরক্ত সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মুলাকাত করেন। তিনি মাঝে মধ্যেই জঙ্গলে গিয়ে হযরত মাখদুম (রঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হতেন। মাখদূম সাহেব (রঃ) সত্যের প্রতি তাঁর তীব্র অন্বেষা এবং ইখলাস (একনিষ্ঠতা) দেখে বলেন,—এই জঙ্গল অত্যন্ত বিপদসংকুল ও ভয়াবহ। তোমার আগমনে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। তোমরা শহরেই থাক। আমি জুম'আর দিনে শহরে আসব এবং জামে' মসজিদেই মুলাকাত হবে। লোকজন সবাই এই সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করল। মাখদুম সাহেব (রঃ) জুম'আর দিন শহরে আসতেন এবং এক প্রহর মাওলানা নিজামুদ্দীন

১. সীরতুশ্ শরফ, ৭২ পৃষ্ঠা;

ও তাঁর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কাটিয়ে জঙ্গলে ফিরে যেতেন। একটা দীর্ঘ সময় এভাবেই অতিবাহিত হ'ল। পরে সে সব ভক্ত-অনুরক্তের দল পরস্পরের ভেতর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, এমন একটি জায়গা নির্মাণ করা উচিত যেখানে তিনি জুম'আর সালাত আদায় করার পর কিছুক্ষণ আরাম করতে পারেন। অতঃপর বীরজুন শহর—যেখানে এখন তাঁর খানকাহ অবস্থিত—সেখানে দু'টি ছাপড়া ফেলে দেন তারা। তিনি জুম'আর সালাত আদায় শেষ করে উঠতেন এবং সেখানে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বসতেন। আবার কখনও কখনও দু'একদিন অবস্থান করেও যেতেন। এরপর মাওলানা নিজামুদ্দীন বিহার প্রদেশের সুবেদার (গভর্নর) মাজেদুল-মুল্‌ক-এর অনুমতি নিয়ে স্বীয় হালাল ও পবিত্র অর্থ-কড়ি দিয়ে একটি পাকাপোক্ত ইমারত তৈরি করে দেন। ইমারত নির্মিত হলে সেখানে তিনি একটি দাওয়াত দেন। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর ভক্ত মুরীদবর্গ এতে শরীক হন এবং তাঁরা মাখদূম সাহেব (রঃ)-কে গদ্দীনশীন হবার জন্য দরখাস্ত পেশ করেন। সবার অনুরোধে তিনি এতে রাযী হন।

এই ঘটনা ৭২১ হিজরী থেকে ৭২৪ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়।[১] সময়টা ছিল সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলকের রাজত্বকাল।

৭২৫ হিজরীতে সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত ও রাজকীয় সিংহাসনে সমাসীন হন। তিনি মাশায়িখ, সূফিয়ায়ে কিরাম এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে তাঁদের নির্জনবাস থেকে বাইরের জনজীবনে টেনে আনতে এবং উৎসাহ ও ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রিয় সৃষ্টির খেদমত ও হেদায়াতে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, আর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চেষ্টা-তদবীর চালাতেন। তিনিই হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর প্রিয় খলীফা হযরত খাজা নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী (রঃ)-কে শাহী লশকরের সঙ্গে যেতে বাধ্য করেন। হযরত খাজা (রঃ)-এর অপর খলীফা মাওলানা ফখরুদ্দীন যার্‌রাবী (রঃ) ও মাওলানা শামসুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া (রঃ) প্রমুখকে মিম্বরে উপবেশন করে বক্তৃতাদানে এবং জনগণকে জিহাদে আগ্রহান্বিত করে তুলতে বাধ্য করেন। শায়খ কুত্‌বুদ্দীন মুনাওয়ার হাঁসোভী (রঃ)-কে তাঁর নির্জন আবাস-গৃহ থেকে বের করে দিল্লী ডেকে পাঠান।[২] তিনি যখন গুপ্তচরদের মারফত খবর

১. মওলবী সায়্যিদ জমীরুদ্দীন আহমাদ—'সীরতুশ্‌ শরফ' প্রণেতা বহু কার্যকরণ ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, মাখদূম (রঃ)-এর বসবাসের কাল ৭২১ থেকে ৭২৪ হিজরীর মধ্যবর্তীকাল ছিল। বিস্তারিত—সীরতুশ্‌শরফ ৮১.

২. বিস্তারিত এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর বর্ণনায় গেছে।

পেলেন যে, মাখদূম সাহেব (রঃ) বছরের পর বছর জঙ্গলে কাটানো ও বহিঃ জগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির পর শহরের বুকে পদার্পণ করেছেন এবং লোকজনের সঙ্গে উঠাবসা শুরু করেছেন, তখনই তিনি সুবে বিহারের সুবেদার মাজেদুল মুল্ক-এর নামে ফরমান লিখে পাঠালেন যে, শায়খ (রঃ)-এর জন্য যেন একটি খানকাহ্ নির্মাণ করা হয় এবং রাজগীর পরগণাকে খানকাহ্র দরিদ্র মেহমান ও অভ্যাগতদের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁর হাতে সোপর্দ করা হয়। তিনি যদি তা কবুল না করেন তবে যবরদস্তী করেও যেন কবুল করানো হয়। তিনি এই সঙ্গে একটি বুলগেরীয় মুসাল্লা (জায়নামায) তাঁর খেদমতে পাঠান।

এই শাহী ফরমান মাজেদুল মুল্ক-এর নিকট পৌঁছুলে তিনি হযরত মাখদূম (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেন যে, বাদশাহ্ যা কিছু লিখেছেন—আমার কি সাধ্য যে আমি তা তা'মিল করি। কিন্তু আপনি যদি বাদশাহ্র এই দান কবুল না করেন তবে বাদশাহ্ একে তাঁর নির্দেশের প্রতি ব্যত্যয় ও অবহেলা প্রদর্শন হিসেবে ধরে নেবেন। আর এক্ষেত্রে বাদশাহ্র আচরণ কেমন হবে তা তো সবারই জানা। আল্লাহ্ই জানেন আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে। মাখদূম (রঃ) মাজেদুল মুল্ক-এর মজবুরী ও অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এবং তৎকর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে তা কবুল করেন। কিন্তু সুলতানের ওফাতের পর সুলতান ফিরূয শাহ তুগলক সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি প্রদত্ত জায়গীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[১] খানকাহ্র নির্মাণ শুরু হ'ল এবং অল্প দিনেই এর নির্মাণ সুসম্পন্ন হ'ল। 'সীরতুশ শরফ' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে :

"খানকাহ্র নির্মাণ শুরু হ'ল এবং অতি অল্পদিনেই তা সম্পন্ন হ'ল। মাজেদুল মুল্ক লঙ্গরখানার সমস্ত দরিদ্র অধিবাসী, সূফী সম্প্রদায় এবং শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর মুরীদবর্গকে দাওয়াত করেন। মজলিসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জামাতখানার প্রাঙ্গণে 'সামা' হতে থাকে। একটি আলাদা জায়গা, যেখানে একটি রোয়াক ছিল, মাখদূম (রঃ)-এর জন্য ঠিকঠাক করা হয় এবং বাদশাহ প্রেরিত পূর্বোল্লিখিত বুলগেরীয় মুসাল্লা সেখানে বিছানো হয়। মাখদূম (রঃ) তার উপর উপবেশন করেন। মজলিসে উপস্থিত একজন মুসাফির দরবেশ আপন জায়গা ছেড়ে উঠে মাখদূম (রঃ)-এর হুজরায় প্রবেশ করেন। মাখদূম (রঃ) তার দিকে লক্ষ্য করে বলেন, এই মনযিল (স্থান) ও মকাম তোমাদের। আমি তো

১. মানাকিবুল আসফিয়া ১৩৫ পৃষ্ঠা;

শুধু মাজেদুল মুল্ক-এর হুকুম তা'মিল করছি মাত্র। কেননা 'উলিল আমর' (শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তি)-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর নেই। এখানে যা কিছু রয়েছে তা ফকীর ও দরিদ্র লোকদের জন্য সাদকা। আমি ইসলামের জন্যই তো উপযুক্ত নই, আর এই মুসাল্লার জন্য তো বহু দূরের কথা।"

উক্ত ফকীর বললেন,—

"মাখদূম! আপনাকে খানকাহ্ এবং মুসাল্লার কারণে কেই-বা চেনে। আপনাকে যারা চেনে তারা একমাত্র সত্যের কারণেই চেনে। আমরা যারা এখানে এসেছি তারা একমাত্র আপনার বাতিনী শক্তি এবং আপনারই খাতিরে এসেছি। এখানে আপনার বরকতে ইসলাম প্রকাশ পাবে এবং শক্তি সঞ্চয় করবে।"

মাখদূম (রঃ) বললেন,—

"ফকীরদের যবান দিয়ে যা বের হয় সেটাই ঘটে থাকে।"

উপদেশ ও হেদায়াত প্রদান

তিনি ৭২৪ হিজরী থেকে ৭৮২ হিজরী পর্যন্ত (যে বছরে তিনি ওফাত প্যান) কম-সে-কম অর্ধ শতাব্দীকালেরও অধিক সময় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলকে হেদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের তা'লীম ও তরবিয়ত প্রদানে অতিবাহিত করেন। শায়খ হুসায়ন মু'ঈয্য শাম্‌স বলখীর মতে—এই সময়ের মধ্যে এক লক্ষের অধিক মানুষ তাঁর মুরীদ দলভুক্ত হয় যার ভেতর কতিপয়ের মতে— কম-সে-কম তিনশত জন এমন ছিলেন যাঁরা ওলীয়ে কামিল ও 'আরিফ এবং পরম সত্যের সান্নিধ্যে পৌঁছেছিলেন। কতিপয় হিন্দু ফকীর তথা যোগী-সন্ন্যাসী ইসলাম কবুল করে তাঁরই হাতে কামালিয়াত হাকীকতের দর্জা পর্যন্ত পৌঁছে।

জনগণকে সৎপথ প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ দানের বিরাট বড় মাধ্যম ও কেন্দ্র ছিল তাঁর সেই সব মজলিস যার মধ্যে মাশায়িখে কিরামের দস্তুর মুতাবিক প্রতিটি শ্রেণীর লোকজনের হাযির হবার এবং অনুষ্ঠিত মজলিস থেকে উপকৃত হবার ইজাযত ছিল। ভক্ত-অনুরক্ত ও শিক্ষার্থীর দল এসব মজলিসে শরীক হতেন। কোন লোকের কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকলে জিজ্ঞাসা করত এবং সন্তোষজনক জবাবও মিলত। এসব মজলিসে আলাপ-আলোচনার কোন স্থায়ী এবং নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল না। যা কিছু আল্লাহ্ পাক তাঁর অন্তরে উদয় ঘটাতেন তাই তিনি বলতেন। এই মজলিস গভীর মা'রিফত, হাকীকত এবং তাসাওউফ-এর

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পয়েন্ট ও চুলচেরা বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল হ'ত। যয়েন বদর 'আরাবী "মি'দানুল মা'আনী" নামক তাঁর বাণী-সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন,—

"প্রতিটি মজলিসে এবং প্রতিটি সুযোগ আসা মাত্রই সত্য-সন্ধানী, অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসী মুরীদবর্গ এবং হাযিরানে মজলিস যারা এর সঙ্গে সম্পর্কিত তারা তরীকত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কিংবা শরীয়তের কোন শিক্ষার বিশ্লেষণ করার জন্য দরখাস্ত করত এবং মা'রিফতের গোপন রহস্য কিংবা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত শুনতে চাইত। হযরত মাখদূম (রঃ) প্রত্যেক প্রশ্নকারীর সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতেন এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় তাকে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর উপদেশ ও বাণী বড় বড় সূক্ষ্ম পয়েন্ট এবং অত্যন্ত মূল্যবান উপকারিতা ও সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিষয়াবলীত সমৃদ্ধ হ'ত। প্রত্যেক প্রশ্নকর্তা ও প্রশ্নের অবস্থা মাফিক তিনি এমন বক্তৃতা দিতেন যাতে আনন্দের আমেজ সৃষ্টি হ'ত যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এবং এমন সব মকামের সন্ধান মিলত যা এই সীমাবদ্ধ অনুভূতির জগতে ধারণযোগ্য নয়।

কখনো কখনো দীনিয়াত কিংবা তাসাওউফ সম্পর্কিত কিতাবাদিও মজলিসে পঠিত হ'ত। মাখদূম (রঃ) এক-একটি মসলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। ফিক্হ, উসূলে হাদীছ, তাফসীর, তাসাওউফ সব কিছুর উপরই আলাপ-আলোচনা হ'ত। হাযিরানে মজলিস বিশেষ করে 'উলামায়ে কিরাম এথেকে বেশী উপকৃত হতেন।

উপদেশ প্রদান ও তরবিয়তের দ্বিতীয় মাধ্যম (বিশেষ করে সে সমস্ত লোকের জন্য যারা অন্য কোন জগতে বিরাজ করতেন) ছিল তাঁর লিখিত মকতূবাত (চিঠি-পত্র)। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (রঃ) ভিন্ন (যাঁর মকতুবাত জীবন্ত ও চিরঞ্জীব একটি কীর্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলমে মা'রিফতের একটি মহা-মূল্যবান ভাণ্ডার) সম্ভবত অপর কেউ স্বীয় কলম ও লেখনী শক্তির সাহায্যে এবং চিঠিপত্র ও বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে এতবড় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুদূরপ্রসারী সংস্কার ও তরবিয়তের খেদমত নেননি। শুধুমাত্র তাসাওউফের ভাণ্ডারেই নয়, বরং 'ইলম ও মা'রিফত, বিভিন্ন পয়েন্ট ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্বব্যাপী ভাণ্ডারে মকতূবাতের এ সংকলন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে গোটা ফারসী সাহিত্যে খুব কম পুস্তকই উক্ত পুস্তকের সমতুল্য। উক্ত মকতূবাত হযরত মাখদূম (রঃ)-এর আমলেও সংস্কার, নৈতিক পরিশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং সেই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়াও—যাদের নামে আসলে

চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল—শত শত ব্যক্তি এথেকে কামিল ও মুহাক্কিক শায়খের 'শ্বাস-প্রশ্বাস' ও তাওয়াজ্জুহ্‌র ফায়দা উঠিয়েছে। হযরত মাখদূম (রঃ)-এর ওফাতের পর প্রতিটি শতাব্দীতে হাযার হাযার মানুষ এথেকে ফায়দা হাসিল করেছে। খানকাহ্‌গুলিতে এর দরস দেওয়া হয়েছে, মহান বুযুর্গগণ এর উপর বক্তৃতা দিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাবার পর আজও তার ভেতর এমন তা'ছীর ও স্পন্দন বিদ্যমান যে, মনে হয় লেখক বুঝি এই মাত্র তা লিখেছেন এবং এখনও এর শব্দসমষ্টি ধারালো ফলকের মত অন্তরের এপাশ থেকে ওপাশ বিদীর্ণ করে দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

আত্মবিলুপ্তি

হযরত মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন মুনায়রী (রঃ)-এর সবচেয়ে উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য গুণাবলী যা তাঁর মিযাজ ও রুচিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং যে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তা ছিল অস্তিত্বহীনতা ও আত্ম-বিলুপ্তি যা কঠোর মুজাহাদা ও রিয়াযতের মহোত্তম ফল এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিক (সালিক)-এর জন্য উন্নততর কামালিয়াতের প্রতীক। তাঁর মকতূবাতের প্রতিটি শব্দ এবং তাঁর উপদেশ ও বাণীর প্রতিটি হরফ থেকে এর প্রকাশ ঘটেছে।

কুবরোবিয়া সিলসিলার মাশায়িখে কিরামের এই বিশিষ্ট রীতিনীতি এবং ইমামে তরীকা হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কুবরা (রঃ)-এর এই ছিল উত্তরাধিকার যার তিনি পুরোপুরি ওয়ারিছ হন।

মানাকিবুল আসফিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, এক সময় সে যুগের মাশায়িখে কিরাম একত্রিত হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই যার যার দীলের আরযু ব্যক্ত করেন। শায়খ মাখদূম (রঃ)-এর পালা আসলে তিনি বলেন যে,

"আমার আরযু এই যে, এ দুনিয়ার বুকে আমার নাম-নিশানাও যেন অবশিষ্ট না থাকে এবং পর জগতেও।"

একটি পত্রে স্বীয় ক্রন্দনমুখ অবস্থার প্রতি বিলাপ ও মাতমের জরুরত (প্রয়োজনীয়তা) ও ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা সরাসরি নিজেরই অবস্থা এবং স্বীয় অন্তর্নিহিত স্বরূপেরই প্রতিফলন ও প্রকাশ। তিনি বলেন,—

"আরিফগণের উক্তি যে, আল্লাহ্‌র কসম! পুনরপি আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের জন্য কান্নাকাটির আওয়াজ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোন আওয়াজ নেই। অতএব উচিত এই যে, আজ এই পথের যিনি সিদ্দীক এবং দীন ও ধর্মের নেতা, তিনি বিলাপ ও আহাজারী যেন খাজা উয়ায়েস করনী (রঃ) থেকে শেখেন। হে ভ্রাতঃ! যে প্রতিটি মুহূর্তে নিজের উপর মাতম ও আহাজারী করে না সে এমন একজন দাবিদার যে কিয়ামত সম্পর্কে

গাফিল এবং একজন মৃত লাশ যার অন্তর দুঃখ ও আফসোস দ্বারা পরিপূর্ণ। এটা কেমনতরো মিথ্যা প্রবৃত্তি যে, আজ সবার মস্তিষ্কেই এরই কেনাবেচা চলছে। প্রতিটি ব্যক্তিই এটা চাচ্ছে যে, পার্থিব জাঁকজমক হওয়া দরকার এবং আমাদের প্রদত্ত বিধি-বিধানের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত, উচিত দুনিয়ার সম্পদ, প্রাচুর্য আর মান-'ইয্যতের অধিকারী হওয়া; আবার এসবের সাথে সাথে আল্লাহ্র সঙ্গেও পরিচয়ের সূত্র নিবিড় হওয়া দরকার। আল্লাহ্র কসম! এটা অসম্ভব, হতে পারে না।"

অপর এক পত্রে তিনি যে আত্মহনন, অস্তিত্বহীনতা ও আত্ম-দুশমনীর নসীহত করেছেন তা সরাসরি নিজেরই অবস্থা ও প্রতিচ্ছবি এবং নিশ্চিতভাবেই এ পত্র কামালিয়াতের সেই পর্যায়ে পৌঁছুবার পর লেখা হয়েছিল যে অবস্থায় পেঁৗছানো ব্যতিরেকে আল্লাহ্র বান্দাহ ও তরীকতের কামিল ব্যক্তিগণ তার দাওয়াত প্রদানকে মুনাফিকী এবং لما تقولون ما لا تفعلون (তোমরা কেন তা বল যা তোমরা নিজে কর না)-এর বাস্তবায়ন বলে মনে করেন।

অপর এক পত্রে কোনরূপ ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়াই স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে স্বীয় দুরবস্থা সম্পর্কে তিনি অভিযোগ ও বিলাপ করছেন:

"আমরা দুর্ভাগা, দুর্ভোগ ও বিপদে জড়িয়ে রয়েছি। আমরা দুনিয়ার গুলামী করছি। প্রবৃত্তি ও স্বভাবের দাসত্ব, অলস পথের পৈতা ধারণ এবং স্বভাব ও অভ্যাসের পূজা করা ছাড়া আমাদের কোন কাজ নেই। আর অলস ও গাফিল ব্যক্তিদের খাতায় ছাড়া অন্য কোথাও আমাদের নামও নেই। আল্লাহ্ওয়ালা মানুষের রাস্তায় চলি এবং তাওহীদের অনুসারী বলে আমাদের যে দাবি তা গালভরা বুলি, বাগাড়ম্বর ও অন্ধত্বপনার কারণ ভিন্ন আর কিছু নয়। আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের দুর্ভাগ্যে য়াহুদী, অগ্নিপূজক. গির্জা ও মন্দিরের অধিবাসীরাও আজ লজ্জা পায়।"

হযরত শায়খ মাখদুম (রঃ) থেকে যে মুনাজাত বর্ণিত হয়েছে, তা তাঁর দীলের অবস্থা, আবেগ ও অনুভূতিরই পূর্ণ প্রতিধ্বনি।

এই অস্তিত্বহীনতা ও অস্তিত্ব বিলুপ্তির স্বাভাবিক ও অপরিহার্য পরিণাম এই ছিল যে, মানুষের নিন্দাবাদ ও প্রশংসা বাক্য তাঁর ক্ষেত্রে ছিল সমান। একটি পত্রে তিনি প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই কাহিনী শোনান:

"আল্লাহ্-প্রেমিকগণের সৃষ্টি জগতের প্রশংসা ও স্তুতি এবং নিন্দাবাদ ও প্রত্যাখ্যানে কিই-বা ক্ষতি! তাদের কাছে তো সৃষ্টি জগতের কুৎসা ও স্তুতি

সব সমান। সে ভাল নয়, যে সৃষ্টি জগতের সবার নিকট ভাল এবং মন্দ কিংবা খারাপ সে নয়, যে সৃষ্টিজগতের সবার নিকট মন্দ কিংবা খারাপ। বরং প্রশংসিত জন তিনিই যিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসিত এবং নিন্দিত সেই যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিন্দিত কিংবা মন্দ।"

এই অস্তিত্বহীনতা ও আত্মহারা অবস্থার পরিণতি এই ছিল যে, যদি আল্লাহ্‌র দরবারের মকবুল বান্দাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র যে কায়-কারবার তারই ভিত্তিতে হযরত মাখদূম (রঃ) থেকে অধিক সংখ্যায় কারামত ও অন্যান্য আশ্চর্যজনক কার্যাবলী সংঘটিত হ'ত, কিন্তু তিনি নিজের এই মিযাজ ও অবস্থার কারণে কারামত প্রকাশের প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ করতেন এবং এমন কোন জিনিসকেই তিনি পসন্দ করতেন না যদ্দ্বারা তাঁর মর্তবা ও আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর মকবুল বান্দা হওয়ার কথা প্রকাশ পায়। 'মানাকিবুল আসফিয়া' প্রণেতা লিখেন,—

"যদিও তাঁর সকল কর্মের ভিত্তি ছিল অলৌকিকতা ও কারামতের উপর, তবু কারামত প্রকাশে তিনি ছিলেন নারায। তিনি তাঁর দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থাই প্রকাশ করতেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য কোনরূপ সাহায্যের প্রত্যাশী হ'ত তবে তিনি তাকে মীরান জালাল দেওয়ানার কাছে সোপর্দ করে দিতেন।"[১]

এটা ছিল সেই যুগ যে যুগে বুযুর্গদের কারামত ও অলৌকিকতার আলোচনা চলত ঘরে ঘরে এবং জনসাধারণ একেই আল্লাহ-প্রাপ্তি ও তাঁর মনোনীত বান্দাহ হবার 'আলামত মনে করত।

মানাকিবুল আসফিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, একবার কতিপয় লোক কিছু মৃত মাছি নিয়ে হযরত মাখদুম (রঃ)-এর কাছে আসে এবং বলে যে, বিখ্যাত উক্তি যে الشيخ يحيى ويميت (শায়খ জীবিত করেন এবং মারেন), আপনি হুকুম দিন যেন এ মাছিগুলি জীবিত হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, আমি নিজেই তো মৃতপ্রায় দুর্ভাগা, অন্যকে কি জীবিত করব!

আখলাক ও মহান চরিত্র

সূফিয়ায়ে কিরামের আখলাক ও চরিত্র নবুওতের উজ্জ্বল আলোকমালা দ্বারা সমৃদ্ধ ও আলোকিত হয়ে থাকে। এজন্য ঐ সমস্ত হযরতের চরিত্র ও আখলাক

১. মানাকিবুল আসফিয়া, ১৩৭ পৃষ্ঠা ঃ

সেই মহান ব্যক্তির চরিত্রের প্রতিবিম্ব যে সম্পর্কে কুরআনুল করীমে স্পষ্ট সাক্ষ্য انک لعلی خلق عظیم (নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত) বিদ্যমান। মানাকিবুল আসফিয়া প্রণেতা লিখেছেন :

اخلاق شیخ شرف الدین ما نند اخلاق نبی ص بود۔

অর্থাৎ "শায়খ শরফুদ্দীনের চরিত্র-আখলাক নবী (সাঃ)-এর চরিত্র আখলাকের মতই ছিল।"[১]

তাঁর মতে নবী (সাঃ)-এর চরিত্র দ্বারা ভূষিত হওয়া এবং নবী করীম (সাঃ)-এর মহান জীবন-চরিতের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে সাজানো কতখানি জরুরী ছিল তা তার লিখিত মকতুবাতের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার পরিমাপ করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল স্বয়ং তাঁর নিজেরই অবস্থা যেটাকে একটা মূলনীতি হিসাবে এখানে বর্ণনা করা যাচ্ছে।

"আর প্রকৃত চরিত্র ও আখলাক সেটাই যা তরীকতের জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তাঁরা নিজেদের সকল অবস্থায় শরীয়তের পায়রবী করেন এবং নিজেদের আখলাককে রাসূল করীম (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ (জীবনাদর্শ)-এর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখেন। আর যিনি শরীয়তকে বিশ্লেষণ করেন না তার তরীকত (তাসাওউফ)-এর কিছুই হাসিল হয় না।"[২]

অপর এক পত্রে তিনি বলেন,—

"যিনি যত বেশী শরীয়তের অনুসরণে দৃঢ় হবেন তিনি তত বেশী উত্তম ও মহান চরিত্রের অধিকারী হবেন, আর যিনি যত বেশী উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী হবেন তিনি তত বেশী আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবেন। উত্তম চরিত্র আদম (আঃ)-এর উত্তরাধিকার (মীরাছ) এবং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত তুহ্‌ফা। অতএব অপরিহার্যভাবেই ঈমানদারের পক্ষে উত্তম চরিত্র থেকে অধিকতর উত্তম পদ্ধতি এবং অপর কোন সৌন্দর্য ও অলংকারের বস্তু নেই। আর উত্তম চরিত্র ও আখলাকের হাকীকত আল্লাহ তা'আলার আহকাম পালন এবং তাঁরই প্রেরিত রাসূল (সাঃ)-এর আনীত শরীয়তের অনুসরণ করা। কেননা সারওয়ারে কায়েনাত (সাঃ)-এর সমস্ত কার্যকলাপ ও চলাফেরা সব সময়ই (স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির নিকট) পসন্দনীয় ছিল এবং যে কেউই হুযূর আকরাম (সাঃ)-এর অনুসরণ করে তার উচিত সে যেন তার জীবন ও জিন্দেগী তেমনিভাবে অতিবাহিত করে যেমনিভাবে অতিবাহিত করে গেছেন স্বয়ং রাসূল করীম (সঃ)।"[৩]

---

১. ঐ, ১৩৭ পৃষ্ঠা ; ২. ৫৭তম পত্র ; ৩. ঐ ৫৭তম পত্র,

হযরত শায়খ মাখদূম (রঃ)-এর অবস্থা ও জীবন চরিত্র বলে দেয় যে, তিনি তাঁর চরিত্র ও আখলাকেও নবী করীম (সঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করতে পুরোপুরি কোশেশ করেছেন এবং তাঁর আখলাক, আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগতের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, দয়া ও স্নেহ, মানুষের দোষত্রুটিকে প্রচ্ছন্ন রাখা এবং আল্লাহ্‌র বান্দাহগণের মনকে সান্ত্বনা প্রদান করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হুযূর আকরাম (সঃ)-এর মহান ও উন্নততম চরিত্রের অনুসারী ও একটি বাস্তব নমুনা।

স্নেহ ও করুণা

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমলহৃদয়, আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌গণের অধিকারের বেলায় অত্যন্ত সদয় ও সহানুভূতিশীল, বন্ধুবৎসল এবং শত্রুর প্রতি দয়ালু। 'আরিফ ও আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মকাম ও মর্যাদা এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যা কিছু লিখেছেন তা তাঁরই সত্যিকার চিত্র। তিনি বলেন,

"তাঁর (সূফীর) রহমত ও স্নেহ-রশ্মি প্রত্যেকটি বস্তুর উপরই পতিত ও চমকিত হয়। নিজে খান না, মানুষকে খাওয়ান; নিজে পরিধান করেন না, মানুষকে পরিধান করান। মানুষ তাঁকে যে কষ্ট দেয় তার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না এবং তাদের কৃত জুলুমের প্রতিও দৃষ্টি ফেরান না। তাঁর প্রতি যারা জুলুম করে তিনি তাদেরই সুপারিশকারী হন'। বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশোধ নেন বিশ্বস্ততা দিয়ে আর গালির বদলা নেন শুভ কামনা ও প্রশংসা-গীতির মাধ্যমে। তুমি কি জান তিনি এসব কেন করেন? এজন্য যে, তিনি সব কিছু থেকেই নিরাপদ। তাঁর দীলের খোলা দিগন্ত রেখা থেকে সৃষ্টির প্রতি প্রশান্তি বায়ু ভিন্ন আর কিছুই প্রবাহিত হয় না। স্নেহ ও করুণার ক্ষেত্রে তিনি সূর্যের ন্যায় উদার। তাঁর রশ্মি দোস্তের উপর যেমন চমকিত ও প্রতিফলিত তেমনি প্রতিফলিত দুশমনের উপরও। বিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি হন যমীনের ন্যায়। গোটা সৃষ্টিকূল তাঁর উপর পা রাখে,—করে নিত্য পদদলিত---কিন্তু তিনি কারও সঙ্গে ঝগড়া করেন না,---বিবাদ করেন না। সৃষ্টির উপর অত্যাচার চালাতে তাঁর হাত সংকুচিত হয়। গোটা সৃষ্টি জগতটাই তো তাঁর পরিবার বিশেষ, কিন্তু তিনি কারও পরিবারের সদস্য নন। দানশীলতার ক্ষেত্রে তিনি সমুদ্রের ন্যায় অকৃপণ, দুশমনকে ঠিক তেমনি প্রতিপালন করেন যেমনি করেন দোস্তকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গোটা জগতের উপর করুণা আর স্রেফ করুণা হয়েই তিনি বর্ষিত হন। কেননা তিনি চিরমুক্ত, আযাদ। যা কিছু দেখেন একই জায়গা থেকে দেখেন (অর্থাৎ তামাম মাখলুককে তাঁরই পবিত্র সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মনে করেন)। তাঁর

চোখ সামগ্রিকতার অধিকারীর চোখ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণ দ্বারা গুণান্বিত না হয় তার তরীকতে কোন মরতবা ও মকাম হাসিল হয় না।"[১]

এই করুণা ও স্নেহের পরিণতি এই ছিল যে, আল্লাহ্র কোন বান্দার অন্তরে আঘাত দেওয়া হযরত মাখদূম (রঃ)-এর নিকট ছিল পাপ।

একবার তিনি নফল সিয়াম পালন করছিলেন। এক ব্যক্তি বেশ তোড়জোড় করে তাঁর খেদমতে একটি তুহ্‌ফা নিয়ে আসে এবং বলে যে, আমি অত্যন্ত আগ্রহভরে এটা আপনার খেদমতে এনেছি যেন তা আপনি গ্রহণ করেন। তিনি তখনই সেটা গ্রহণ করেন এবং বলেন,

"সিয়াম ভঙ্গের কাযা আছে, কিন্তু দীল (অন্তর, মন) ভঙ্গের তো কোন কাযা নেই।"

এর অনিবার্য ফল এও ছিল যে, তিনি সাধ্য মত প্রচ্ছন্নতার আড়ালেই আশ্রয় নিতেন এবং কারো সম্পর্কে কোন গুনাহ কিংবা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি অবগত হলে তার ভিন্নতর ব্যাখ্যা দিতেন।

মানাকিবুল আসফিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদিন এক ব্যক্তি আগে বেড়ে গিয়ে ইমামতী করে এবং তিনি তার পেছনে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে কেউ আরয করল যে, এই ব্যক্তি শরাবখোর। তিনি বললেন, সব সময় পান করে না। লোকেরা বলল, সব সময়ই পান করে। জবাবে বললেন, রমযান মাসে পান করে না বোধ হয়।[২]

দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা

হাকীকী মা'রিফত এবং পরিপূর্ণ 'ইশ্‌ক-এর ফল স্বাভাবিকভাবেই উভয় জগতের সঙ্গে অনাসক্তি ও গা বাঁচিয়ে চলা। তিনি মাজেদুল মুল্‌ক-এর সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং তাকে মুহাম্মাদ তুগলকের অসন্তোষ ও রোষবহ্নির হাত থেকে বাঁচাবার তাকীদে খানকাহ্‌র জন্য যে জায়গীর অসন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করেছিলেন তা তিনি দরিদ্রের বন্ধু এবং দয়ার্দ্রচিত্ত বাদশাহ ফিরূয তুগলকের রাজত্বকালে ফিরিয়ে দেন। আর 'সীরতুশ্‌ শরফ'-এর সেই বর্ণনা যদি সত্যি হয়,---হয় সঠিক যা 'মু'নিসুল কুলূব' নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে—তাহলে তিনি দিল্লী গমন করে জায়গীরের বাবত প্রদত্ত পরোয়ানা বাদশাহ্‌কে সোপর্দ

১. ৬৪তম পত্র :
২. মানাকিবুল আসফিয়া, ১৪১ পৃষ্ঠা : সম্ভবত ঘটনাটি রমযান মাসের।

করেন। এরপর খানকাহ্‌র নির্মাণ ও এর বিস্তৃতির ব্যাপারে আর কোন সম্পর্ক রক্ষা কিংবা আগ্রহ দেখান নি। যদি কেউ এ ব্যাপারে তাঁকে কোন পরামর্শ দিত তবে তা তাঁর প্রকৃতিতে বিরূপ ছায়া ফেলত। 'গঞ্জে লা ইয়াখফা' প্রণেতা লিখছেন যে,—

"শায়খ হামীদুদ্দীন (রঃ) মাখদূম শায়খ (রঃ)-এর দোস্ত ছিলেন। নির্জনেও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। একবার অর্ধেক রাত অতিবাহিত হবার পর মাখদূম (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। চাঁদনী রাত। মখদুম (রঃ) বাইরে বের হয়ে আসলেন এবং প্রাঙ্গণে প্রাচীরের নিকটে বসে পড়লেন। শায়খ হামীদুদ্দীনও এক মুহূর্ত বসে থাকলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন,—যদি এই চবুতরা কিছু বেড়ে যায় তবে প্রাঙ্গণ স্পষ্ট ও পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হবে। মাখদূম (রঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমি মনে করছিলাম যে, এই আবছা রাতে ধর্মীয় ব্যাপারে সম্ভবত কোন সমস্যা দেখা দিয়ে থাকবে যার সমাধানের জন্য আপনি এখানে তশরীফ রেখেছেন, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে, আমি ভুল ধারণার ভেতর ছিলাম। আপনি বলছেন, চবুতরা বাড়াও আর এই ফকীর বলছে এই পুতুল ঘরকে বিরান করে দাও।" ১

বুলন্দ হিম্মত

হযরত মাখদূম (রঃ)-এর বড় আরও একটি স্বাতন্ত্র্য এবং তরক্কী ও কামালিয়াত হাসিলের গোপন রহস্য তাঁর পাহাড়সম বুলন্দ হিম্মত ও উন্নত মনোবল যা তাঁর জীবনের অবস্থাদি এবং লিখিত মকতুবাতের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ, বন্ধু-বান্ধব ও খাদেমকুলকে হামেশা উচ্চ সাহস এবং চাহিদার ব্যাপ্তির জন্য উৎসাহিত করেছেন ও তাকীদ দিয়েছেন। নিশ্চিতই এ ব্যাপারে তাঁর আমলও বেশী হবে। একটি পত্রে অত্যন্ত আশা-উদ্যমময় পদ্ধতিতে তিনি উচ্চ সাহসিকতার যে তা'লীম দেন তা হ'ল,

"তুমি যতই ভীরু ও কাপুরুষ হও না কেন, হিম্মত বুলন্দ ও সমুন্নত রাখ। ভ্রাতঃ! পুরুষের হিম্মত কোন বস্তুর সঙ্গেই দুর্বল হয় না। তার হিম্মতের বোঝা আসমান, যমীন, 'আরশ, কুরসী, বেহেশ্‌ত, দোযখ কেউই উঠাতে পারে না।"

১. সীরতুশ শরফ, ১২৮—পৃষ্ঠা ;

ঐসব আল্লাহওয়ালার হিম্মত এমন পাক-পবিত্র এবং এমন প্রশস্ত যে, তার ভেতর জঞ্জাল ও আবর্জনার নাম-নিশানাও থাকে না যেন এ সমস্ত লোক সেখানে উড়তে পারে। এবং কোন দিগন্তই—'রবুবিয়ত-এর দিগন্ত' থেকে অধিকতর পাক এবং কোন ময়দানই ওয়াহ্দানিয়াত তথা একত্ববাদের ময়দান থেকে অধিকতর প্রশস্ত ও বিস্তৃত নেই। পুরুষের হিম্মত কা'বা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসের আশে-পাশে ঘোরাফেরা করে না এবং আসমান-যমীনও তাওয়াফ করে না। সুবহানাল্লাহ্! কতই না অদ্ভূত কাজ! এক ব্যক্তি নিজ জায়গায় বসে রয়েছে; পা দু'খানি আঁচলে টেনে নিয়ে এবং মাথাটা উরু প্রান্তে স্থাপন করে আছে। অথচ তার অবস্থা তো এই যে, তার মস্তক (হিম্মত) স্থান ও কাল অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। কতই না মুবারক সে হিম্মত যা আদম সন্তান ভিন্ন আর কোথাও পাবে না।"

সীরাতুশ্ শরফ প্রণেতা ঠিকই লিখেছেন—

"তাঁর (শায়খ মাখদুম) চোখ সর্বদাই দুষ্প্রাপ্য বস্তুর উপর লেগে থাকত। কেননা প্রাপ্ত দ্রব্য তাঁর নিকট অকিঞ্চিৎকর দৃষ্টিগোচর হ'ত এবং প্রশস্ত মনোবল এবং বুলন্দ হিম্মতের কারণে প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি মুহূর্তে উন্নততর বস্তু তাঁর চোখের সামনে ফিরত।' তিনি অন্যদেরকেও এমনি বিস্তৃত মনোবল ও উন্নত সাহসিকতা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন,—

"যদি উভয় জগতই তোমার দরজায় এনে হাযির করা হয় এবং বলা হয় যে, এ সবই তোমার আয়ত্তাধীন, যেভাবে খুশী ব্যবহার কর—তবু তুমি সতর্ক ও হুঁশিয়ার থাকবে। এমনটি যেন না হয় যে দুনিয়া ও আখেরাতের উর্ধ্বে যে সব বস্তু রয়েছে এর কারণে তা পর্দার অন্তরালে হারিয়ে যায় এবং তদবধি পেঁছুবার সকল রাস্তা ছিন্ন হয়ে যায়।"

তাজরীদ ও তাফরীদ

তাজরীদ ও তাফরীদ-এর অধিবাসীরা সৃষ্টিজগত থেকে সম্পর্কচ্যুতি এবং সত্যপ্রীতির দিক দিয়ে সেই মকাম পর্যন্ত পেঁছে যান যেখানে কোন অপরিচিতের পক্ষে পেঁছা কিংবা তার উচ্চতা অনুভব ও উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বয়ং তিনি নিজের অবস্থার বর্ণনা দেন কিংবা মনযিলের নিশানা না বাতলান তার সন্ধান মেলা ভার। ঐ সব আল্লাহ্ওয়ালার জনসমুদ্রে নির্জনতা অবলম্বন এবং আপন ভুবন সফরের মাধ্যমে মূল্যবান সম্পদ হাসিল হয়,—এবং তারা 'কাজের সাথে হাত এবং বন্ধুর সাথে হৃদয়" (دست بکار و دل بیار)-এর প্রতিচ্ছবি, পথ-প্রদর্শন ও তরবিয়তের কঠিন দায়িত্বে সমাসীন থাকেন এবং নবী করীম (সঃ)-এর আনুগত্যের শান-

তাঁদেরকে হামেশা সৃষ্টিকুলের মধ্যবর্তীতে স্থান দেয়। 'তাজরীদ' ও 'তাফরীদ'' কোন মকামকে বলা হয় এবং যাঁরা এ মকামে পৌঁছে গিয়ে থাকেন তাঁদের অবস্থা কি হয়ে থাকে তা তাঁর নিজের মুখেই শুনুন:

''তাজরীদ' সমস্ত আত্মীয়তা সূত্র ও সম্পর্ক এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত থেকে পৃথক হয়ে থাকে। আর 'তাফরীদ' নিজে নিজেকে পরিত্যাগ করার নাম—ঠিক তেমনি যেন দীলের মাঝে কোনরূপ ধূলিমালিন্য না থাকে, না থাকে পৃষ্ঠদেশে কোন বোঝা; কারো সঙ্গে হিসাব-কিতাবের কোন সম্পর্ক যেমন থাকবে না—তেমনি থাকবে না অন্তরের মাঝে পার্থিব চিন্তা-ভাবনার কোন বাজার কিংবা মেলা, আর সৃষ্টির সঙ্গে তার কোনরূপ কায়-কারবারও থাকবে না। তার হিম্মত তথা সাহসিকতার বাজপাখী 'আরশে মু'আল্লাকেও অতিক্রম করে যাবে এবং উভয় জগত অতিক্রম করে স্বীয় পরম আরাধ্যের সান্নিধ্যে গিয়ে উপনীত হবে। উভয় জগত থাকতে দোস্ত ব্যতিরেকে কোন সন্তুষ্টির কারণ যেন না ঘটে এবং উভয় জগতের অনুপস্থিতিতে দোস্তের সঙ্গী হয়েও যেন অখুশীরও কোন কারণ না ঘটে। একজন প্রিয়ভাজন কত সুন্দরই না বলেছেন; 'আল্লাহ্ সঙ্গে থাকতে কোন ভয়াবহতাই বড় নয়, আর আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর সঙ্গী হয়ে কোন শান্তি ও আরামের উপকরণও শান্তি ও আরামের নয়।' এজন্যই বলা হয়েছে যে, যে কেউই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন থেকে দূরে সরে যায় সে প্রকৃতই দু:খ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে নিপতিত—যদি কয়েকটি দেশের ধনভাণ্ডারের মালিকও সে হয়। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত সে উভয় জগতের বাদশাহ —যদিও রাতের খাবার তার না জোটে।''[২]

অন্য আর এক চিঠিতে তিনি লিখছেন:

''দোস্ত অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও মওজুদ আছেন, আর অন্যরা বিদ্যমান থাকতেও অস্তিত্বহীন। কিন্তু শর্ত এই যে, তুমি গোটা বিশ্ব থেকে পলায়ন করবে এবং নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনবে। দীল (অন্তর)-কে নিজের থেকে উঠিয়ে নিজের থেকেই হাত গুটিয়ে নেবে যেমনি আসহাবে কাহাফ করেছিলেন। নিজের দীলকে কাহাফ (গুহা) বানাবে এবং নিজেরই দীলে এসে নিজেই নিজের উপর জানাযা পড়ে নেবে—নিজের নফসের রাগ ও হিংসা-বিদ্বেষকে নিজের দীল (অন্তর-রাজ্য) থেকে টেনে বাইরে নিক্ষেপ করবে যেন তোমাকে সমগ্র মাখলুকাতের সামনে তুলে ধরা হয় যেমনি আসহাবে কাহাফকে উদ্ভাসিত করে

[২] বাষট্টিতম চিঠি

তুলে ধরা হয়েছিল। (কুরআন শরীফে এতদসম্পর্কিত আয়াত রয়েছে) "যদি তুমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে যাও তবে তুমি পেছনে ভেগে আসবে, আর তোমার অন্তঃকরণ তাদের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়বে যদি তুমি তাদেরকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ কর।"

সৎকার্যে আদেশ এবং মুসলমানদের অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা

তাজরীদ ও তাফরীদের এরূপ সমুন্নত মকাম সত্ত্বেও যেখানে দীলে ধুলি-মালিন্য এবং কোন মাখলুকের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা সম্পর্ক রক্ষার কোনরূপ সুযোগই নেই, সেখানেও তিনি (শায়খ মুনায়রী) আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের অবস্থার প্রতি করুণাশীল ছিলেন এবং মুসলমানদের অবস্থা ও কার্যকলাপের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। আর সেহেতুই তিনি যুগের বাদশাহদের সঙ্গে কখনো কখনো চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন এবং ন্যায়বিচার, ফরিয়াদী ও মজলুমের সাহায্য-সহায়তা এবং তাদের হেফাজতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একবার খাজা 'আবিদ জাফর আবাদীর মাল-মাত্তা হারিয়ে যায়। এতে তিনি সুলতানুশ শারক ফিরূযশাহকে একটি চিঠি লিখেন। এতে তিনি হুযূর আকরাম (সঃ) এবং মহান সাহাবা (রাঃ) বর্ণিত, জালেম ও মজলুমদের সম্পর্কিত---কতিপয় ঘটনা ও হাদীছ উদ্ধৃত করার পর লিখেন:

"আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া যে, আজ সেই মহান শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি যিনি মজলুম ও অসহায়দের আশ্রয় এবং ইনসাফ ও সুবিচার যাঁর দরবার থেকে দুনিয়াবক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি আজ সৌভাগ্যের এমনি এক দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছেন যে সম্পর্কে ইসলামের পয়গম্বর বলেছেন যে, এক মুহূর্তের ন্যায়বিচার ষাট বছরের 'ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"

হযরত শরফুদ্দীন আহমাদ মুনায়রী (রঃ) দীনী 'ইলম হাসিল এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তা'লীম লাভ করেন সোনার গাওয়ে। এজন্য স্বাভাবিক ও সংগত কারণেই তিনি বাংলা এবং সেখানকার অবস্থাদি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং সেখানকার মুসলমানদের অবস্থাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও খোঁজ-খবর নিতেন।

সুন্নতের অনুসরণ

এ পথের সালিক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-বৃন্দ স্বীয় কারামত ও মকামসমূহে যে পরিমাণে উন্নতি করেন তাদের উপর হুযুর (সঃ)-এর প্রেমময়তা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণের গুরুত্ব ও আবশ্যকতাও সেই পরিমাণ দিবালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের সামনে আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছুতে এবং গৃহীত (মকবুল) হতে হলে রাসূল করীম (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ এবং তাঁর আনীত সুন্নত ও শরীয়তের নিকট পরিপূর্ণ আত্মবিলোপ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এ প্রসংগে তাঁর (হযরত মুনায়রী-এর) যে 'আকীদা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল তা তুলে ধরার জন্য নিম্নোক্ত চিঠিটিই যথেষ্ট—

قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

"আল্লাহ পাক বলেন: বল (হে মুহাম্মাদ) যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন" উল্লিখিত বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

এথেকে জানা গেল যে, কতিপয় অযোগ্য নাদান ও বাজে লোক যারা তাদের ভ্রান্ত 'আকীদা, বিশ্বাস ও মূর্খতার কারণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পথ অবলম্বন করে না তারা এই উক্তি অনুসারে অত্যন্ত বদবখত তথা হতভাগা। একজন পথ-প্রদর্শক ব্যতিরেকে সোজা-সরল রাস্তায় নিরুদ্বিগ্ন গতিতে চলা এক কথায় অসম্ভব।

এই মূলনীতির উপর তিনি যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে আমল করতেন এবং সুন্নতে নববী (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে সদাজাগ্রত থাকতেন তার পরিমাপ নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও পাওয়া যাবে:

ঠিক যে দিন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১২১ বছর। তিনি দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। এই অন্তিম মুহূর্তেও পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্প নিয়ে তিনি সুন্নতের অনুসরণে শেষ ওযূ করেন। শায়খ যঈন বদর 'আরাবী ওফাতনামায় লিখেন:

"তিনি বদন মুবারক থেকে জামা খুলে ওযূর নিমিত্তে পানি চাইলেন, আস্তিন গুটিয়ে মিসওয়াকের জন্য হাত বাড়ালেন এবং সজোরে বিসমিল্লাহ উচ্চারণপূর্বক ওযূ শুরু করলেন। তিনি ওযূ করতে গিয়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোঁয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ দু'আ'-দরূদ পড়ে চলছিলেন। কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন, কিন্তু মুখমণ্ডল ধুতে ভুলে গেলেন। শায়খ খলীল তাঁকে এ

ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি পুনরায় গোড়া থেকে ওযু করতে শুরু করলেন। বিসমিল্লাহ ও দু'আ'-দরূদ পূর্বের ন্যায়ই প্রতিটি নতুন স্থান ধৌতের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে পড়ছিলেন আর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিস্ময় প্রকাশ করছিল, যে এরূপ অবস্থাতেও তিনি এতখানি অভিনিবেশের পরিচয় দিচ্ছেন। কাযী যাহিদ ডান পা ধোয়ার ব্যাপারে একটু সাহায্য করবার মানসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সে হাত ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—'থাম।' তারপর নিজে নিজেই ওযু সমাপন করলেন। অতঃপর চিরুনী চেয়ে নিয়ে দাড়ী সুন্দররূপে আঁচড়ালেন, জায়নামায নিলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।''[১]

সুন্নাতে নববী অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অভ্যাসের বশেই তিনি বিদ'আতের প্রতি ছিলেন বিদ্বেষী। বিদ'আতের ক্ষেত্রে তিনি এতখানি সতর্ক ও সাবধানী ছিলেন যে একবার তিনি বলেছিলেন----

''এখানে অথবা অন্য কোনখানেই হোক না কেন, সুন্নত ও বিদ'আত সামনে আসা মাত্রই সুন্নতকে পরিত্যাগ করা উত্তম হবে যদি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়।''[২]

---

১. মঈন বদর 'আরাবীকৃত ওফাতনামা থেকে;

২. খানপুর নে'মত তৃতীয় মজলিস, চতুর্থ অধ্যায়ের ফারসী উদ্ধৃতির তরজমা প্রিয় বন্ধু সূফী মুহাম্মাদ হুমায়ন সাহেব এম. এ.-র লিখিত যার জন্য গ্রন্থকার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

পঞ্চম অধ্যায়

ওফাত

হযরত মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (র:)-এর জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁর কামালিয়াত এবং উচচ মকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু তাঁর সমসাময়িক জীবনীকাররা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা মোটেই যথেষ্ট নয়। অবশ্য তাঁর ইন্তিকালের বিবরণ যা তাঁর খাস খলীফা ও এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ্যদর্শী শায়খ যঈন বদর 'আরাবী লিপিবদ্ধ করেছেন তাও যদি সংরক্ষিত থাকত, তাহলেও তা তাঁর মর্যাদা ও মরতবা পরিমাপ করার জন্য কিছুটা যথেষ্ট হ'ত। ইসলামী ইতিহাসের কতিপয় মহান বুযুর্গ ও ইমামের ওফাতের ঘটনাবলী এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ও মৃত্যুকে খোশ আমদেদ জানাবার বিবরণ এমনিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এথেকে সে সমস্ত মহান ব্যক্তির মর্যাদা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক, ঈমান ও একীনের পরিমাপই শুধু হয় না-বরং তা থেকে ইসলামের সত্যতাও দিবালোকের ন্যায় জন-সমক্ষে ভেসে ওঠে। কোন উম্মত ও জাতিগোষ্ঠীর মহান বুযুর্গ কিংবা কোন ধর্মের মহান নেতৃবৃন্দের শেষ জীবনের ঘটনাবলী ও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের বৃত্তান্ত এতখানি প্রভাব সৃষ্টিকারী, ঈমানের আলো বর্ধক ও আবেগ-উদ্দীপক নয় যতখানি ইসলামের মহান ব্যক্তিদের ঘটনাবলী বিশুদ্ধ ইতিহাস আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে।

হযরত মাখদূম মুনায়রী (র:)-এর ওফাতের যে বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে তাঁর নজীরবিহীন দৃঢ়তা, শরীয়তের পূর্ণ অনুসৃতির ব্যাপারে আবেগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা, উম্মতে মুহাম্মাদী (স:)-এর জন্য চিন্তা-ভাবনা, ইসলাম-অনুসারীদের জন্য দরদ ও ভালবাসা, কল্যাণ কামনা এবং জীবনের নাযুক মুহূর্তেও তাদের চিন্তা ও তাদের জন্য দু'আ', আল্লাহ পাকের রহমতের আশাবাদ, সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার সঙ্গে সেই মহান সত্তার পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভীতি, ঈমানের নিরাপত্তা, উত্তম পরিণাম লাভের চিন্তা ও সতর্ক মনোযোগই প্রকাশ পায়।

হযরত শায়খ যঈন বদর 'আরাবী বলেন:

"সেদিন ছিল বুধবার। ৭৮২ হিজরীর ৫ই শওয়াল তারিখে আমি তাঁর খেদমতে হাযির হলাম। ফজরের সালাত আদায়ের পর তিনি মালিকুশ্‌শারক

খাজা নিজামুদ্দীন খাজা মালিক নির্মিত নতুন হুজরায় তক্তপোশের উপর বালিশ হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সহোদর ভ্রাতা শায়খ জলীলুদ্দীন, খাস খাদেম এবং আরও কতিপয় বন্ধুবান্ধব ও খাদেম যারা হযরত শায়খ মুনায়রী (রঃ)-এর খেদমতের জন্য পরপর কয়েক রাত ধরে জাগ্রত ছিলেন—তাঁদের মধ্যে কাযী শামসুদ্দীন, মাওলানা শিহাবুদ্দীন (যিনি ছিলেন খাজা মীনার ভাগিনা), মাওলানা ইবরাহীম, আমূ কাযী মিঞা, হেলাল ও 'আকীক এবং আরও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তিনি পবিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আজীম।" অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের দিকে মুখ করে বললেন,—তোমরাও বল। সবাই এ হুকুম তা'মিল করল এবং সবাই পড়ল—'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আজীম।' অতঃপর মুচকী হেসে বিস্ময়ের সুরে বললেন, সুবহানাল্লাহ ! অভিশপ্ত শয়তান এ মুহূর্তে তাওহীদের মসলার ক্ষেত্রেও আমার পদস্খলন ঘটাতে চায়,—করতে চায় বিভ্রান্ত। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ ও কৃপা, তার দিকে আমি কীভাবে দৃষ্টিপাত ও লক্ষ্য করতে পারি। অতঃপর তিনি 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আজীম' পড়তে শুরু করলেন এবং উপস্থিত সবাইকেও বললেন, তোমরাও পড়। এরপর তিনি নিজে দু'আ'-দরূদ ও ওজীফার ভেতর মশগুল হয়ে গেলেন। চাশ্‌তের সময় তিনি এ থেকে ফারেগ হলেন। কিছু বিলম্বের পর তিনি আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানার ভেতর মশগুল হলেন, সজোরে 'আলহামদু লিল্লাহ' 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়তে লাগলেন,—বলে চললেন 'আলহামদু লিল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' 'আল-মিন্নাতু লিল্লাহ্' 'আল-মিন্নাতু লিল্লাহ।'

এরপর হযরত মাখদূম (রঃ) হুজরা থেকে হুজরার প্রাঙ্গণে আসেন এবং তাকিয়ার (বালিশ) আশ্রয় নেন। অল্পক্ষণ পরেই হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিলেন যেন তিনি মুসাফাহা করতে চাচ্ছেন। তিনি কাযী শামসুদ্দীনের হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে রাখলেন। অতঃপর তার হাত ছেড়ে দিলেন। খাদেমদের বিদায় করার পালা তার থেকেই শুরু হ'ল। অতঃপর কাযী যাহিদের হাত ধরে নিজের পবিত্র বুকের উপর স্থাপন করলেন এবং বললেন,—আমরা তো সেই—আমরা তো সেই ; অতঃপর বললেন, আমরাই সেই দিওয়ানা, আমরাই সেই পাগল। এরপর বিনয়-নম্রতা ও দীনতার একটা বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ পেল এবং তিনি বললেন—না, বরং আমরা তো সেই দিওয়ানাদের জুতার ধূলি। অতঃপর প্রতিটি উপস্থিত ব্যক্তিকে ইশারা করলেন এবং প্রত্যেকের হাতে ও দাড়ীতে চুমো দিলেন,—আল্লাহ তা'আলার রহমত ও

মাগফিরাতের আশাবাদী হবার জন্য তাকীদ করলেন এবং বুলন্দ আওয়াজে পড়লেন—

لا تقنطوا من رحمة الله - ان الله يغفر الذنوب جميعا -

"তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন।" অতঃপর এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন,—

خدایا رحمتت دریائے عام است

ازانجا قطرۂ بر ما تمام است

এরপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কাল যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় তাহলে বলবে,—'লা তাকনাতূ মির-রাহমাতিল্লাহ' নিয়ে এসেছি। যদি আমাকেও বলা হয়—তাহলে আমিও তাই বলবো। এরপর কলেমায়ে শাহাদাত বুলন্দ আওয়াজে পড়তে শুরু করলেন—

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله -

অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ'ও পড়লেন,—

رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا و بالقران اماما و بالكعبة قبلة و بالمؤمنين اخوانا و بالجنة ثوابا و بالنار عذابا -

অর্থাৎ "আমি আল্লাহ পাককে আমার 'রব' হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা ও জীবন-দর্শন) হিসাবে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নবী, কুরআন পাককে ইমাম, পবিত্র কা'বাকে কেবলা, মু'মিনদেরকে ভাই, জান্নাতকে আল্লাহ্-দত্ত পুরস্কার এবং জাহান্নামকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হিসাবে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি সহকারে মেনে নিচ্ছি।"

এরপর অযোধ্যার মাওলানা তকীউদ্দীনের দিকে লক্ষ্য করে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন,—পরিণাম ও কল্যাণ শুভ হউক। অতঃপর পবিত্র মুখে ডাক দিলেন,—আমূ! মওলানা আমূ ছিলেন হুজরার অভ্যন্তরে। তিনি ডাক শোনা মাত্রই—'এইযে আমি' বলে দৌড়ে আসলেন। তিনি তার হাত ধরলেন এবং তার পরশ নিজের চেহারা মুবারকের উপর বুলাতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন,—তুমি আমার অনেক খেদমত করেছ। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করবো না। সম্পর্ক গভীর ও গাঢ় রেখ, তাহলে আমরা একত্রে

সহাবস্থান করতে পারব। যদি কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হয়—কি এনেছ? তবে বলবে,

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا-

যদি আমাকেও জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে আমিও এই জবাবই দেব। বন্ধু-বান্ধবদের বল,—ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে। আমার সম্মান ও মর্যাদা যদি সেদিন রক্ষা পায় (অর্থাৎ জাহান্নামের হাত থেকে বেঁচে যদি জান্নাত লোকের অধিকারী হবার সার্টিফিকেট লাভ করতে পারি) তবে আমি কাউকেই পরিত্যাগ করব না। এরপর হেলাল ও 'আকীকের দিকে লক্ষ্য করে বললেন,—তোমরা আমাকে অত্যন্ত খুশী-খোশালীতে রেখেছ,—আমার বিরাট খেদমত করেছে। আমি যেমনটি তোমাদের উপর খুশী ছিলাম,—তোমরাও তেমনি খুশী হবে এবং খুশী থাকবে সর্বদাই। তিনবার স্বীয় হাত মিঞা হেলালের পিঠের উপর রাখলেন এবং বললেন, সফল ও ভাগ্যবান থাকবে। সে সময় তাঁর দু'খানা পা'ই মিঞা হেলালের কোলে ছিল আর তার উপর তিনি বড়ই মেহেরবান ছিলেন।

ইতিমধ্যে মাওলানা শিহাবুদ্দীন নাগোরী আসেন। তিনি কয়েকবার তার মাথা, মুখমণ্ডল, দাড়ী ও পাগড়ীতে চুমো খেলেন। তিনি আহ্! আহ্! সূচক আনন্দ-ধ্বনি করছিলেন আর 'আলহামদুলিল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে যাচ্ছিলেন। তিনি হাত নামিয়ে নেন—এবং দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন। মাওলানা শিহাবুদ্দীনের নজরও ছিল হযরত মাখদূম (র:)-এর চেহারা মুবারকের উপর এবং তিনিও দরূদ শরীফ পড়ছিলেন। এরপর তিনি মাওলানা শিহাবুদ্দীন-এর ভাগিনা খাজা মুঈন-এর নাম নেন এবং বলেন, আমার বিরাট খেদমত করেছে আর আমার সঙ্গে তার ঐক্যও ছিল। অত্যন্ত সুন্দরভাবে সে আমার সাহচর্যে কাটিয়েছে। তার পরিণামও শুভ ও কল্যাণময় হোক। এই সময় মাওলানা শিহাবুদ্দীন মওলানা মুজাফফর বলখী ও মাওলানা নাসিরুদ্দীন জৌনপুরীর নাম নেন এবং বলেন,—এ দু'জনের সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি? তিনি অত্যন্ত খুশীভরে মুচকী হেসে এবং নিজের সকল অঙ্গুলী দ্বারা সিনা মুবারকের দিকে ইশারা করে বললেন,—মুজাফফর আমার প্রাণ-প্রতীম, আমার প্রিয়। মাওলানা নাসিরুদ্দীনও ঠিক তেমনিই। খেলাফত ও ইকতেদা গ্রহণের জন্য যে সব শর্ত ও গুণাবলী অপরিহার্য তা এ দু'জনের মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। আমি যা কিছু বলেছি তা এই গরীবদেরকে সৃষ্টির ফেতনা থেকে হেফাজত

করবার স্বার্থেই বলেছি।[১] এই সুযোগে মাওলানা শিহাবুদ্দীন কিছু পেশ করে আরয করলেন, মাখদূম! এটি কবুল করুন। তিনি বললেন,—আমি কবুল করলাম। এটা কি, আমি তো তোমার সারা ঘর-বাড়ীই কবুল করে নিয়েছি। এরপর তাদেরকে টুপী প্রদান করা হ'ল। তারা পুনরপি বায়আতে হবার দরখাস্ত পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এইসব চলাকালীন কাযী মীনা হযরত মখদূম (রঃ)-এর খেদমতে এসে হাযির হলেন। মিঞা হেলাল পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আরয করলেন,—ইনি কাযী মীনা। 'কাযী মীনা! কাযী মীনা!' কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। কাযী মীনা বললেন,—আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি এবং হাতে চুমো দিলেন। তিনি তার হাত স্বীয় চেহারা মুবারকে, দাড়ীতে এবং গণ্ডদেশের উপর বুলিয়ে নিলেন এবং বললেন,—তোমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক! ঈমানের সঙ্গে থাকো আর ঈমানের সঙ্গেই দুনিয়া থেকে বিদায় নাও। স্নেহের সুরে এও বললেন, মীনা তো আমাদের। ইতিমধ্যে মওলানা ইবরাহীম আসলেন। হযরত মাখদূম (রঃ) তার দাড়ীতে স্বীয় ডান হাতের পরশ বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি আমার অতি উত্তম খেদমত করেছ এবং আমায় পরিপূর্ণ সঙ্গ দান করেছ। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে থাকবে। মাওলানা ইবরাহীম আরয করলেন,—মাখদূম![২] আপনি কি আমাতে সন্তুষ্ট ও রাযী আছেন। বললেন,—হাঁ! আমি তোমাদের সবার উপর সন্তুষ্ট ও রাযী আছি। তোমাদেরও আমার উপর রাযী হওয়া দরকার। যা কিছু আছে সবই আমার পক্ষ থেকে। এরপর কাযী শামসুদ্দীনের ভাই কাযী নূরুদ্দীন হাযির হন। তিনি কাযী নূরুদ্দীনের হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে তার দাড়ী চেহারা, গণ্ডদেশ ও হাতের উপর বার কয়েক চুমো দেন। আনন্দের সঙ্গে তিনি আহ্! আহ্! করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন,—তুমি আমাদের সাহচর্যে খুব থেকেছ আর আমাদের খেদমতও করেছ খুব। আল্লাহ চাহে তো কাল (বেহেশতে) একই জায়গায় আমরা থাকবো। এরপর মাওলানা নিজামুদ্দীন কোহী হাজির হন। তিনি টুপী মুবারক নিজের মাথা থেকে নামিয়ে তাকে দান করেন এবং উত্তম ফল লাভের জন্য দু'আ' করলেন। বললেন,—আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মন্‌যিলে মকসূদে পৌঁছিয়ে

১. এখানে জানা যায় নি কোন ঘটনার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. এখানে মুদ্রিত এবং হাতে লেখা কপিতে الیباض। صبح শব্দটি রয়েছে। সম্ভবত এর অর্থ হবে আজ ভোরবেলা।

দিন। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে লক্ষ্য করে বললেন,—বন্ধুগণ! যাও, স্বীয় দ্বীন ও ঈমানের উপর কায়েম ও মশগুল থাকো।

এরপর লেখক যঈন বদর 'আরাবী তাঁর হস্ত মুবারকে চুমো দিলেন। স্বীয় চক্ষু, মাথা ও শরীরে তার পরশ বুলিয়ে নিলেন। হযরত মাখদূম (রঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি আরয করলাম, আপনার আস্তানার ভিখারী আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং আরয করছে যে, আমাকে নতুনভাবে আপনার গুলামীতে কবুল করা হোক। তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, যাও! তোমাকেও কবুল করলাম। তোমাদের ঘর ও পরিবারবর্গের সকল সদস্যকেও কবুল করলাম। ঘনিষ্ঠ ও সুসম্পর্ক কায়েম রেখ। যদি আমার 'ইয্যত-আবরূ রক্ষা পায় তাহলে আমি কাউকেই পরিত্যাগ করবার বান্দা নই। আমি আরয করলাম---মাখদূম যিনি তিনি তো খেদমত পাবেনই। মাখদূমের গুলামদেরও মান-সম্ভ্রম আছে। বললেন,—আশা তো অনেকখানিই।

কাযী শামসুদ্দীন আসলেন এবং হযরত মাখদূম (রঃ)-এর পার্শ্বে উপবেশন করলেন। মওলানা শিহাবুদ্দীন, হেলাল ও 'আকীক আরয করল যে, মাখদূম! কাযী শামসুদ্দীন সম্পর্কে আপনার কী হুকুম? তিনি বললেন,—কাযী শামসুদ্দীন সম্পর্কে আর কী বলবো। কাযী শামসুদ্দীন তো আমার সন্তান, কয়েক জায়গায় তাকে আমি সন্তান লিখেছি। চিঠিপত্রে তাকে আমি আমার ভাইও লিখেছি। তার জ্ঞানবত্তা ও দরবেশী জীবন প্রকাশের ইজাযত হয়ে গেছে। তারই খাতিরে এত কিছু বলা ও লেখার সুযোগ এল। তা না হলে এসব কে লিখতো?

এরপর ভাই ও বিশিষ্ট খাদেম শায়খ খলীলউদ্দীন যিনি পাশেই বসেছিলেন তাঁর হাত ধরলেন। হযরত মাখদূম (রঃ) তার দিকে ফিরলেন—এবং বললেন, খলীল! সুসম্পর্ক কায়েম রেখ। তোমাকে উলামা ও দরবেশরা ছাড়বে না। মালিক নিজামুদ্দীন খাজা মালিক আসবে। তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। আমার তরফ থেকে ওযরখাহী করবে এবং বলবে যে, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, সন্তুষ্টচিত্তে যাচ্ছি। তোমরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট থেকো। আরও বললেন যে, যতদিন পর্যন্ত মালিক নিজামুদ্দীন আছে—তোমাকে ছাড়বে না।

শেখ খলীলউদ্দীন অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন। চোখে ছিল অশ্রুর বন্যা। হযরত মাখদূম (রঃ) যখন তাকে অন্তর-মন বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখলেন, তখন অত্যন্ত স্নেহভরে বললেন, সম্পর্ক বজায় রেখ আর অন্তর-মনকে শক্ত করো।

এরপর তিনি বললেন, কে? প্রত্যুত্তরে হেলাল আরয করল, মওলানা মাহমুদ সূফী– এতে তিনি গভীর আফসোস ও পরিতাপের সাথে বললেন,—বেচারা বড় গরীব। তার জন্য আমার বড় চিন্তা,– বেচারার কেউ নেই। এরপর তিনি তার শুভ পরিণতির জন্য দু'আ' করলেন। এরপর খেদমতে হাযির হলেন কাযী খান খলীল। হযরত মাখদূম (রঃ) বললেন,—বেচারা কাযী আমার বহু পুরনো দোস্ত,—আমার সাহচর্যে বহু দিন কাটিয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তার পরিণতি শুভ হোক। তার সন্তানও আমাদের দোস্ত। সবার পরিণাম ফলই শুভ ও কল্যাণবহ হোক এবং আল্লাহ তা'আলা দোযখের আগুন থেকে রেহাই দিন।

এরপর খাজা মু'ইয্যুদ্দীন হযরত মাখদুম (রঃ)-এর খেদমতে তশরীফ রাখেন। তিনি তারও কল্যাণ ও শুভ কামনা করলেন। অতঃপর মাওলানা ফযলুল্লাহ কদমবুসী করেন। ভালো, ভালো, আল্লাহ পরিণাম ফল শুভ করুন,—বললেন হযরত মাখদুম (রঃ)। ফতুহ নামক বাবুর্চি কাঁদতে কাঁদতে আসল এবং পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, বেচারা ফতুহা যা কিছু এবং যেমনটি ছিল আমারই ছিল। তার জন্যও কল্যাণকর দু'আ' করলেন, এরপর মাওলানা শিহাবুদ্দীন কদমবুসী করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হেলাল এই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন—যে ইনি হাজী রুকন উদ্দীনের ভাই মাওলানা শিহাবুদ্দীন। তিনি তারও শুভ পরিণতির জন্য দু'আ' করলেন এবং বললেন, ঈমান তাজা রেখ, আর আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হয়ে পড়বে—

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا -

কিছুক্ষণ পর জোহরের কাছাকাছি সময়ে সায়্যিদ জহীর উদ্দীন স্বীয় চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে হযরত মাখদুম (রঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। তিনি তাকে একেবারে কোলের ভিতর টেনে নিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও করুণাভরে বল-লেন, আমি যে পরিণাম! পরিণাম! বলছিলাম—তা এই। এরপর তিনবার তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং শেষ বার এই আয়াত পড়লেন:

لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا -

তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাতের প্রত্যাশী ও প্রার্থী করে তুললেন। এরপর সেখান থেকে উঠলেন এবং হুজরাতে তশরীফ নিয়ে গেলেন সায়্যিদ জহীর উদ্দীনের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ বসলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সাথে আলাপও করলেন। এরপর

খলীলের ভাই মুনাওয়ার আরয পেশ করেন যে, আমি আপনার হাতে তওবাহ করতে ও বায়'আত হতে চাই। তিনি তাকে এস বলে ডেকে নিলেন এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তওবাহ ও বায়'আত হওয়ার সুযোগ দানে ধন্য করলেন। অতঃপর একটি কাঁচি চেয়ে পাঠালেন! কাঁচি দিয়ে তাঁর চুল কাটালেন ও টুপি পরিয়ে দিলেন এবং বললেন যাও! দু'রাকাত সালাত আদায় করে এস। ঠিক এমনিভাবে তার পুত্রকেও তিনি বায়'আত করেন এবং তার প্রতিও ঐ একই আদেশ দেন।

ইতিমধ্যেই মাওলানা নিজামুদ্দীন মুফতীর ভাই কাযী 'আলম আহমাদ মুফতী যিনি ছিলেন বিশিষ্ট মুরীদবর্গের অন্যতম—আসেন এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হযরত মখদূম মুনায়রী (রঃ)-এর সামনে উপবেশন করেন। এরই মাঝে মালিক হুস্সামুদ্দীনের ভ্রাতা আমীর শিহাবুদ্দীন স্বীয় পুত্রসহ তাঁর খেদমতে হাযির হন এবং এসে উপবেশন করেন। হযরত মুনায়রী (রঃ)-এর পবিত্র দৃষ্টি তার প্রতি পতিত হতেই বললেন—কুরআনুল করীমের পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করতে পারবে? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আরয করল—ছেলে এখনও ছোট। সায়্যিদ জহীর উদ্দীন মুফতীর পুত্রও হাযির ছিল। মিঞা হেলাল যখন দেখলেন, এই মুহূর্তে তাঁর কালামে রব্বানী শোনার আগ্রহ খুব বেশী, তিনি তক্ষুণি ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন এবং পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাতে নির্দেশ দিলেন। সায়্যিদ জহীর উদ্দীনও যখন অনুভব করলেন যে, মাখদূম মুনায়রীর (রঃ) তবিয়ত মুবারক কুরআন মজীদ শুনতে খুবই আগ্রহী তখন স্বীয় পুত্রকে কুরআন মজীদের পাঁচটি আয়াত পড়তে ইশারা করলেন। ছেলেটি সম্মুখে এসে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে উপবেশন করল। সে সূরা আল-ফাতহার শেষ রুকূ'র আয়াত محمد رسول الله والذين امنوا থেকে তেলাওয়াত শুরু করল। হযরত মাখদূম (রঃ) তাকিয়া হেলান দিয়ে আরাম করছিলেন, উঠে বসলেন এবং চিরন্তন প্রথা মুতাবিক অত্যন্ত আদবের সঙ্গে দু'হাটু মিলিয়ে বসে গেলেন, আর গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন মজীদ শুনতে লাগলেন। ছেলেটি যখন ليغيظ بهم الكفار পর্যন্ত গিয়ে পেঁাছল তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। ফলে তার পক্ষে সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তিনি তাকে পরবর্তী শব্দগুলি শিখিয়ে দিলেন। ছেলেটি যখন কেরাত খতম করল তখন তিনি বললেন—খুবই ভাল পড়ে আর মাখরাজও আদায় করে ভাল, কিন্তু ভয় পেয়ে যায়। এ সময় তিনি একজন পশ্চিমা দরবেশের কথা উত্থাপন করলেন। ঐ দরবেশের তবিয়ত যখন ভাল থাকতো তখন তিনি কুরআন শরীফ শুনতে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠতেন। আর যখন তার তবিয়ত ভাল যেত না—তখন তিনি কুরআন শুনতে আগ্রহী হতেন না।

এরপর কাযী 'আলমের প্রতি শরবত ও পান দেবার হুকুম হ'ল এবং ওযর-খাহী করলেন (এতক্ষণে না দিতে পারায়)। তিনি শরীর থেকে পিরহান (জামা) খুলতে চাইলেন, এবং চাইলেন ওযূ সম্পাদনের জন্য পানি। আস্তিন গুটিয়ে তিনি মিসওয়াক চাইলেন, সরবে বিসমিল্লাহ পড়লেন এবং ওযূ শুরু করলেন। প্রতিটি নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করবার ক্ষেত্রে যে পৃথক পৃথক দু'আ' আছে তা পড়লেন। কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন, কিন্তু মুখ ধৌত করতে ভুলে গেলেন। শায়খ ফরীদুদ্দীন (রঃ) স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, মুখমণ্ডল ধোয়া বাকী রয়ে গেছে। তখন তিনি প্রথম থেকেই ওযূ শুরু করলেন এবং বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে যেখানে যে দু'আ' পড়তে হয় অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগের সঙ্গে তা পড়ছিলেন। মুফতী সৈয়দ জহীর উদ্দিন (রঃ) এবং হাযিরানে মজলিস দেখ-ছিলেন আর বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন এমতাবস্থায়ও তার এতখানি সতর্কতা ও অভিনিবেশ প্রত্যক্ষ করে। কাযী যাহিদ পা ধৌত করার ব্যাপারে সাহায্য করতে চাইলেন। হযরত মাখদূম (রঃ) তাকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, দাঁড়িয়ে থাকো। এরপর তিনি নিজে নিজেই শেষ তক ওযূ করলেন এবং পরিপূর্ণভাবে ওযু সমাপনের পর চিরুনী চেয়ে পাঠালেন, দাড়ী আঁচড়ালেন। এরপর মুসাল্লা (জায়নামায) চাইলেন এবং নামায শুরু করলেন। দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন এবং ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ার কারণে কিছুক্ষণ আরাম করলেন। শায়খ খলীল উদ্দীন আরয করলেন, হযরত! শান্তির সঙ্গে হুজরায় তশরীফ নিয়ে চলুন; ঠাণ্ডা এসে গেছে। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, জুতা পরলেন এবং হুজরার দিকে চললেন। মখদুম মুনায়রী (রঃ)-এর একটি হাত মওলানা যাহিদ-এর কাঁধে আর অপরটি ছিল মওলানা শিহাবুদ্দীনের কাঁধে। হুজরাতে তিনি বাঘের চামড়ার উপর শুয়ে পড়লেন। মিঞা মুনাওয়ার তওবাহ্‌র বায়'আতের জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাকেও তওবাহ ও বায়'আত দ্বারা ধন্য করলেন। তার মাথার উভয় পার্শ্বের চুলই কিছু কিছু কেটে ছেটে দিলেন, টুপি পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও! দু'রাকাত সালাত আদায় করো। আর এটাই ছিল শেষ তওবাহ ও আখেরী বায়'আত যা তিনি করিয়েছিলেন। এখানেই একটি স্ত্রীলোক আপন দুই পুত্রসহ এসে হাযির হয় ও কদমবুসী লাভে ধন্য হয়। 'আসরের সালাত আদায়ের পর মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে খাদেমকুল আরয করল যে, চারপায়ীর উপর আরাম করুন হযরত! মাখদূম মুনায়রী (রঃ) চারপায়ীর উপর তশরীফ রাখেন এবং আরাম করেন।

মাগরিবের সালাত আদায়ের পর শায়খ জলীল উদ্দীন, কাযী শামসুদ্দীন, মাওলানা শিহাবুদ্দীন, কাযী নূরুদ্দীন, হেলাল, 'আকীক ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব এবং খাদেমবর্গ যারা খেদমতে নিয়োজিত ছিল—চারপায়ীর চারি পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত মাখদূম (রঃ) কিছু বিলম্বে বুলন্দ আওয়াজে—'বিসমিল্লাহ' বলা শুরু করলেন। কয়েকবার 'বিসমিল্লাহ' বলার পর জোরে জোরে পড়লেন :

لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين -

এরপর উচ্চৈ স্বরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন। অতঃপর কলেমায়ে শাহাদাত পড়লেন :

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

এরপর বললেন,

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কলেমায়ে শাহাদাত আওড়াতে থাকলেন। অতঃপর কয়েক বার বললেন—

بسم الله الرحمن الرحيم - لا اله الا الله محمد رسول الله

এরপর অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে এবং অন্তরের সমস্ত শক্তি 'মুহাম্মাদ' প্রয়োগে ও গভীর আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে 'মুহাম্মদ' 'মুহাম্মাদ' এবং اللهم صل على محمد و على ال محمد الخ শেষ পর্যন্ত পড়লেন। অতঃপর নিম্নোদ্ধৃত আয়াত ربنا انزل علينا مائدة من السماء শেষ তক, এবং رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا পড়ে তিন বার কলেমায়ে তৈয়েবা নির্দিষ্ট নিয়মে পড়লেন। অতঃপর আসমানের দিকে হাত উঁচু করে তুলে ধরলেন এবং গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে যেমন কেউ দু'আ' ও মুনাজাত করে বললেন :

اللهم اصلح امة محمد صلعم اللهم ارحم امة محمد صلعم اللهم اغفر لامة محمد صلعم اللهم تجاوز عن امة محمد صلعم اللهم اغث امة محمد صلعم اللهم انصر من نصر دين محمد صلعم اللهم فرج عن امة محمد صلعم فرجا عاجلا اللهم اخذل من خذل دين محمد صلعم برحمتك يا ارحم الراحمين -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মাদীকে সংশোধন করো; হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মতের উপর রহম করো, হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মাদীকে মাফ করে দাও; হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর থেকে বালা-মুসীবত সরিয়ে নাও; হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মাদীকে আশ্রয় দাও; হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বীনকে যে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য করো; হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর থেকে বিপদাপদ সত্বর দূর করে দাও; হে আল্লাহ! যারা দ্বীনে মুহাম্মদীকে অপমানিত করতে চায় তাদের তুমি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করো; আর এ কেবল তোমারই রহমতে সম্ভব; কেননা তুমিই সবচেয়ে বড় রহমকার।" এই শব্দগুলো উচ্চারণের সাথে সাথেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। সে সময় তাঁর যবান মুবারকে নিম্নোদ্ধৃত শব্দসমষ্টি উচ্চারিত হচ্ছিল।

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا اله الا الله

এরপর একবার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলেন এবং এরই সঙ্গে প্রাণবায়ু বেরিয়ে অনন্ত লোকে প্রস্থান করল। তারিখটা ছিল—৭৮২ হিজরীর ৬ই শওয়াল, রোজ বৃহস্পতিবার 'ইশার সালাতের ওয়াক্ত। পরে বৃহস্পতিবার দিনে চাশতের নামাযের সময় হযরত মাখদূম (রঃ) কে দাফন করা হয়।[১]

সালাতে জানাযা ও দাফন

সালাতে জানাযা হযরত শায়খ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী (রঃ) পড়ান যিনি মাখদূম মুনায়রী (রঃ)-এর ইন্তিকালের পর পৌঁছেছিলেন। লাতাইফে আশরাফী[২] গ্রন্থে হযরত মাখদূম সাহেব (রঃ)-এর স্বয়ং নিজের ওসিয়ত ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করা এবং হযরত শায়খ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ)-এর সেখানে পৌঁছুনো ও ওসিয়ত মুতাবিক জানাযা পড়ানোর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এথেকে অবগত হওয়া যায় যে, মাখদূম সাহেব (রঃ)-এর ওসিয়ত ও তথ্য মুতাবিক জানাযা তৈরী করে রাস্তার উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং তার অপেক্ষা চলছিল। শায়খ আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) দিল্লী থেকে বাংলার চিশতীয়া সিলসিলার মশহূর বুযুর্গ হযরত শায়খ 'আলাউদ্দীন 'আলাউল হক লাহোরী পাণ্ডোবী (রঃ)-এর খেদমতে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিহার শরীফে ঠিক সেই সময় পৌঁছান যখন হযরত মাখদূম (রঃ)-এর জানাযা তৈরী করে

১. শেখ যঈনবদর 'আরাবী (রঃ) কৃত "ওফাতনামা" পুস্তিকা ১১২১ হিঃ আগ্রায় মুদ্রিত।

২. লাতায়েফে আশরাফী ১২৯৫ হিঃ দিল্লী থেকে মুদ্রিত, ৯৪ পৃ.

রাস্তার উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং ইমামের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। তিনি জানাযা পড়ান এবং নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দেন।[১]

হযরত মাখদূম (রঃ)-এর কবর কাঁচা এবং তার উপর কোন গুম্বজ নেই। সূর সালতানাতের যুগে তার আশে-পাশের ঘরবাড়ী, মসজিদ, হাওয ও ফোয়ারা নির্মিত হয়। কিন্তু যেহেতু হযরত মাখদূম (রঃ) রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সুন্নত পরিপূর্ণভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ও মনোযোগী ছিলেন সেটা খেয়াল করে তার কবর যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়ই রেখে দেওয়া হয়।[২]

সন্তান-সন্ততি ও বংশধর

"সীরাতুশ্‌শরফ" প্রণেতা লিখছেন :

মাখদূম (রঃ)-এর ঔরসে সন্তান-সন্ততির ধারা বর্তমানে একজন পৌত্রীর মাধ্যমে অব্যাহত আছে। তাঁর সাহেবযাদা শাহ যাকী উদ্দীন পিতার জীবদ্দশায়ই বারিকা নামে একটি কন্যা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন, এই কন্যার শাদী মুবারক সায়্যিদ ওয়াহীদুদ্দীন রিযভীর ভাগিনা শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসী (রঃ)-এর সাথে সুসম্পন্ন হয়। এদের দাম্পত্য মিলনে তোহ্‌রা নামীয় একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে—যার বিবাহ হয় শিহাবুদ্দীন 'আলভী তূসীর সঙ্গে। শায়খ 'আলীমুদ্দীন ও শায়খ ইমামমুদ্দীন নামে এদের দুটি পুত্র সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। একযুগ পর যখন হুসায়ন বলখী (রাঃ)-এর বংশধর নওশা-ই-তওহীদ খেলাফত উৎসাদন করেন—তখন দরগাহ্‌র খাদেমগণ হযরত বারিকার সন্তানদের নিয়ে এসে খানকাহর খেলাফতের পদে সমাসীন করেন। এঁদের মধ্যে প্রথম বুযুর্গ যিনি গদ্দীনশীন হন--তিনি ছিলেন শাহ বীখ।[৩]

মাখদূম সাহেব (রঃ)-এর ভাইদের থেকে বংশীয় ধারা অব্যাহত থাকে। তাদের বংশধর অদ্যাবধি মুনায়র ও বিহার প্রদেশে বিদ্যমান।

বিশিষ্ট খলীফা এবং মুরীদবর্গ

"সীরাতুশ্‌শরফ" প্রণেতা লিখছেন :

"মাখদূম (রঃ)-এর মুরীদদের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ।—নওশা-ই-তওহীদ এর সংখ্যা লক্ষাধিক বলেন। এই সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত বললে বোধ হয় ভুল বলা

---

১. লাতাইফে আশরাফী হযরত নিজামুদ্দীন ইয়ামনী যিনি নিজাম হাজী গরীবুল ইয়ামনী নামে পরিচিত-এর কৃত যিনি হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীরী (রঃ)-এর মুরীদ ছিলেন এবং তাঁর সাহচর্যে তিরিশ বছর কাটান। এটাই হযরত আশরাফ জাহাঙ্গীর (রঃ) জীবন-চরিতও বটে, তেমনি তাঁর শিক্ষামালার সংকলনও বটে।

২. সীরাতুশশরফ ;

৩. সীরাতুশ্‌শরফ, ১৫০ পৃঃ

হবে না। তবে এতটুকু বলা যায় যে—এ সংখ্যা নিশ্চিতই অধিক। আর এর ভেতর হেদায়াত-প্রার্থী ছাত্রদের সংখ্যাও অন্তর্ভূক্ত। হযরত মাখদূম (রঃ)-এর নির্বাচিত ছাত্রদের তালিকা নিম্নরূপ:

মাওলানা মুজাফফর বলখী, মালিকযাদা ফযলুল্লাহ, মওলানা নাসীরুদ্দীন জৌনপুরী, মাওলানা নিজামুদ্দীন দর্দনহিসারী, শায়খ 'উমর, কুতুবুদ্দীন, ফখরুদ্দীন, শায়খ সুলায়মান, খাজগী, খাজা আহমাদ, ইমাম তাজুদ্দীন, হুসায়ন মু'ইয্য বলখী যিনি নওশা তওহীদ নামে পরিচিত, মাওলানা কামরুদ্দীন, মাওলানা আবুল কাসিম, মাওলানা আবুল হাসান, কাযী শরফুদ্দীন, কাযী মিনহাজুদ্দীন দর্দনহিসারী, মাওলানা তকীউদ্দীন আওধী, মাওলানা শিহাবুদ্দীন নাগোরী, শায়খ খলীলুদ্দীন, মাওলানা রফী'উদ্দীন, মওলানা আদম হাফিজ, যঈন বদর 'আরাবী, কাযী সদর উদ্দীন, শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী,[১] শায়খ মু'ইয্যুদ্দীন, মাওলানা করীমুদ্দীন, মাওলানা খাজা হাফিজ জালালুদ্দীন, খাজা হামীদ উদ্দীন, সওদাগর শায়খ মুবারক, যাকারিয়া গরীব, কাযী খান, নাজমুদ্দীন শা'ইর, কাযী বদরুদ্দীন জাফরাবাদী, মাওলানা লুতফউদ্দীন, আহমাদ সফীদ বাফ, শায়খ যাকীউদ্দীন, মাওলানা নিজামুদ্দীন খানযাদা মাখদূম (রঃ), মাওলানা আহমাদ আমূ, মাওলানা যয়নুদ্দীন, শায়খ শু'আইব, সায়্যিদ শিহাবুদ্দীন, ইমাদ হালিফী, হাজী রুক্নুদ্দীন, মাওলানা আওহাদুদ্দীন যিনি শায়খ নাজীবুদ্দীন ফিরদৌসীর ভাগ্না, শায়খ রুস্তম ও শায়খ ওয়াজহুদ্দীন এবং শায়খ ওয়াহীদ উদ্দীন—(তিনজনই শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ)-এর বান্ধব), মাওলানা হুস্সামুদ্দীন হয়বতখানী প্রমুখ।[২]

রচিত গ্রন্থাদি

হযরত মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (রঃ)-কে বহু গ্রন্থ প্রণেতাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁর প্রণীত অনেক গ্রন্থ ও চিঠি-

১. 'সীরতুশশরফ' প্রণেতার এখানে ভুল হয়েছে যে, ইনি সেই শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী যিনি সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে শামসুল মুল্ক উপাধি ধারণ করে তখতনশীন হয়েছিলেন। কিন্তু এটা ঠিক নয় যে, শামসুল মুল্ক মুসতাওফিল মুমালিক (নিরীক্ষক) মাওলানা শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী যিনি বলবনের রাজত্বকালে সিংহাসনারুঢ় হয়েছিলেন—অষ্টম হিজরী শতাব্দী শুরুর পূর্বেই মারা যান। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রঃ) তাঁরই শাগরিদ ছিলেন। হয়তো সীরতুশ্শরফ প্রণেতা নামের ক্ষেত্রে ভ্রমে পতিত হয়েছেন অথবা হযরত মাখদূম (রঃ) থেকে যিনি ফয়েজ লাভ করেছিলেন তিনি অন্য কোন শামসুদ্দীন খারিযমী ছিলেন।

২. সীরাতুশ্শরফ ১১৫-১১৬ পৃঃ

পত্রই কালের বিবর্তনে এবং লোকের গাফলতির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। আবার অনেকগুলির নাম জীবন-চরিতসমূহেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে সমস্ত কেতাবের এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কিংবা যে সব গ্রন্থের সন্ধান মিলে কিংবা যেসব গ্রন্থে তাঁর নাম চোখে পড়ে তা নিম্নরূপ:

রাহাতুল কুলুব আজওয়াবাহ, ফাওয়াইদে রুক্‌নী, ইরশাদুত্তালিবীন,—ইরশাদুস সালিকীন, রিসালায়ে মাক্কীয়া, মি'দানুল মা'আনী, লাতাইফুল মা'আনী, ইশারাতে মুখ্‌খুল মা'আনী, খানে পুর নে'মত, তুহফায়ে গায়বী, রিসালায়ে দর তলবে তালেবান, মালফুজাত, যাদে সফর, 'আকাইদে শরফী, ফাওয়াইদে মুরিদীন, বাহরুল মা'আনী, সাফারুল মুজাফফার, কানযুল মা'আনী, গঞ্জে লা ইউফনী, মু'নিসুল মুরীদীন, শরাহ আদাবুল মুরীদীন।[১]

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় স্মৃতি এবং তাঁর উচ্চ মরতবা, তাহকীকের মকাম ও ইজতিহাদী শক্তির সর্বাপেক্ষা বড় প্রকাশ তাঁর ''মকতুবাত' এবং 'মকতুবাত সাহসদী' ইত্যাদি নামের গ্রন্থাদি।

---

১. সীরতুশশরফ, নুযহাতুল খাওয়াতির প্রভৃতি ;

ষষ্ঠ অধ্যায়

মকতূবাত

মকতূবাত, তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্যিক মান

হযরত মাখদূম (রঃ)-এর জীবন্ত স্মৃতি এবং তাঁর বিদ্যাবত্তা ও কামালিয়াতের দর্পণ তাঁর মকতূবাত (চিঠিপত্র)-এর বিরল ও দুর্লভ সংকলন যা শুধু সে যুগের প্রণীত গ্রন্থাদির মধ্যেই নয় বরং মা'রিফত ও হাকীকতের গোটা ইসলামী ভাণ্ডারে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। জ্ঞানের গভীরতা, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের অভূতপূর্বতা, সমস্যা ও সংকটের গ্রন্থিমোচন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সঠিক উপলব্ধি, মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান ও দৃষ্টি, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ ও গভীর বোধশক্তি, মকামে নবুওতের সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা, শরীয়তের প্রতি সমর্থন ও সহায়তা এবং শরীয়তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতার দিক দিয়ে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে গোটা ইসলামী পাঠাগারে হযরত মাখদূম (রঃ) এবং ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানী (রঃ)-এর মকতূবাতের আর কোন দ্বিতীয় নজীর চোখে পড়ে না। এই সব মকতূবাত ব্যাপক অধ্যয়নের পর পরিমাপ করা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়া (সাঃ)-এর বিশেষজ্ঞ ও 'আরেফীনের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার নিপুণতা কোন্ উচচ মার্গে পেঁ ৗছেছিল এবং তাঁরা আল্লাহর পরিচয়, ঈমান ও একীন, পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি-জ্ঞান, আত্মার প্রশান্তি ও পবিত্রতা, রূহের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য, তীক্ষ্ম বোধ, চরিত্রের সূক্ষ্মতা, মানবীয় প্রকৃতির দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তির আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কি পর্যন্ত তরক্কী করতে পেরেছিলেন এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি কল্পনার ডানা মেলে কোন্ কোন্ সমুচচ শাখায় নিজেদের বাসা নির্মাণ করেছে এবং কোন্ কোন্ মহাশূন্যে পাখা মেলেছে।

'ইল্‌ম ও মা'রিফত ছাড়াও এসব মকতূবাত লেখনীর জোর, বর্ণনা-শক্তি ও উত্তম রচনাশৈলীর মাপকাঠিতেও একটি — সর্বোত্তম নমুনা। এগুলোর অনেকাংশই এতখানি উন্নত যে তাকে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ও উচচ পর্যায়ের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের শাখায় এই বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র সেই সব ব্যক্তিত্বকেই সাহিত্যিক ও লেখক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরই লেখা ও চিন্তার ফসলকে সাহিত্যের আদর্শ নমুনা হিসাবে পেশ করা হয়েছে যারা সাহিত্য

ও রচনাকে একটি পেশা কিংবা যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের একটি মাধ্যম হিসাবে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন অথবা যারা প্রাচীনকালে সরকার কিংবা দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন অথবা রচনার ক্ষেত্রে যারা শিল্পসুলভ ও প্রচলিত রীতিনীতি তথা লৌকিকতা রক্ষা করে কাজ করেছেন। এর ফল এই হয়েছে যে, আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাঞ্জল লেখক হিসাবে সর্বদাই 'আবদুল হামীদ কাতিব, আবু ইসহাক আস-সাবী, ইবনুল 'আমীদ, সাহিবে ইবনে 'ইবাদ, আবু বকর খারিযমী, আবুল কাসিম হারিরী এবং কাযী ফাযিলের নাম নেয়া হয়ে থাকে। অথচ তাদের লেখার একটা বিরাট অংশ কৃত্রিম, জীবন ও আত্মা থেকে মাহরূম এবং প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে মুক্ত। তাদের তুলনায় ইমাম গায্যালী, ইবনে জওযী, ইবনে শাদ্দাদ, শায়খ মুহী উদ্দীন ইবনে 'আরাবী, আবু হাইয়ান তাওহীদী, ইবনে কাইয়িম, ইবনে খালদূন অধিকতর শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে আখ্যায়িত হবার হকদার। তাঁদের গ্রন্থে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী রচনা, ধ্যান-ধারণা ও আবেগ-অনুপ্রেরণার প্রকাশ এবং মানবীয় প্রভাব ও অনুভূতির চিত্র অত্যন্ত—চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ঐ সব নিরাপরাধ লোকদের অপরাধ এই যে, তাঁরা কখনও সাহিত্য সাধনা ও রচনাকে তাদের চিরন্তন পেশা অথবা যোগ্যতা ও প্রতিভা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেননি। তাঁদের অধিকাংশ লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও জ্ঞানের চর্চা করা।

সবচেয়ে মজার ও শিক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল এই যে, একই লেখক দু'টি কিতাব লিখেছেন: একটি সরাসরি বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিমতা দিয়ে পরিপূর্ণ এবং অপরটি নেহায়েত সাদামাটা এবং জৌলুসহীন। সেই যুগের সোসাইটি ও সাহিত্য-সেবী গোষ্ঠি প্রথমোক্ত রচনার ভুয়সী প্রশংসাগীতিতে সোচচার। সম্ভবত উক্ত গ্রন্থের লেখক ও আলোচ্য গ্রন্থকে জীবনের উপার্জন এবং অহংকারের পুঁজি মনে করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তববাদী যমানা ও বিপ্লবের মহাকাল তার সঠিক ও নির্ভুল ফয়সালা ঠিকই শুনিয়েছে। বুদ্ধিমত্তার চাকচিক্যপূর্ণ গ্রন্থটি পাঠাগারের সৌন্দর্য হিসাবে বিরাজ করতে থাকে এবং অপর কিতাবটির তরে চিরদিনের জন্য খেলাত প্রদত্ত হয় এবং হেমন্ত বিহীন উদ্যানের ন্যায় চির বসন্তে পরিণত হয়। ইবনে জওযীর স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যাকে তিনি বেশ গর্বের সঙ্গে "আল-মুদহিশ, (গভীর বিস্ময়ে নিক্ষিপ্তকারী কিতাব) নামে নামকরণ করেছিলেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত صيد الخاطر নামক কিতাবটি যেখানে তিনি অত্যন্ত সরষ সহজ

তরীকায় স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যাকে তিনি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি—সম্ভবত আজ তা সাধারণ্যে প্রিয় এবং সাহিত্যের ছাত্রদের লক্ষ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষের ফারসী সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এখানকার সাহিত্য ও রচনার উপর জহুরী আবুল ফযল এবং নে'মত আলী খানের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। অথচ রচনার জন্য যদি আবেগ ও বাস্তবতার প্রভাবশালী প্রকাশকে মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয় তাহলে তাদের লেখনীর বিরাট একটা অংশ যেখানে শব্দের চাকচিক্য, বিস্ময়কর কারু-কাজ ও শাব্দিক প্রশ্রয় ও পক্ষপাতিত্বের প্রাধান্য ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। ফলে সেগুলো নিজেদের মূল্য হারিয়ে ফেলবে এবং খুব অল্প অংশই সাহিত্য ও রচনার সাধারণ মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবে; এসবের মুকাবিলায় এমন বহু গ্রন্থ মনোযোগ দেয়ার উপযোগী বিবেচিত হবে, যে-গুলোর প্রতি সাধারণভাবে সাহিত্যের ইতিহাসকার এবং সমালোচকবৃন্দ সর্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করে এসেছেন। হযরত শায়খ শরফুদদীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ) এবং হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রঃ), শায়খ আহমাদ ফারুকী (রঃ)-এর 'মকতুবাত'-এর বৃহৎ অংশ, সম্রাট 'আলমগীর (রঃ)-এর 'রুকআত', শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রঃ)-এর 'ইযালাতুল খিফা' এবং শাহ 'আবদুল 'আযীয দেহলবী (রঃ)-এর 'তুহফায়ে ইছনা 'আশারিয়া''-এর বহু অংশই সাহিত্য ও রচনাশৈলীর উত্তম আদর্শ ও সফল নমুনা। এমন মনে হয় যে, প্রতিটি ভাষায় সাহিত্যের যে সীমা অগ্রপথিকরা অংকন করে দিয়েছেন তার চৌহদ্দী থেকে বের হবার, অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয়-শাস্ত্রের ভাণ্ডারকে আবর্জনামুক্ত করার এবং নতুন সাহিত্য-মহারথীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার মাথা-ব্যথা সাধারণভাবে সহনযোগ্য মনে করা হয় নি এবং এভাবেই শতাব্দীকাল ব্যাপী ঐ সব সাহিত্য-রত্নরাজির উপর ধূলির আস্তরণ জমতে থাকে।

সাহিত্য ও রচনার ক্ষেত্রে সাধারণ ঐতিহাসিক ও সমালোচকবৃন্দ অধিকাংশই—এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছেন যে, যে লেখায় উত্তম বাকভঙ্গীর সঙ্গে অন্তরের জ্বালা ও তাপ এবং হৃদয়ের তপ্ত লোহুও শামিল হয় সে লেখায় এমন প্রভাব ও এমনি শক্তি সৃষ্টি হয় যে, স্বীয় সমসাময়িক যুগেও হাযারো দীলকে তা আহত করে এবং শত শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও তার সজীবতা ও প্রাণ-স্পন্দন, তার তাছীর ও অভিভূত করার শক্তি অক্ষত থাকে।

লেখা ও বক্তৃতাকে সর্বোত্তম ও কামিয়াব বানাবার জন্য যতগুলি গুণ ও যোগ্যতা, অলঙ্কার শাস্ত্রের যতবিধ মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন আবশ্যক, সাহিত্য-সমালোচকেরা সে সবেরই বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন—এবং প্রতিটি যুগেই তার উপর বিতর্ক চলে আসছে। কিন্তু খুব কম লোকের কাছেই এটা অনুভূত হয়েছে যে, সেসব গুণাবলী এবং যোগ্যতার ভেতর একটি বড় প্রভাব সৃষ্টিকারী ও না ভোলার মতো উপাদান অথবা কার্যকর শক্তি বক্তার খুলুসিয়ত (আন্তরিকতা বা একনিষ্ঠতা) ও বেদনাকাতরতা। সাহিত্য ও রচনাশৈলীর ভাণ্ডারকে যদি একটি নতুন ও অধিকতর বাস্তবসম্মত এবং গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয় তবে তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করলে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

(এক) সে সমস্ত লেখা ও ধ্যান-ধারণার প্রকাশ যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও দাবী, এবং কোন শক্তিশালী দৃঢ়ভিত্তিক 'আকীদা কিংবা বিশ্বাসের আওতাধীনে জন্মলাভ করে এবং যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনরূপ ফরমায়েশী কিংবা হুকুম তা'মিল করতে গিয়ে, দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল অথবা কোন শক্তিশালী শাসক কিংবা বিত্ত-সম্পদের অধিকারী কোন ধনিকের সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী লাভের জন্য ছিল না—বরং তিনি খোদ নিজ বিবেকের ও 'আকীদার অনুশাসন মেনেছিলেন যার ভেতর শাসক ও ধনিকশ্রেণীর নির্দেশ পালনের চেয়েও অধিকতর শক্তি নিহিত এবং যা উপেক্ষা ও অমান্য করা কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

(দুই) সে সমস্ত লেখা যা কোন হুকুম তা'মিল করতে গিয়ে (অর্থাৎ ফরমায়েশী), অথবা কোন দুনিয়াবী স্বার্থোদ্ধার কিংবা উপর মহলের কোন ব্যক্তি বিশেষের হুকুম তা'মিলের স্বার্থে লিখিত। সাহিত্যের এই উভয় প্রকারের ভেতর আসমান-যমীন ফারাক বিদ্যমান। প্রথম প্রকার সাহিত্য—দীর্ঘ দিন ধরে সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে। তার বিশেষত্ব এই যে, যদি তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধর্মীয় ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত হয় তবে তার হৃদয় ও চরিত্রের উপর গভীর ও বিপ্লবাত্মক প্রভাব পড়ে। হাযার হাযার মানুষের অন্তরে তা পড়বার পর সংশোধন তথা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রেরণার সৃষ্টি হয়। এর বিপরীতে দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্য সাময়িক অভিনন্দন এবং ক্ষণেকের আনন্দ ও তৃপ্তি ছাড়া হৃদয় ও আত্মার উপর দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব রেখে যায় না। তার জীবন ও আয়ু সীমিত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। প্রথম প্রকারের সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সহজ সাবলীলতা থাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্যে

থাকে শিল্প ও ব্যবস্থাপনাজাত সাজ-সজ্জা। এই দু'প্রকার সাহিত্যের ভেতর পার্থক্য সেইরূপ যা এই দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর ভেতর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি একটি শিকারী কুকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, হরিণ পালাবার ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী এগিয়ে যায় আর তুমি তাকে পাকড়াও করার ক্ষেত্রে এত পিছিয়ে পড় কেন? হরিণ নিজের জন্য দৌঁড়ায় আর আমি দৌঁড়াই আমার মনিবের জন্য,—এটাই ছিল কুকুরের জবাব।

মোট কথা, এই বাতেনী অবস্থা, বিশ্বাস ও পর্যবেক্ষণ, দাওয়াতের প্রাধান্য, আত্মার সঙ্গে সম্পর্কের অধিকারীকে বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করতে এবং মন্‌যিলে মকসূদ তথা অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁ ছুবার আবেগ ও উৎসাহ, এখলাস ও বেদনাকাতরতা, আত্মার সৌন্দর্য ও হৃদয়ের পবিত্রতা এবং এসবের সঙ্গে প্রশান্তকর বিশুদ্ধ আনন্দ ও ভাষার উপর আল্লাহ পাক হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (রঃ) কে এক মহা সাহিত্যিক মর্যাদা ও মকাম (স্থান) দান করেছিলেন এবং তিনি স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও আবেগ-অনুপ্রেরণা প্রকাশের জন্য একটি স্থায়ী নিয়ম-কানুন সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন—যা একমাত্র তাঁরই জন্য ছিল নির্দিষ্ট। তার 'মকতূবাত' শুধু ফারসী সাহিত্যেই নয় বরং ইসলামী সাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং মা'রিফত, হাকীকত, ইসলামের দাওয়াত ও সংস্কার-সংশোধনের ভাণ্ডারে কম জিনিসই এমন মিলবে যা স্বীয় সাহিত্য-গুণ, শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টিতে তাঁর দ্বিতীয় নজীর হতে পারে।

চিঠিপত্রের (মকতূবাত) সংকলন এবং যাকে লেখা হয়েছে

মকতূবাতের সবচেয়ে মশহূর ও নির্ভরযোগ্য সংকলন সেটি যা চৌসা[১] নামক কসবা (ক্ষুদ্র শহর)-এর শাসনকর্তার নামে লিখিত। এই সংকলনটিতে ১০০টি চিঠি রয়েছে। কোথাও 'মকতূবাতে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া মুনায়রী'-এর নামে ছাপা হয়েছে, আবার কোথাও 'সাহ্‌সদী মকতূবাত' নামে, আবার কোথাও 'মকতূবাতে সদী' নামে। এর সংকলক হযরত মাখদূম (রঃ)-এর বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত শাগরিদ শায়খ যঈন বদর ''আরাবী যিনি এই সংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন:

''অধম বান্দা যঈন বদর 'আরাবী বলছি, যে, কাযী শামসুদ্দীন চৌসা নামক কসবার শাসনকর্তা, যিনি হযরত মাখদূম (রঃ)-এর একজন মুরীদ,—বারবার তাঁর

১. চৌসা হযরত মাখদূম সাহেব (রঃ)-এর আমলে একটি কেন্দ্রীয় ও প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এ যুগে তা প্রাচীন জেলা শাহ আবাদ কমিশনারীর একটি অখ্যাত পল্লী।

খেদমতে আবেদন করেছেন যে, এই গরীব কতকগুলি অসুবিধার কারণে হযরত মাখদূম (রঃ)-এর মজলিসে হাযির হতে এবং তার সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভে (যা 'ইল্‌ম ও মারেফত হাসিলের মাধ্যম) বঞ্চিত। অতএব বিনীত প্রার্থনা যে, 'ইলমে সলূক (আধ্যাত্ম পথের জ্ঞান)-এর প্রতিটি অধ্যায়েই বান্দার বোধ-শক্তি ও সামর্থ মুতাবিক কিছু অংশ যেন লিপিবদ্ধ করে রাখা যায় যাতে দূরে নিক্ষিপ্ত এই অধম এর থেকে লাভবান হতে পারে। এই দরখাস্ত যা অত্যন্ত এখলাস ও অনুনয়-বিনয় সহকারে করা হয়েছিল---মঞ্জুর করা হয় এবং হযরত মাখদূম (রঃ) অধ্যাত্ম পথের পথিকদের (সালেকীন) মরতবা ও মকাম এবং মুরীদদের অবস্থাদি ও কার্যকলাপের ব্যাপারে আবশ্যকমত কিছু লিপিবদ্ধ করে দেন এবং এইভাবে তওহীদ ও মা'রিফত, ইশক ও মুহব্বত, আকর্ষণ ও কোশেশ, বন্দেগী ও দাসত্ব, তাজরীদ ও তাফরীদ, প্রশংসা ও ভর্ৎসনা তথা পীর-মুরিদীর অনেক জরুরী ও উপকারী রচনাসমূহ ও হেদায়াত, প্রাচীনকালের বুযুর্গদের কাহিনী এবং তাদের অবস্থা ও কার্যকলাপের অনেক ভাণ্ডারই লেখার ভেতর এসে যায়। এই চিঠিপত্রগুলো ৭৪৭ হিজরীর বিভিন্ন মাসে বিহার থেকে চৌসা নামক পল্লীতে প্রেরিত হ'ত। খানকাহ্‌র খাদেম ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এসব চিঠি-পত্রের (মকতুবাত) নকল রেখেছিল যাতে সত্যের প্রার্থী ও পরবর্তীতে আগত বংশধরদের এটা কাজে লাগে।

অন্য আর একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন ''মকতূবাতে জওয়াবী'' নামে আলাদা-ভাবেও প্রকাশিত হয়েছে এবং ''সাহ্‌সদী মকতূবাত'' (سه صدی مکتوبات)-এর (ইসলামী কুতুবখানা পাঞ্জাব, লাহোর, থেকে প্রকাশিত) সংকলনের ভেতরও শামিল। এটা ঐসব মকতুবাতের অবশিষ্টাংশ যা শায়খ মুজাফফরের নামে তার বিনীত দরখাস্তের জবাবে লেখা হয়েছিল এবং এর ভেতর অধিকাংশই আধ্যাত্মিক পথে চলতে গিয়ে আগত সম্ভাব্য সমস্যা ও সংকটের সমাধান এবং উক্ত রাস্তার ধাপে ধাপে উন্নতি অগ্রগতি ও বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। এর থেকে শায়খ মুজাফফরের উচ্চ সামর্থ ও ঐশী পুরস্কারের পরিমাপ করা যায়। শায়খ মুজাফফর ওসিয়ত করেছিলেন, এসব চিঠিপত্র যেন মৃত্যুর পর তার সঙ্গেই দাফন করে দেওয়া হয়। আকস্মিকভাবেই কিছু চিঠিপত্রের উপর তার খাদেমের নজর পড়ে এবং তারা সেগুলি কপি করে নেয়। এই সংকলন ''মকতূবাতে জওয়াবী'' নামে চিহ্নিত হয়। এই সংকলনে আটাশটি চিঠি রয়েছে।

মকতূবাতের তৃতীয় এক সংকলন যেখানে একশো তিপান্নটি চিঠি রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে। এই মকতূবাত ৭৬৯ হিজরীর জমাদিউল আওয়াল ও ৭৬৯ হিজরীর রমযানুল মুবারকের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে।

যাদের নামে এসব চিঠিপত্র লেখা হয়েছিল তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম নীচে দেওয়া গেল :

কসবা আঙ্গলীর অধিবাসী শায়খ 'উমর, কাযী শামসুদ্দীন, কাযী যাহিদ, মাওলানা কামালুদ্দীন সন্তোষী, মওলানা সদরুদ্দীন, মওলানা যিয়াউদ্দিন, মাওলানা মাহমুদ সিঙ্গানী, শায়খ মুহাম্মাদ জাফর আবাদী যিনি দেওয়ান নামে পরিচিত, মাওলানা নিজামুদ্দীন সুলতান মুহাম্মাদ, মাওলানা নাসীরুদ্দীন, আমীন খান, মালিক খিযির, শায়খ কুতুবুদ্দীন, শায়খ সুলায়মান, সুলতানুশ্‌শারক্‌ ফিরূয শাহ।

রচনার উৎস ঃ

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ)-এর মকতূবাত অধ্যয়ন করলে পাঠকের কাছে পরিষ্কার অনুভূত হয় যে, এই মহাজ্ঞান, এই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ ও পর্যালোচনা লেখকের শুধুমাত্র ধীশক্তি জ্ঞানের প্রাচুর্য, গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নেরই পরিণতি নয় বরং এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি। আল্লাহর মহান দরবার, মুখাপেক্ষী নন এমনি শান, তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব মহিমা ও সৌন্দর্য, মু'মিনের আশা ও ভয়, 'আরিফ ও আল্লাহর পথের পথিক-দের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মিলন, আনন্দ ও বেদনা, রহমতের দরিয়ার প্রবল উচ্ছ্বাস, তওবা ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের প্রয়োজনীয়তার উপর যা লেখা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোন গোপন রহস্যভেদী এবং হাকীকতের সংগে পরিচিত কেউ তা লিখেছেন—প্রবৃত্তির ভ্রান্তি, শয়তানের প্রতারণা, নীচ চরিত্র এবং আধ্যাত্মিক পথের ঘাটি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, বিস্তৃত ও কার্যকর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তরীকতপন্থীদের ভ্রান্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী উচচারণ, শরীয়তের আবশ্যকীয়তা, শরীয়তের কষ্টকর বিধানসমূহের স্থায়িত্ব, বেলায়েতের উপর নবুওতের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার এবং মকামে নবুওতের মহান মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তার মূল্য ও কদর এবং তার উপকারিতা পরিমাপ করবার জন্য তখনকার সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে জানা জরুরী যে সময় ও পরিবেশে এই মকতূবাত লেখা হয়েছে। এখানে আমরা বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে সেই সব মকতূবাতের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করব। যিনি বিস্তারিতভাবে জানতে ও উপকার পেতে আগ্রহী তিনি আসল মকতূবাতের শরণাপন্ন হতে পারেন।

সপ্তম অধ্যায়

মকামে কিবরিয়া

দুনিয়া জাহানের মহান স্রষ্টার পরমুখাপেক্ষীহীনতা

একটি পত্রে মহান আল্লাহ পাকের পরমুখাপেক্ষীহীনতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হ'ল, তাঁর কোন কর্ম ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারও কোন বাদ-প্রতিবাদ কিংবা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ নেই। لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون তিনি যাকে ইচ্ছা ঈমানী দৌলত ও কবুলিয়তের খেলাত ও দিয়ে ধন্য করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাঁর মহান দরবার থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করেন; যাকে ইচ্ছা তিনি মাটির দুনিয়া থেকে সপ্তাকাশের ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সপ্তাকাশের ঊর্ধ্ব থেকে ধূলি-মলিন দুনিয়ায় নিক্ষিপ্ত করেন।

اگر گوئی چرا چنین است "যদি তোমরা বল—এমনটি কেন হবে? তাহলে প্রদত্ত উত্তর হবে নিম্নরূপ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

এটা আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ,—যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন।

"কার এতখানি সাহস যে, আল্লাহ পাককে এটা বলতে পারে, কেন তুমি অমুককে এত ধন-দৌলত দিলে আর অমুককে দিলে না? যেমন, একজন বাদশাহ একজনকে ওযারতী তথা মন্ত্রিত্বের পদ দিয়ে ধন্য করেন আর অন্যজনকে দারোয়ানী কিংবা চাপরাশির পদে অধিষ্ঠিত করেন—ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ পাক যখন কাউকে দীন ও ঈমানের সম্পদ দান করেন, তখন তাকে কখনো মন্দের হাত থেকে সরিয়ে নেন, আবার কখনো তাকে হীন ও, নীচ, জালিম ও হারামখোর সম্প্রদায়ের ভেতর থেকে বের করে আনেন। কার এতখানি বুকের পাটা যে বলবে, -- اهؤلاء من الله عليهم من بيننا অর্থাৎ "এরাই কী সে সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক অনুগৃহীত করেছেন আমাদের মধ্য থেকে?" হুকুম হচ্ছে যে, ফুযায়ল বিন 'আয়ায—যে ছিল ডাকু,—তাকে আমার দরবারে নিয়ে এস; আমি যে তাকেই চাই। বাল'আম বাউর যে চার শো বছর পর্যন্ত মুসাল্লা (জায়নামায) থেকে এতটুকু সরে নি, তাকে আমার দরবার থেকে দূরে নিয়ে যাও; সে আমার দরবার থেকে বহিষ্কৃত। আমি 'উমরকে চাই, যে পুতুল পূজায় মত্ত, আর 'আযাযীল

যে সাত হাযার বছর পর্যন্ত আমার 'ইবাদতে মশগুল, তাকে আমি চাই না। কার এতখানি সাহস যে বলবে, কেন এমনটি হ'ল ?"

যদি সেই মহান প্রভুর কৃপা-দৃষ্টি একবার নিক্ষিপ্ত হয় তাহলে সব দোষ-ত্রুটিই উপেক্ষনীয় ও বিজ্ঞোচিত, সব অপূর্ণতাই পূর্ণতা, বিশ্রী রূপই সকল সৌন্দর্যের আঁকর। হে ভ্রাতঃ! এক মুষ্টি মাটিই তো ছিলে, যিল্লতী ও অবজ্ঞেয় অবস্থায় পথিমধ্যে পড়েছিলে, পায়ের তলায় লেগেছিলে। এরপর মহান কৃপানিধানের করুণাদৃষ্টি পতিত হতেই ঘোষিত হ'ল انى جاعل فى الارض خليفة (আমি পৃথিবীর বুকে খলীফা হিসাবে পাঠাতে চাই)।"

এই পরমুখাপেক্ষীহীনতাকেই অন্য আর একটি চিঠিতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

"উপদেশ ও শিক্ষালাভের জন্য সতর্কীকরণের চক্ষু উন্মোচন কর। আদম (আঃ)-এর আক্ষেপ আর নূহ (আঃ)-এর ফরিয়াদ শোন; ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর ব্যর্থতা আর ইয়াকূব (আঃ)-এর মুসীবতের দাস্তান (ঘটনা) কান দিয়ে শোন; কূয়ার মধ্যে নিক্ষিপ্ত ইউসুফ (আঃ)-এর চাঁদ-মুখ দেখ; হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর মাথার উপর করাত এবং হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর গর্দানের উপর রাখা তলোয়ারও গভীরভাবে অবলোকন কর; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হৃদয়ের জ্বালা এবং দীলের অস্থিরতা গভীরভাবে লক্ষ্য কর আর পড়,—كل شئ هالك الا وجهه—সেই পবিত্র মহান সত্তা ব্যতীত আর সব কিছুই ধ্বংসশীল।"

একস্থানে আল্লাহ পাকের দরবারের উন্নত ও মহান মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন:

হে আমার ভ্রাত! ভালভাবে অনুধাবন কর, যে লুকমা (খাদ্যের গ্রাস) শিকারী বাজপাখীর জন্য তৈরি করা হয়েছে তা একটি চড়ুই কিংবা অনুরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাখীর পেটে কি করে ঢুকতে পারে? সেই লম্বা পোশাক যা ভাগ্যবান ও সম্পদশালী লোকের শরীরের পরিমাপ অনুযায়ী সেলাই করা হয়েছে তা আমাদের মত নগণ্য ছোটখাট আকৃতির লোকের জন্য কি করে উপযোগী হতে পারে?

অন্য আর এক পত্রে এটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র করুণা বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন মাটির পরশমণিতে রূপ নিতে এবং আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িতের পক্ষে গৃহীত হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। একথা যেখানে ভয়েরও বটে সেখানে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও উৎসাহ-উদ্দীপকও বটে। তিনি আরও বলেন,—

এই মহামূল্যবান সম্পদ লাভ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এটা কোন দাবি বা অধিকারের বিষয় নয়। সেই মহান আল্লাহ্‌র কসম! ব্যাপারটা যদি দাবি কিংবা অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'ত, তাহলে আমার ও তোমাদের ভাগ্যে একটি বিন্দু পরিমাণও জুটত না। কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্ক এর মাঝ থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এমন কি এখন যেভাবে একজন পবিত্র আত্মাও এই সম্পদের প্রত্যাশী, ঠিক তেমনি বাক-সর্বস্ব ও নাপাক হাযারো নগণ্য জিনিসও এর প্রত্যাশী। যে আবর্জনা ও ভস্মস্তূপ কুকুরের আবাস-স্থল হতে পারে—তাই একদিন বাদশাহর শাহী দরবারে পরিণত হতে পারে। অবশ্য আল্লাহ পাক তাঁর মহা-হেকমত-এর জন্য কিছু কার্যকারণও নির্ধারিত করে রেখেছেন।

অপর একটি চিঠিতে এই বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে,—

"কার্য-কারণবিহীন অনুগ্রহ একজনকে অনুগৃহীত করে আর কার্য-কারণ-বিহীন ইনসাফ ও সুবিচার অন্যকে গলিয়ে দেয়। 'উমর (রাঃ)-কে মূর্তিঘর থেকে বের করে এনে মকবুল বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা হয় আর 'আবদুল্লাহ বিন উবাইকে মসজিদেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত থাকতে হয়।"

অন্যত্র বলেছেন,—

"স্বীয় কৃপা ও মেহেরবানীতে একজন পাপীকে তিনি ডেকে পাঠান যেন তাকে স্বীয় অপার ক্ষমা ও কৃপাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়ে নিতে পারেন, করুণা ও কৃপার পবিত্রতা যেন হৃদয়-মন থেকে জাহির হয়। তাঁর কহর ও গযব কখনো কোন পবিত্র বান্দাকেও ডেকে পাঠায় যেন তাকে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত মসিলিপ্ত ধোয়া দিয়ে তার চেহারাকে কালিমা-মণ্ডিত করতে পারেন। উদ্দেশ্য এই যে, সেই মহাশক্তিধর রাজাধিরাজ যিনি সর্বপ্রকার কার্যকারণমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে যায়। কখনো তিনি কোন হতভাগ্যের অঞ্চল প্রদেশ থেকে কোন নবীকে বের করে আনেন, আবার কখনো নবীর আঁচলের তলা থেকে কোন হতভাগ্যের জন্ম দেন; কখনো কোন কুকুরকে টেনে এনে আওলিয়ার সারিতে বসিয়ে দেন আবার কখনো কোন ওলী-দরবেশকেও কুকুরের দীর্ঘ সারিতে দাঁড় করান। কিন্তু যখন তিনি কাউকে কবুল করে নেন তখন তাকে আর ছুড়ে ফেলে দেন না, আবার কাউকে পরিত্যক্ত ও বাতিল বলে ঘোষণা করলে অতঃপর কোন কিছুর বিনিময়েই আর তাকে কবুল করেন না।"

অপর একটি চিঠিতে লিখেন,—

"চোখের নজর নিবদ্ধ রাখতে হবে "কুদরত" (আল্লাহ পাক) ও "ফযল" (অনুগ্রহ)-এর উপর। যদি চান তবে হাযার গির্জা ও পূজার ঘরকে তিনি কা'বায় ও বায়তুল মুকাদ্দাসে পরিণত করতে পারেন এবং হাযার হাযার নাফরমান পাপী ও গুনাহগারকে আল্লাহ্‌র 'হাবীব' ও আল্লাহ্‌র 'খলীল' (বন্ধু) খেতাব দিতে পারেন। এর মাঝে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। যদি তিনি চান, এক মুহূর্তে হাযার হাযার কাফিরকে মু'মিন বানিয়ে দিতে পারেন, হাযারো মুশরিক ও পুতুল-পূজারীকে তওহীদবাদীতে রূপান্তরিত করতে পারেন, আর এর জন্য কোন অবকাশের দরকার নেই। হাযার হাযার অভিশপ্তকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং হাযার হাযার পানশালাকে সমান্তরাল রাস্তায় মিশিয়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কারও কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য করারও অবকাশ নেই।"

অপর এক পত্রে তিনি বলেন—

"যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন। কারও ধ্বংসের পরওয়া যেমন তাঁর নেই, তেমনি নেই কারও নাজাতের পরওয়াও। একজন উন্মুক্ত প্রান্তরে পিপাসায় জীবন দিচ্ছে আর বলছে যে, দুনিয়ার বুকে পানির এত নহর বয়ে চলেছে, অথচ আমি এখানে পানি বিহনে জীবন দিতে চলেছি। গায়েব থেকে আওয়াজ ভেসে আসে—হাযারো সিদ্দীক (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বান্দাহ)-কে আমি ভয়ংকর জঙ্গলে নিয়ে আসি এবং তাদেরকে আমার ইচ্ছাশক্তির তেগ ও তলোয়ার হেনে নিঃশেষ করে দেই যাতে করে কিছু কাক ও শকুন তাদের চক্ষু, চোয়াল ও মাথার খুলি (অর্থাৎ শবদেহ) থেকে নিজেদের রূযী সংগ্রহ করতে পারে। যদি কোন অভিযোগকারী অভিযোগের ভাষা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে চায় তখন আমি এই কথা বলে তার মুখ বন্ধ করে দেই যে, لا يسئل عما يفعل অর্থাৎ পক্ষীকূলও আমার আর সিদ্দীকও আমারই। মাঝে তোমরা প্রশ্ন উঠাবার কে?" [১]

অন্য এক পত্রে তিনি বলেছেন, কারুরই স্বীয় পরিণতি সম্পর্কে এ খবর ও জ্ঞান নেই যে, তার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে। দু'ধরনের ব্যবহারের সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দু'ধরনের (ভাল এবং মন্দ) ব্যবহার সম্পর্কিত ঘটনার বেশুমার কাহিনী তিনি এমন প্রভাব সৃষ্টিকারী পত্রে লিখেছেন যে, তা পড়বার পর মানুষের রক্ত পানি হয়ে যায়।

'ভাই আমার! রাস্তা নিরাপদ নয়, অথচ মনযিলও বহু দূরে। আমার কাম্য অসীম, শরীর দুর্বল, দীল অসহায়, অন্তর 'আশিক আর মাথা বাসনাপূর্ণ।'

১. ৫৬নং মকতূব;

"কত চেহারাই না আছে যেসব কবরের ভেতর কেবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, কত পরিচিত আপন জনই রয়েছে যাকে প্রথম রাত্রিতেই অপরিচিত করে দেয়া হয়; কত ব্যক্তি আছে যাদেরকে বলা হয় "বাসর রাতের ঘুম ঘুমাও"—আর অন্যকে বলা হয় "অলুক্ষণে ঘুম ঘুমাও।" কখনো বা এমনিভাবে পরিত্যাগ করেন যা কোনরূপ আনুগত্যের বিনিময়েই আর ফিরিয়ে নেন না।

من لم يكن للوصال اهلا - فكل احسانه ذنوب -

আর কখনো বা এমনি কবুল করেন যে অতঃপর কোন অন্যায় ও অবাধ্যতারই আর পরওয়া করেন না।

فى وجهه شافع يمحوا ساءته
من القلوب ويأتى بالمعاذير

খলীলুল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুতুল ঘর থেকে বের হতে দেখ আর يخرج الحى من الميت (যিনি মৃতের থেকে জীবিত করেন) পড়। নূহ (আঃ)-এর ঘর থেকে কিন'আনকে বেরিয়ে আসতে দেখ আর يخرج الميت من الحى (যিনি জীবিতের থেকে মৃত্যু দান করেন) স্মরণ কর। আদম (আঃ)-এর ছবিকে এমনই স্থায়িত্ব দান করলেন যে, পদস্খলনের ক্ষতিও তা মুছে ফেলতে পারেনি। আর ইবলীসকে সন্ধির স্বরবর্ণের ন্যায় এমনি মুছে দিলেন যে, বিরাট আনুগত্যের হকও তাকে কোন ফায়দা পৌঁছাতে পারেনি। যেমনি কারুর জন্য لهم البشرى (ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ) -এর সুসংবাদ; তেমনি —আল্লাহ্র দরবার থেকে বহিস্কৃতদের জন্য لا بشرى يومئذ للمجرمين (পাপীদের জন্য আজ কোনই সুসংবাদ নেই)-এর ঘোষণা। যেমনি কোথাও سيماهم فى وجوههم من اثر السجود (তাদের চেহারায় সিজদার দাগ চিহ্নিত দেখবে) আছে, তেমনি—يعرف المجرمون بسيماهم (পাপীরা তাদের কুৎসিত চেহারার জন্য চিহ্নিত হবে)-ও আছে।"

অন্য আর এক চিঠিতে তিনি বলেন যে, শাহানশাহ মহারাজাধিরাজ-এর গুণাবলী ও কার্যকলাপ, সৌন্দর্য ও গৌরব-মহিমা, পরাক্রম ও ক্ষমাশীলতা দু'টোই নিজ নিজ কাজ করে যায় আর এ দু'টো গুণই নিজ কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং সৃষ্টি জগতে এটা এমনি ব্যয় হয় যে, ঈমানদারের জন্য ভয় ও প্রত্যাশার মাঝ-খানে অবস্থান করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এক স্থানে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বার মর্যাদা فعال لما يريد (তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন)-এর ব্যাখ্যা করতে এবং তার উদাহরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন,—

"কখনো করুণাময় সত্তা কার্যকারণহীনভাবে বলেন যে, ভেতরে এসে যাও। এখানে কুকুরের পায়ের আশ-পাশকেও বন্ধুর চোখের তুতিয়া বানাই এবং وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد[২] বলে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কুকুরের মর্যাদা বাড়িয়ে দেই ; আবার কখনো আল্লাহ্‌র ভয়াবহ ও পরাক্রমশালী সত্তা কার্য-কারণহীনভাবে আওয়াজ দেন যে, খবরদার! সাবধান! এখানে ফেরেশতাকূলের শিক্ষক ('আযাযীল)-এর মস্তক থেকে, যে সাত লক্ষ বছর আল্লাহ্‌র মহান দরবারে ই'তিকাফরত ছিল, শাহী পোশাক খসিয়ে وان عليك لعنتي (আর তোর উপর আমার লা'নত ও অভিসম্পাত)-এর কলংক তার কপালে লাগিয়ে দেন। কখনো 'উমরকে, যে ছিল অপরিচিত, মূর্তির সামনে থেকে হটিয়ে নিজের নিকট ডেকে এনে বলেন,—انا لك شئت ام ابيت و انت لي شئت ام ابيت (হে 'উমর!) আমি তোমার, তুমি চাও আর নাই চাও ; আর তুমি আমার, তুমি চাও আর নাই চাও; এবং বাল'আম বাউরের, যে ছিল নিকট ও পরিচিত জন, ইসমে আ'জম-এর মহামূল্যবান খেলা'ত দ্বারা যাকে ভূষিত করা হয়েছিল, মসজিদ থেকে বাইরে টেনে এনে কুকুরের লম্বা সারিতে বেঁধে দেওয়া হয় এবং বলা হয়,— فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث (তাদের অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেছে। যদি তুমি তাদের উপর হামলা কর তাহলে তারা জিভ বের করে হাঁপায়, আর যদি তাদের নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবুও তারা হাঁপায়)। কখনো শত সহস্র প্রকারের বালা-মুসীবত ও দুর্যোগ-তকলীফের নির্মম চাকা সেই মহান সত্তার সন্ধান-ভিখারী-দের অতৃপ্ত হৃদয়-মনের উপর দিয়ে চালিয়ে দেন, আবার কখনো কখনো হাযার হাযার বিরাট পবিত্র ও মর্যাদামণ্ডিত স্থানের অধিবাসীদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশ-তাদেরকে) তার অভ্যর্থনায় পাঠিয়ে দেন এবং অত্যন্ত মেহেরবানী ও হৃদয়গ্রাহিতার সঙ্গে তাকে নিজের কাছে ডেকে নেন। কখনো-বা পাহাড়সম গুনাহ-রাজিও মাফ করে দেন, আবার কখনো একটি সিকি পরিমাণও ছেড়ে দেন না। কখনো বেহেশতের সদর মকামে স্থান দেন, আবার কখনো এমনভাবে বাইরে নিক্ষেপ করেন যে দরোজার উপর থাকতেও অনুমতি দেন না। এখানে জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকে আনতপ্রায় আর পীর-মুরীদ দেওয়ালে অংকিত চিত্রের ন্যায়। এখানে فعال لما يريد আর يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد (আল্লাহ তাই করেন—যা তিনি চান—এবং তাই ফয়সালা করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন) -এর বহিঃপ্রকাশ।"

---

২. এখানে আসহাবে কাহাফের কুকুরের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মহা করুণাসিন্ধুর প্রবল উচ্ছ্বাস

যিনি পরমুখাপেক্ষী নন ও যিনি সকল অভাবমুক্ত সেই মহান আল্লাহ্‌র শান, তাঁর সাধারণ ইচ্ছাশক্তি, কুদরতে কামিলা, প্রবল প্রতাপ ও পরাক্রমশীলতা সম্পর্কে উপরে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সব অধ্যয়ন করবার পর মানুষের উপর একটি ভীতিকর অবস্থার সঞ্চার হয় এবং এটা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় যে, একজন একনিষ্ঠ ও দৃঢ়-বিশ্বাসী ব্যক্তির যবান থেকে যাকে আল্লাহ পাক লেখনী ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ শক্তির পুরোটাই দান করেছেন, পাঠকের উপর নিরাশার আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে (আর এটা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নয়)। ‘উলামায়ে রব্বানী এবং নায়েবে রাসূল ও নবীগণ সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে আদর্শ নমুনা হয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাহগণকে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ করেন না, বরং তাদের উৎসাহ ও মনোবল বাড়িয়ে থাকেন এবং আমল ও ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে উৎসাহিত করেন। এটাই আম্বিয়া ‘আলায়হিমুস সালামকে দুনিয়ার পাঠাবার এবং তাঁর নায়েবগণের দাওয়াত ও সকল চেষ্টা-সাধনার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই গৌরব মহিমার সঙ্গে সৌন্দর্য, পারক্রমশালীতার সঙ্গে ক্ষমাশীলতার শানও তেমনি জোরের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন:

(আমার রহমতের ধারা প্রতিটি বস্তুতেই বিস্তৃত) رحمتى وسعت كل شيء এবং

قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم -

(বল, হে আমার বান্দাহ সকল! যারা নিজের নফসের উপর বাড়াবাড়ি করেছ আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহরাজিই মাফ করবেন। কেননা একমাত্র তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু)-এর বিস্তারিত বিবরণ তেমনি অলংকার ও বাগ্মিতা প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি দিয়েছেন,

“হে আমার ভ্রাতঃ! আল্লাহ্ তা‘আলার অপার করুণাসিন্ধুতে যখন কারামত ও মাগফিরাতের উত্তাল ঢেউ ওঠে তখন সমস্ত পদস্খলন ও পাপরাশি বিলীন ও ধ্বংস হয়ে যায়, সব দোষ-ত্রুটি বুদ্ধিমত্তায় পরিণত হয়ে যায়। আর তা এজন্য যে, পদস্খলন ও নাফরমানী ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্‌র রহমত চিরন্তন। ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বস্তু চিরন্তন ও নিত্য বস্তুর মুকাবিলা কী করে করতে পারে? এই মুঠিভর মাটির সারাটা ভিত্তি রহমতের উপরই

তো। অন্যথায় আমাদের এই অস্তিত্বের এই কালিমাময় পশমী কম্বল এবং আমাদের নাপাক মাটির এই বিন্দুর কী মনোবল ছিল যে, রাজাধিরাজের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর কদম রাখত? কতই না পানশালার অধিবাসী মদ্যপায়ী মাতাল —যাদের চেহারার উপর শয়তান কালি ঢেলে দিয়েছে এবং যাদের কিসমতের চারা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার আবর্জনা স্তূপে গজিয়েছে, আকস্মিকভাবে প্রেরিত দূত এসে হাযির হয়েছেন আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তার কবুলিয়তের বার্তা নিয়ে এবং বলছেন—তোমার সাথে আমার কিছু কথা বলার রয়েছে।"[১]

সাধারণ প্রতিদান

হযরত মাখদূম মুনায়রী (র:) চিঠির প্রাপকের উৎসাহ ও মনোবল বাড়িয়ে দেন, অবস্থার সংস্কার ও সংশোধন এবং আল্লাহ্‌র রহমতের এমনই আগ্রহ জন্মিয়ে দেন যেন শাহী দস্তরখান তাঁকে নির্বাচিত করে রেখেছে এবং সারাটা দুনিয়াই তার সাধারণ প্রতিদান ও পারিতোষিক আর রহমতের প্রবল জোয়ারে ভাসছে, এখানে কারুর বঞ্চিত হবার কোন প্রশ্নই নেই। কেননা এখানে খোদ প্রেমাস্পদই তাঁর সন্ধান-প্রার্থী ও আকাংক্ষী। অন্যথায় কোথায় এই জালিম, মূর্খ ও ধ্বংসশীল মানব আর কোথায় সেই পবিত্র মহান সত্তা। ليس كمثله شيء তাঁর অনুরূপ আর কোন সত্তা নেই।

"অনুগ্রহের দরোজা খোলা রয়েছে আর দস্তরখান সামনেই রয়েছে পাতা। জলদী কর এবং নিজেকে তার মধ্যে শামিল করে নাও। হে ভ্রাতঃ! মানুষ কী করে মানুষকে চাইবে? কিন্তু অসীম সেই অনুগ্রহের ভাণ্ডার---তা প্রভুকে যেমনি পরিত্যাগ করে না, তেমনি পরিত্যাগ করে না গুলামকেও; বিত্ত-সম্পদের মালিককে যেমন ছেড়ে দেয় না, তেমনি ছেড়ে দেয় না বিত্তহীন ফকীরকেও। যেমনি সূর্য যখন তার উদয় পথে এসে দেখা দেয়, যদি দুনিয়াবাসী সাহসে কোমর বাঁধে যে, তার উজ্জ্বল নূরের একটি বিন্দু পরিমাণও সে হাতে উঠিয়ে নেবে, তাতে সে সক্ষম হবে না। কিন্তু সে স্বয়ং স্বীয় বদান্যতা ও অনুগ্রহ বিতরণের সাধারণ নীতি অনুসারে যেমনি করে শাহী-প্রাসাদ ও আমীর-উমারাদের বাসগৃহের উপর চমক সৃষ্টি করে, তেমনি গরীব ও অসহায় লোকদের দুঃখের কুঁড়ে ঘরকেও আলোক-উদ্ভাসিত করে তোলে। তুমি পানি ও মাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না,—সেই সম্পদ ও সৌভাগ্যের দিকে তাকাও, তাকাও يحبهم ويحبونه (আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন আর তারাও আল্লাহকে

---

১. ৫৬তম পত্র।

ভালবাসে)-এর নির্দেশের প্রতি। এক জায়গায় বলেন اللہ ولی الذین امنوا (আল্লাহ ঈমানদারগণের বন্ধু), আবার অন্যত্র বলেন, وسقاھم ربھم (আর তাদের 'রব' তাদেরকে পান করান)। আল্লাহ্র মুকার্রাব ফেরেশতাগণও এই 'ইয্যত ও খেলা'ত লাভে সক্ষম হয়নি যা তোমরা হাসিল করেছ। ফেরেশতাকূল মুকার্রাব (নৈকট্যপ্রাপ্ত) ও নিষ্পাপ, পাক ও পবিত্র, নিত্য তসবীহ পাঠকারী ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী এবং বিরাট রূহানী শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু পানি ও ফুলের ব্যাপারই আলাদা।"

দয়ালু সমালোচক

রহমতের এই ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি, এবং খোদ দয়ালু সত্ত্বার সহায়তা, প্রতিকারের উপায় ও সমালোচনার ভিত্তিতে তিনি বড় বড় পাপে লিপ্তদেরকে দাওয়াত দেন যেন তারা আল্লাহ্র সান্নিধ্যে ও নৈকট্যে ফিরে আসে এবং খাঁটি অন্তরে তওবাহ করে স্বীয় কিসমত (ভাগ্য) ও স্বীয় হাকীকতের ভেতর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে নেয়। তিনি এই সুযোগে গুনাহগারদের এবং ঐসব মূল্য-হীন বস্তুকে স্মরণ করিয়ে দেন যাদের ও যেসবের দেখতে দেখতে ভাগ্যই পাল্টে গেছে এবং মূল্যহীন বস্তুও অমূল্য বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। গুনাহ্র মাত্রা ও পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন, আল্লাহ্র রহমত তার থেকেও অনেক বেশী বিস্তৃত, ব্যাপক, শক্তিশালী ও বিজয়ী। সওদাকৃত বস্তু যতই দোষত্রুটি ও খুঁতযুক্ত হোক না কেন, যখন কট্টর সমালোচক খরিদ্দার তা খরিদ করে নিয়েছে, তখন আর তাতে দোষ কী থাকে আর কারই-বা এত স্পর্ধা যে, তার ভেতর থেকেও দোষত্রুটি খুঁজে বের করে।

তিনি বলেন---

"হে ভ্রাতঃ! তুমি যতই পাপে লিপ্ত হয়ে থাক না কেন, তওবার আঁচল আকড়ে ধর এবং আল্লাহ্র রহমতের প্রতি আশাবাদী হয়ে যাও। কেননা তুমি ফেরাউনের দরবারের যাদুকরদের থেকে নিশ্চয়ই অধিক পাপী নও আর আসহাবে কাহাফের কুকুরের চেয়ে বেশী ময়লা ও অপবিত্রও নও; তূর পাহাড়ের পাথরের তুলনায় অধিকতর নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ অথবা "সতূনে হান্নানা"[১] থেকে বেশী মূল্যহীনও তুমি নও।"

---

১. "সতূনে হান্নানা" মসজিদে নববীর সেট খুঁটি যার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) খুতবাহ দিতেন। মিম্বরে নববী নির্মিত হবার পর তার উপর দাঁড়িয়ে খুতবাহ্ দিলে বিচ্ছেদ ব্যথায় তার থেকে অস্ফুট স্বরে কান্নার আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল।

তওবার তা'ছীর

তওবাহ দ্বারা মানুষের অবস্থার পরিবর্তন এবং তার তরক্কী ও কামালিয়াত হাসিল হয়ে থাকে। তওবার অবস্থা ও তার শর্তাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—

"এক প্রকারের তওবাহ এভাবে হয় যে, মুরীদ তাতে অনুতপ্ত হয়। এই তওবাকে 'গরদিশ' (আবর্তন, বিবর্তন ও ঘূর্ণন) বলা হয়। অর্থাৎ আবর্জনা ও পাপ-পংকিলতার অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় সে পরিবর্তিত হয়ে গেল। গির্জা ছিল মসজিদে রূপান্তরিত হ'ল, পুতুল পূজার ঘর ছিল ইবাদতখানায় পরিণত হ'ল, বিদ্রোহী ও অবাধ্য ছিল, মানুষ হয়ে গেল; মাটি ছিল, সোনায় পরিণত হ'ল; ছিল অন্ধকার রাত্রি, দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে ঈমানদারের হৃদয়-মানসে ঈমানের প্রদীপ্ত সূর্য উদিত হয় এবং ইসলাম আপন সৌন্দর্য তুলে ধরে এবং সে (তওবাকারী) মা'রিফতের রাস্তা খুঁজে পায়।"

অষ্টম অধ্যায়

মানবতার সম্মান ও মর্যাদা

একটি বিপ্লবাত্মক দাওয়াত

কোন গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা প্রভাব সৃষ্টিকারী অংশের একটি অংশ সেটাই যেখানে মানুষের মর্যাদা ও মকাম, মানুষের অন্তঃকরণের উচ্চতা ও প্রশস্ততা, তার যোগ্যতা ও তরক্কীর সম্ভাবনা এবং মুহব্বতের কদর ও মূল্য তুলে ধরা হয়।

এ বিষয়ে কবিতায় হাকীম সানাঈ (রঃ), খাজা ফরীদুদ্দীন 'আত্তার (রঃ) এবং মাওলানা রূম (রঃ) অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু গদ্যে হযরত মাখদূমুল মুলুক বিহারী (রঃ)-এর 'মকতূবাত' (চিঠিপত্রাদি) থেকে অধিকতর শক্তিশালী, অলংকারপূর্ণ ও প্রভাবশালী কোন লেখা আজও আমার নজরে পড়ে নি। এগুলি পড়ে মানুষের অন্তরে আস্থা, মনোবল, সাহসিকতা, আশা-ভরসা, উন্নতি ও উর্ধ্বগতি এবং সেই চূড়ান্ত কামালিয়তের স্তর পর্যন্ত পৌঁছুবার একটা তীব্র আকাংক্ষার সৃষ্টি হয় যা একমাত্র মানুষের জন্যই নির্ধারিত এবং সেই হতাশা ও নিরাশা, স্বল্প মনোবল ও অনাস্থা, উদাসীনতা ও লজ্জাশীলতা বিদূরিত হয় যা কতক অদূরদর্শী ও মোটা বুদ্ধির প্রচারকরা সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং যার পরিণতিতে মানবতা উলঙ্গ-অনাবৃত ও সংশোধনের অযোগ্য একটি স্বাভাবিক ত্রুটি এবং ক্ষতিপূরণের অতীত একটি বিচ্যুতি ও অপরাধে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং গুহা ও প্রাচীর গাত্র থেকে এই আওয়াজই আসতে শুরু করেছিল,---
وجودك ذنب لا يقاس به ذنب (তোমার অস্তিত্বই একটি পাপ যার সমকক্ষ পাপ আর একটিও নেই।) এবং এটাই বুঝানো হচ্ছিল যে, মানুষের উন্নতির পথে খোদ মানবতা সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক ও একটি দুস্তর বাঁধা যাকে রাস্তা থেকে হটানো মানুষের জন্য সর্বাধিক জরুরী। মানুষ নিজেকে ফেরেশতাদের ঈর্ষা ও সিজদার পাত্র হিসাবে মনে করার পরিবর্তে ফেরেশতাদের ঈর্ষা করতে শুরু করেছিল এবং জড় প্রকৃতি ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের গুণাবলী সৃষ্টি এবং তাদের (ফেরেশতাদের) তকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) করার খাহিশমন্দ হয়ে পড়েছিল।

এরূপ পরিবেশে হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মুনায়রী (রঃ) একটি অচেনা আওয়াজ উঠালেন এবং এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে ও আলংকারিকভাবে মানবতার সমুন্নতি, মানুষের উচ্চ মর্যাদা ও প্রেমময়তা এবং তাঁর 'খলীফাতুল্লাহ' হবার ঘোষণা দিলেন এবং এই বিষয়টিকে তাঁর "মকতুবাতে" এত পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বিভিন্ন কায়দা-কানুন ও প্রথা-পদ্ধতিতে একে বর্ণনা করলেন যে, যদি সেগুলি এক জায়গায় জমা করা হয় তাহলে এ বিষয়ে এমন একটি সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠবে যা পড়ে মানুষের মন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উত্তেজনার প্রাবল্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং মানুষের বিমর্ষ অন্তঃকরণে ও মৃতপ্রায় দেহে নবজীবনের সঞ্চার হবে, আর স্বীয় মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্য সে গর্ববোধ করবে।

স্রষ্টার বিশেষ দৃষ্টি

এক পত্রে তিনি লিখেছেন যে, অস্তিত্ব ও সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যা তো অনেকই ছিল এবং একটি অপেক্ষা অন্যটি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু প্রেমাস্পদতা ও খেলাফতের গর্বপূর্ণ খেলা'ত দুর্বলভাবে সৃষ্ট মানুষের দেহ কাঠামোতেই যেন যথাযথ মানাচ্ছিল। মানুষ নিশ্চয়ই ফেরেশতাদের মত 'মা'সূম' (নিষ্পাপ) ছিল না। তার পক্ষে গুনাহ্‌তে লিপ্ত হওয়া কিংবা তার থেকে কোন অন্যায় ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু সৃষ্ট জগতের মহান স্রষ্টার কৃপাদৃষ্টি সব কিছুই শুধরে নেবার জন্য যথেষ্ট এবং এটা সেই 'পাসঙ্গ' (পাথর যা দাড়ি-পাল্লার উভয় দিক ঠিক রাখার জন্য দেওয়া হয়) যা পাল্লার যে দিকেই রাখা হবে সে দিকই নিঃসন্দেহে ভারী হবে এবং ঝুঁকে যাবে। তিনি বলেন,—

"অস্তিত্বমান ও সৃষ্ট বস্তুর সংখ্যা তো বেশুমার। কিন্তু কোন অস্তিত্বশীল বস্তুর সঙ্গেই সেই কায়কারবার ছিল না যা ছিল পানি-মাটি মিশ্রিত এই জড়-পিণ্ডটির সঙ্গে। যখন তিনি চাইলেন অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল 'ইয্যতের যখন মঞ্জুর হ'ল যে, মাটির এই জড়পিণ্ডটিকে অস্তিত্বময় রূপ দান করবেন এবং খেলাফতের মহান দায়িত্বে সমাসীন করবেন, উর্ধ্বজগতের ফেরেশতাকুল তখন সমস্বরে আরয করল,—"আপনি যমীনের বুকে এমন একটি সৃষ্টিকে খলীফা বানিয়ে পাঠাতে চাচ্ছেন যারা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে।" মেহেরবান চিরন্তন সত্ত্বা জবাব দিলেন ليس فى الحب مشورة অর্থাৎ প্রেম কোনরূপ পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না, আর 'ইশ্‌ক ও তদবীরও একত্রিত হয় না। তোমাদের তসবীহ্ ও তাহলীলের কী মূল্য যদি তা আমার দরবারে কবুল না

হয় আর সে সব গুনাহেই বা কী ক্ষতি যদি আমার গৌরব-মহিমা ও অনুগ্রহ বিতরণকারী ক্ষমা ও মার্জনার পরশ তার উপর হস্ত বুলিয়ে দেয়।

فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

"অতঃপর ঐ সব লোকদের পাপরাশিকে আল্লাহ পাক সত্বর পুণ্যরাজিতে পরিবর্তিত করে দেবেন।" তবে হাঁ! তোমরা চিরদিনই সোজা-সরল রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত আর তারা চলবে চতুর্দিকে। কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে চাইলাম তখন রহমতের ফরাশ তাদের জন্য বিছিয়ে দিলাম। যদি গুনাহ তাদের কপালে কোন কলংক রেখা এঁকে দেয় তাহলে আমার মেহেরবানী তা মুছে দেবে। তুমি শুধু দেখছ যে, বিভিন্ন কার্যকলাপে আমি তাদের কাম্য, কিন্তু এটা দেখছ না যে মুহব্বতের ব্যাপারেও সে (মানুষ) আমার প্রার্থিত ও কাম্য। কোন কবি কী সুন্দরই না বলেছেন,

واذا الحبيب اتى بذنب واحد
جاءت محاسنه بالف شفيع

অর্থাৎ আমার "হাবীব" (প্রেমিক, বন্ধু) যখন একটি গুনাহ করে, তখন তার সৌন্দর্য ও গুণাবলী হাযারো সুপারিশপত্র নিয়ে এসে হাযির হয়।

মুহব্বতের আমানত

অন্য এক স্থানে মানুষের প্রেমময়তা ও বিশেষত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "মুহব্বতের সঙ্গে অন্য মাখলুকাতের কোন যোগসূত্র ছিল না। কেননা তাদের সাহসিকতা ও হিম্মত উন্নত ছিল না। ফেরেশতাদের কাজ-কর্মে তোমাদের যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়, তা এই কারণেই যে তারা প্রেমের বাণীর লক্ষ্যস্থল নয়, আর মানুষের রাস্তার মধ্যে যে উত্থান-পতন দৃষ্টিগোচর হয় তা এইজন্য যে, তাদের সঙ্গে মুহব্বতের ব্যাপার রয়েছে। অতএব যার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শেষ ভাগ পর্যন্ত মুহব্বতের খোশবু পৌঁছেছে তার উচিত শান্তি ও নিরাপত্তাকে সালাম জানানো এবং নিজেকে নিজ থেকে বিদায় দেওয়া। কেননা মুহব্বত কোন বস্তুরই পরওয়া করে না। আদম (আঃ)-এর কিসমত ও সৌভাগ্যের তারকা যখন উদিত হ'ল তখন সারা সৃষ্ট জগতে সৃষ্টি হ'ল একটি উত্তাল তরংগ। কথকরা বলল যে, এত হাযার বছরের তসবীহ ও তাহলীলকে উপেক্ষা করা হ'ল আর মাটির পুত্তলি আদম (আঃ)-কে করা হ'ল মর্যাদামণ্ডিত এবং আমাদের উপর দেওয়া হ'ল তাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার। আওয়াজ ভেসে এল,—তোমরা মাটির এই বহিরাঙ্গ দেখো না, সেই পবিত্র অমূল্য

রত্নটিকে দেখ যা তার অভ্যন্তরে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। ويحبهم ويحبونه মুহব্বতের জ্বলন্ত আগুন তাদের অন্তঃকরণে লাগানো হয়েছে।" [১]

অপর এক পত্রে এই বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—আল্লাহ পাক আঠারো হাযার 'আলম পয়দা করেছেন। কিন্তু এ সব মাখলুকাত হৃদয়ের জ্বালা ও মুহব্বতের বাণীর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং এর থেকে কোন অংশও তারা লাভ করেনি। এই মূল্যবান সম্পদ একমাত্র মানুষের হিস্যায় এসেছে। অস্তিত্বশীল বস্তুর অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে কারুর ভাগ্যেই এই সৌভাগ্য লাভ ঘটেনি।

হাসিলে ওজুদ ঃ মানুষের অস্তিত্ব লাভ

অপর আর এক চিঠিতে পানি ও মাটির 'কিসমত' (ভাগ্য) ও 'ইয্যত' (সম্মান)-এর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, "হে আমার ভ্রাতঃ! মাটি-পানির সৌভাগ্য কিছু মাত্র কম নয় এবং আদম (আঃ) ও আদম বংশধরের মরতবা কোন মা'মুলী ব্যাপার নয়। 'আরশ, কুরসী, লওহ ও কলম, আসমান-যমীন সবই মানুষের বদৌলতেই। উস্তাদ আবু 'আলী দাক্কাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে স্বীয় খলীফা বলেছেন,—হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীলুল্লাহ উপাধি দান করেছেন—واتخذ الله ابراهيم خليلا এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর শানে ইরশাদ হয়েছে واصطنعتك لنفسى অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করেছি; আর মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে يحبهم ويحبونه (আল্লাহ তাদের ভালবাসেন আর তারাও আল্লাহকে ভালবাসে)। লোকেরা বলেছে যে, যদি এই প্রেম ও মুহব্বতের বাণীর সঙ্গে দীলের কোন সম্পর্ক না থাকত তবে 'দীল'কে দীল বলার কোনই অধিকার থাকত না, আর মুহব্বতের সূর্য যদি আদম (আঃ) এবং তার বংশধরদের মনে-প্রাণে আলো ও কিরণ দান না করত, তবে আদম (আঃ)-এর ব্যাপারটাও অন্যান্য অস্তিত্বশীল বস্তুর মতই হ'ত।"

আমানতের বোঝা

মানুষের উন্নত মর্যাদা ও তার বৈশিষ্ট্য সেই আমানতের বোঝা কাঁধে উঠাবারই পরিণতি, যা কবুল করতে আসমান-যমীন এবং পাহাড়সমূহ বিনীতভাবে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল এবং এই জালিম ও জাহিল মানব তাকে আপন দুর্বল

---

১. ৪৬ নং পত্র

কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিল। তার এই সহায়হীনতা কাজে লাগল। মাটির বিন্দু চিন্তা করল যে, যদি এই বিরাট ও মহান দায়িত্বের যথাযথ হক আদায়ে কোনরূপ অবহেলা ও বিচ্যুতি ঘটে যায়, তবে তার কাছে এমন কীই-বা আছে যা (শাস্তিস্বরূপ) ছিনিয়ে নেয়া হবে।

"পানি ও মাটির মরতবা অতি উচচ এবং হিম্মত অতি বৃহৎ। দারিদ্র, ভিক্ষাবৃত্তি, সম্পদহীনতা যদিও তার জড়পিণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট, তবু যখন আমানতের প্রদীপ্ত ভাস্কর আসমানের বুকে স্বীয় অস্তিত্বের প্রোজ্জ্বল ঘোষণা দিল, জগতের ফেরেশতাকুল যারা সাত লক্ষ বছর ধরে আল্লাহ পাকের তসবীহ ও পবিত্রতা ঘোষণার ফুল্লকাননে স্বীয় খোরাক সংগ্রহ করছিল এবং نحن نسبح بحمدك ونقدس لك (আমরাই তোমার তসবীহ পাঠ করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি)-এর সরব ধ্বনি উচচারণ করছিল,—অতি বিনীতভাবে নিজেদের অসহায়তা প্রকাশ করল এবং দুর্বলতার স্বীকৃতি দিল فأبين أن يحملنها ("অতঃপর তারা দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল।) আসমান বলল,—আমার গুণ হ'ল আমার উচচতা; যমীন বলল,—আমার খেলাত (পুরস্কার) হ'ল আমার মাটিময় বিছানা; পাহাড় বলল,—আমার পদ তো পাহারাদারী এবং এক পায়ের উপর মহান স্রষ্টার নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা; ধনসম্পদ তথা রত্নরাজি বলল,—আমার সীমার মধ্যে যেন চুলও প্রবেশ না করতে পারে। এরপর নির্ভীক মাটির বিন্দুটি দারিদ্র ও অনটনের আস্তিন থেকে আবেদনের হাতখানি বের করল এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের মহান আমানতের বোঝাকে বুকে উঠিয়ে নিল; চিন্তা করলনা ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তুরই। সে বলল,—আমার কাছে আছেই বা কী যা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যখন কোন বস্তুকে হেয় ও লাঞ্ছিত করা হয় তখন তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আমি মাটি, আমাকে কার সঙ্গে মিশানো হবে? সে পুরুষোচিত দৃপ্ত পদভঙ্গীতে সম্মুখে অগ্রসর হ'ল এবং সেই বোঝা যা সপ্তাকাশ ও যমীন বহনে সাহসী হয় নি হাসি-খুশীর সঙ্গে উঠিয়ে নিল এবং "আরও অতিরিক্ত বেশী কিছু আছে কী"-এর সরব ধ্বনি উচচারণ করল।"[১]

মাটির ঢেলার সৌভাগ্য

অন্য এক জায়গায় লিখেছেন যে,—"মুহব্বতের বাজপক্ষীর আদম (আঃ)-এর পবিত্র বক্ষ ব্যতিরেকে আর কোথাও নীড় মেলে নি। আসমানের উচচতা

১. ৪৯ নম্বর পত্র;

এবং 'আরশ-কুরসীর বিশালতা পাড়ি দিয়ে সে প্রেমিকের হৃদয়কে স্বীয় বাসা বানিয়েছে ;" একই আলংকারিক কারুকার্যমণ্ডিত কলম দিয়ে তিনি লিখেছেন,

'পানি ও মাটিকে কম (মূল্যের) মনে ভেবো না। যা কিছু কামালিয়াত পানি ও মাটির ভেতরেই আছে এবং যা কিছুই এই দুনিয়ায় এসেছে, মাটি ও পানির সঙ্গেই এসেছে। এ সব ভিন্ন আর যা কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় তা দেওয়াল চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।'

অন্য এক স্থানে মানুষের মরতবা বর্ণনা করতে গিয়ে এবং তার অবস্থার উপর তার স্রষ্টার অনুগ্রহ ও কৃপা এবং মুহব্বতের দৃষ্টি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

"হে ভ্রাতঃ! স্রষ্টার এই মাটি ও পানির সঙ্গে একটি বিশেষ লেনদেনের ব্যাপার এবং বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, যখন মালাকুল মওত এই উম্মতের কারও জান কবয করেন, তখন মহান মর্যাদার মালিক রাব্বুল 'ইয্যত তাকে লক্ষ্য করে বলেন, আগে তাকে আমার সালাম পৌঁছাও, তার পরেই তার রূহ কবজ কর। তুমি কুরআন মজীদে পড়ে থাকবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কোন প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়াই মু'মিনদের সালাম বলবেন— سلام قولا من رب رحيم - অর্থাৎ সালাম! শান্তি! দয়ালু প্রতিপালকের তরফ থেকে বাণী।" যেমনি "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"— তাঁর কালাম চিরন্তন---তাঁর সালামও তেমনি চিরন্তন। যদি মাটির এই মুষ্টির সঙ্গে এই চিরন্তন অনুগ্রহ ও কৃপা-দৃষ্টি না হ'ত তাহলে শেষ দিবসে তাকে সালামও করা হ'ত না।

আল্লাহ্‌র গুপ্ত-রহস্যের বাহক

অপর এক চিঠিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, তার খেলাফতের পদ এবং তার উচচ মনোবলের পেছনের গোপন-রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, মানুষ আল্লাহ্‌র গুপ্ত-রহস্যের অধিকারী এবং তাকে ونفخت من روحى (আর আমি ফুৎকার করলাম আমার রূহ)-এর সৌভাগ্য দ্বারা মণ্ডিত করা হয়েছে। রেসালত, আসমানী সহীফা, আল্লাহ্‌র দীদার লাভের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ তারই বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত। তিনি বলেন—

"আল্লাহ তা'আলা আঠারো হাযার 'আলমের মধ্যে কোন শ্রেণীকেই মানবশ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর উচচ মনোবলসম্পন্ন করে পয়দা করেন নি এবং কোন শ্রেণী সম্পর্কেই نفخت من روحى-এর ন্যায় ইরশাদ করেন নি—

কোন শ্রেণীর মাঝেই বার্তাবাহক নবী প্রেরণ করেন নি . — নাযিল করেন নি কারও প্রতি আসমানী কিতাব কিংবা কোন শ্রেণীকেই পাঠান নি সালাম ;—স্বীয় দীদাররূপ মহামূল্যবান নে'মত দিয়েও কাউকে ধন্য করেন নি। একমাত্র মানুষই তো ছিল, যে স্বীয় মুহব্বতের শক্তি ও উচ্চ মনোবলের কারণে বিচ্ছেদের জ্বালা বহনে সক্ষম নয়। দুনিয়ার মাঝে তার দীলের পর্দা উঠিয়ে নিয়েছেন আর পরিণাম দিবসে তার চোখ থেকে উঠিয়ে নেবেন পর্দা। এরই পরিণতিতে দুনিয়ার ভেতর সে তাঁকে ভিন্ন আর কারও নিকট প্রার্থী নয় এবং পরলোকে তাঁর সৌন্দর্য ভিন্ন তার চোখ কিছুই দেখেনি। এই সবক মানবকুল ما زاغ البصر وما طغى (দৃষ্টি শক্তি আচ্ছন্ন হয় নাই—এবং সে বিদ্রোহও করে নাই) এর মকতবে অধ্যয়ন করেছিল।

সিজদা ও ঈর্ষার পাত্র

অন্য এক জায়গায় মানুষের সেই মর্তবা বর্ণনা করতে গিয়ে, যার কারণে সে ফেরেশতাকুলের সিজদার এবং অন্যান্য তামাম সৃষ্টিকুলের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছিল, লিখেছেন,—

"হে আমার ভ্রাতা। যে বস্তু তোমাকে ফেরেশতাদের সিজদার এবং অন্যান্য সৃষ্টিকুলের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত করল তা খুবই বিরাট। মানুষ স্বীয় মাটির অস্তিত্বে যতই ধূলি-ধূসরিত হোক না কেন, মৌলিক দিক দিয়ে এতখানি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময় ও পবিত্র যে, ফেরেশতাসুলভ আছর এবং মানবীয় কল্পনাবৃত্তি তার হাকীকত উপলব্ধি করতে অক্ষম ও দুর্বল। যখন এই অর্থের আলোক-শিখা প্রোজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, তখন ফেরেশতাকুল হয়রান এবং আসমান চিন্তাকুল হয়ে পড়ে।"

সতর্ক দীল

কিন্তু মানুষ ও মানব শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব সেই এক টুকরো গোশতের কারণে – যাকে হৃদয় বলা হয় এবং হৃদয়ের কদর ও কীমত এবং জীবন ও জীবনী-শক্তির মূল্য সেই রত্নের কারণে যাকে মুহব্বত বলে। দীল সম্পর্কে তিনি বলেন,—

"আল্লাহ পাক আরশ পয়দা করলেন এবং আল্লাহ্‌র মুকার্রাবগণের নিকট সোপর্দ করলেন; বেহেশত পয়দা করলেন এবং রিদওয়ানকে তার পাহারা-দারীর দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন; দোযখ সৃষ্টি করলেন, আর মালিককে তার

দারোয়ান নিযুক্ত করলেন। কিন্তু মুমিনের দীল যখন পয়দা করলেন, বললেন—'দীল' রাহমানের (কুদরতী) দুই আঙ্গুলীর মাঝখানে অবস্থিত।" (القلوب بين اصبعين)[২]

অপর একটি পত্রে তিনি 'দীলের বিশালতা, প্রশস্ততা ও শক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "যদি কোন বস্তু 'দীল' অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও মূল্যবান হ'ত তবে তিনি (আল্লাহ) তাঁর মা'রিফতের মণি-মুক্তারূপ সম্পদ তার ভেতরই রাখতেন। আল্লাহ্ পাকের সেই নির্দেশের এটাই অর্থ যে :

لا يسعنى سمائى ولا ارضى ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن

অর্থাৎ "আসমানে আমার স্থান সংকুলান হয় না, সংকুলান হয় না আমার স্থান যমীনেও ; কিন্তু মু'মিন বান্দাহ্‌র অন্তরে আমার স্থান সংকুলান হয়।" আসমান আমার মা'রিফতের উপযুক্ত নয়, যমীনও এর উপযোগী নয় ; একমাত্র মু'মিন বান্দাহ্‌র 'দীল'ই এই পর্বত প্রমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের পবিত্র আমানতের বোঝা কাঁধে উঠিয়েছে। রুস্তমের ঘোড়াই একমাত্র রুস্তমকে পিঠে বহন করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু আল্লাহ পাকের গৌরব মহিমা-সূর্য যখন পাহাড়ের উপর—যার অপেক্ষা অধিকতর জমাট শিলাবৎ ও বৃহৎ অবয়বধারী কোন কিছুই জগতে নেই—যখন একবার চমকাল তখনই তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল جعله دكا و। আর সেই সূর্য্য তিনশো ষাট বার মু মিনের দীলের উপর চমকিত হয় আর সে هل من مزيد[৩] (আরও অধিকতর কিছু আছে ?)-এর ধ্বনি উঠিয়ে থাকে আর ডেকে ডেকে বলে, الغياث-الغياث। আমি পিপাসার্ত ! আমি পিপাসার্ত ![১]

অধিকতর পরাজিত, অধিকতর প্রিয়

'দীল'-এর একটি বিশেষত্ব এও যে, প্রতিটি বস্তুই ভেঙে যাবার পর মূল্য-হীন হয়ে যায়—কিন্তু এটা যতবারই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়—ততই তা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয়।[২] তিনি বলেন,—

---

১. ৪৩ নম্বর চিঠি ;

২. ৩৮ নম্বর পত্র

৩. এটাকেই ইকবাল এভাবে বলেছেন :

نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے' ترا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو
تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

"হে ভ্রাত! ভাঙা জিনিসের কোন মূল্য নেই,--কিন্তু 'দীল' (অন্তর) যত টুকরো টুকরো হয় ততই তা অধিক মূল্যবান বিবেচিত হয়। মূসা (আঃ) একবার অতি সংগোপনে আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—তোমাকে কোথায় তালাশ করবো? জবাব মিলেছিলো,—"আমি সেই সমস্ত লোকের নিকট বেশী থাকি যাদের অন্তর আমারই কারণে ভেঙে টুকরো হয়ে যায় (اين اطلبك قال انا عند المنكسرة قلوبهم)।"[১]

মুহব্বতের রাজত্ব

অন্তরের পুঁজি হ'ল মুহব্বত আর মুহব্বত গোটা সৃষ্টি জগত ও সমস্ত সময়টাকে ঘিরে রেখেছে। ইহ জগত থেকে পরজগত পর্যন্ত এর প্রভাব অব্যাহত। হযরত মুনায়রী (রঃ) বলেন,—

"মুহব্বতের বাণী তিন কাল (অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত)-কেই ঘিরে রেখেছে। আদি অন্ত ও মধ্যবর্তীতে এরই রাজত্ব। বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—এজগত ও সেজগত সবই চাইবার জন্য। যদি কেউ বলে যে, সে জগত চাইবার জগত নয়। হাঁ! তবে সালাত ও সিয়াম পালিত হবে না--কিন্তু চাইবার থাকবে। কিয়ামতের দিন তামাম হুকুম-আহকামের উপর কলম 'মনসূখ' ও 'বাতিল' হয়ে যাবে, কিন্তু এই দু'টি জিনিস চিরদিনের তরে চিরকালের তরে থাকবে আর তা হ'ল আল্লাহ্‌র জন্যই প্রেম—এবং আল্লাহ্‌র জন্যই সমগ্র প্রশংসা।[২]

১. ৪৬ নম্বর পত্র;
২. ৪৬ নম্বর পত্র;

নবম অধ্যায়

বিশ্লেষণসমূহ ও উচ্চতম জ্ঞান

উচ্চতম ও সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং নিবন্ধসমূহ

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (রঃ)-এর মকতূবাতে অমূল্য বিশ্লেষণ এবং উন্নত সূক্ষ্ম জ্ঞান ও নিবন্ধরাজির এমন একটি ভাণ্ডার রয়েছে যা হাকীকত, মা'রিফতের খুব কম গ্রন্থেই মিলবে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে এমন সব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস, শত শত বছরের রিয়াযত এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি যা পড়বার পর উন্মত্ততা ও মিষ্টি অনুভূতির এমনই একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যা কোন বড় বড় আনন্দঘন সাহিত্য-কথিকা ও রসাল-কাব্য থেকে লাভ করা যায় না।

ওয়াহ্‌দাতুশ্ শহূদ

এই গ্রন্থে এমন কতক বিশ্লেষণও পাওয়া যায় যে সম্পর্কে বিজ্ঞজন মহলে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, তা কয়েক শতাব্দী পরের বিশ্লেষণ এবং যে শতাব্দীতে (অষ্টম শতাব্দী) হযরত মাখদূম (রঃ) জীবিত ছিলেন—সেই শতাব্দীর কোন লোকই এর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এসব বিশ্লেষণের অন্যতম হ'ল, "তওহীদে শহূদী" বা "ওয়াহ্‌দাতুশ্ শহূদ"-এর মতবাদ। এই মতবাদ বিশ্লেষণের চর্চা বস্তুত হিজরী একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়; হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রঃ) যখন "ওয়াহ্‌দাতুল ওজূদ" এর সমান্তরাল এর দাওয়াত ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা—বিবরণী পেশ করেন এবং এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে —তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতি ও তবলীগ, তাঁর প্রচারের অবলম্বন—হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রঃ)-এরই দান এবং তিনিই এই মসয়ালায় ইমাম ও মুজাদ্দিদের মর্যাদা রাখেন। কিন্তু এটা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, দু'শো-আড়াই শো বছর পূর্বে মাখদূমুল মুল্‌ক শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ)-এর মকতূবাতেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই মসয়ালার বর্ণনা মিলে। তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উক্ত মকামের বিশ্লেষণের আলোকে এটা প্রমাণ করেছেন যে, সাধারণভাবে যাকে 'ওয়াহদাতে ওজূদ' এবং অসত্যের শুধুমাত্র নিশ্চিহ্ন ও পরিপূর্ণ ধ্বংস মনে করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে 'ওজূদে

হাকীকী' বা বাস্তব অস্তিত্বের সামনে অন্যান্য অস্তিত্বশীল বস্তুর এমনভাবে নিষ্প্রভ ও পরাভূত হয়ে যাওয়া যেমনি সূর্যের প্রদীপ্ত আলোকের সামনে তারকারাজির রৌশনী নিষ্প্রভ এবং তার সত্ত্বার অস্তিত্ব গুরুত্বহীন হয়ে যায়। তিনি দু'টি শব্দে এই গুরুত্বকে এভাবে বর্ণনা করেন যে ;

نابودن دیگر است و نادیدن دیگر -

অর্থাৎ "কোন বস্তুর অস্তিত্বহীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এক জিনিস, আর দৃষ্টিগোচর না হওয়া অন্য জিনিস।" তিনি আরও বলেন,—এটা এমন একটি নাযুক ও সঙ্গীন স্থান যেখানে অনেক বড় বড় লোকেরও পদস্খলন ঘটে গেছে এবং যেখানে একমাত্র আল্লাহ্‌র তওফীক ও খিযির (আঃ)-এর মতো কামিল ওলীর পথ-প্রদর্শন ও নেতৃত্ব ব্যতিরেকে হাকীকতের সংকীর্ণ পথের উপর কায়েম থাকা কঠিন।

"সত্য-প্রকাশের নূর থেকে 'সালিক' (আধ্যাত্মিক পথের পথিক)-এর উপর এভাবে জাহির হয় যে, সমগ্র অস্তিত্বশীল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুর আকার উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি তার উজ্জ্বল প্রভায় তার দৃষ্টি থেকে ঢাকা পড়ে যায়—যেভাবে সূর্যের প্রখর দীপ্তির সামনে অনু-পরমাণুবৎ আলো আড়াল হয়ে যায় এবং সে সব ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বস্তুর অস্তিত্বই নেই কিংবা অণু-পরমাণুগুলো সবই সূর্যে পরিণত হয়ে গেছে। বরং কথা এই যে, সূর্যের প্রখর রশ্মি জাহির হবার পর অনু-পরমাণুগুলোর মুখ লুকানো ছাড়া প্রকাশ্যে চেহারা দেখাবার কোনই পথ নেই। তেমনি একথাও ঠিক নয় যে, বান্দাহ্ খোদা হয়ে গেছে—تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا কিংবা বান্দাহ্‌র অস্তিত্ব বাস্তবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া ও নিশ্চিহ্ন হওয়া এক জিনিষ আর দৃষ্টিগোচর না হওয়া অন্য জিনিস। কবি 'আরিফ ঠিকই বলেছেন,—

پیش توحید او نه کہنه است نه نو است

همه هیچ اند هیچ اوست که اوست

যখন তুমি আয়না দেখ তখন তুমি আয়নাকে দেখনা এই জন্য যে, তুমি তখন আপন সৌন্দর্যে বিভোর থাকো। আবার এও বলতে পারনা যে, আয়নার অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে অথবা আয়না তোমার সৌন্দর্যের রূপ নিয়েছে অথবা তোমার সৌন্দর্যই আয়না হয়ে গেছে। 'কুদরত'কে শক্তিসমষ্টির ভেতর এভাবেই দেখা যায়---যাকে সূফীগণ ফানা-ফিত্ তাওহীদ বলেন।

বহু লোকের কদমই এই জায়গায় পিছলে গেছে। আল্লাহ্‌র তওফীক, চিরন্তন অনুগ্রহ এবং মুর্শিদের পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্ব ব্যতিরেকে এই প্রান্তর কেউ সহজে অতিক্রম করতে পারে না।"

পরিবর্তন ও বিবর্তন গুণাবলীর মধ্যে, সত্তার মধ্যে নয়

এক্ষেত্রে এই সন্দেহ দেখা দেয় যে, সূর্যের সামনে অন্যান্য আলোর নিষ্প্রভ হয়ে যাবার যে উদাহরণ দেওয়া হ'ল এবং তা থেকে এটা প্রমাণ করা হ'ল যে, আলো নিশ্চিহ্ন হয় না, শুধুমাত্র সূর্যের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং তার অস্তিত্ব অবজ্ঞেয় দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ ঘটনা তো এই যে, সূর্যের সামনে প্রদীপের কোন যথার্থতাই থাকে না, তার অস্তিত্বকে অস্তিত্ব বলাই ঠিক নয়। সে তো তার মুকবিলায় নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। একই বস্তু একই সময়ে অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীন হতে পারে না। শায়খ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এই যে, পরিবর্তন তা গুণাবলীর ক্ষেত্রে, সত্ত্বার ক্ষেত্রে নয়। সূর্য পানির ঝর্ণায় উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হয়, পানিকে উত্তপ্তও করে তোলে। এর দ্বারা পানির গুণের পরিবর্তন সংঘটিত হয়, পানির মৌলিকত্বে কোন পরিরর্তন ঘটে না—আর পানি কোন অর্থেই সূর্যে পরিণত হয় না।

দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তুর নড়া-চড়া চোখে পড়ে না

কামিল ও পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের তরক্কী, আধ্যাত্মিক মকামসমূহ অতিক্রম এবং তাদের বাতেনী অবস্থা এমন হয়ে থাকে, যেগুলি— এ পথের প্রাথমিক মুসাফির এবং কখনো ও কোন সময় তাদের সম-সাময়িকেরাও জানতে পারেন না। আম্বিয়া 'আলায়হিমুস সালাম এবং কামালিয়াতের ওয়ারিশান ও কামিল আওলিয়াদের কামালিয়াতের অবস্থাসমূহ এমনই সূক্ষ্ম, নাযুক ও গোপনীয় হয় যে, অধিকাংশ সময়ই তাদের সমসাময়িক এবং সাহচর্যে অবস্থান-কারী ব্যক্তিবর্গ সে সব থেকে অপরিচিত ও নাওয়াকিফ থাকেন। এবং ঐ সমস্ত উন্মত্ত ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, আকর্ষণ ও সলূকের অধিকারীকে প্রাধান্য দেন যারা তাদের পদদ্বয়ের পার্শ্বে পৌঁছুবারও ক্ষমতা রাখেন না। এসব কামিল মহাত্মাগণ যাদেরকে আল্লাহ পাক অতি উন্নত মানের প্রতিভা, উন্নত মনোবল ও অসীম ধৈর্যশক্তি দান করেন। তারা না জামার কলার ছিড়ে ফেলে আর না তারা ধ্বনি উঠায়, তারা উন্মত্তবৎ নাচতেও শুরু করেনা। তাদের থেকে অধিক

সংখ্যায় কারামত কিংবা অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডও সংঘটিত হয় না অথবা তারা নানামুখী দাবিও করেনা কিংবা কোন অবস্থার প্রকাশও হতে দেন না।

হযরত শায়খ (রঃ) লিখেছেন যে, গতি যত দ্রুত হবে ঠিক সে পরিমাণেই তার নড়াচড়া দৃষ্টিগোচর হবেনা। তিনি বলেন, ঝড়ো হাওয়া সবাই অনুভব করতে পারে, কিন্তু প্রাতঃসমীরণ যা হৃদয়ের পাপড়িদলের সঙ্গে কাতুকুতু খেলে, ফুলের বাগানকে দান করে নব-বসন্ত, এমনি মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হয় যে তার খবরও কেউ রাখেনা। এক পত্রে তিনি লিখেছেন—

"কোন বস্তুর গতি যখন দ্রুততর হয়ে ওঠে—তখন তা দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, পাথরের যাতা (চাক্কী) যখন দ্রুতবেগে ঘুরতে শুরু করে—তখন যে ব্যক্তি দেখে সে ভাবে যাতা বুঝি বন্ধই রয়েছে, পাথর বুঝি ঘুরছেনা। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ) কে কেউ বলেছিল যে, আপনি 'সামা' (এক প্রকার আধ্যাত্মিক সঙ্গীত) শ্রবণের সময় নিজের জায়গা থেকে এতটুকু নড়াচড়া করেন না। তিনি তখন নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন,—

وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب -

অর্থাৎ "তোমরা পাহাড় দেখে মনে ক'রো যে, তা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তা মেঘমালার মতোই সতত সঞ্চরণশীল।" তুমি আমার গতি দেখতে পাওনা,—গতি যখন দ্রুততায় পর্যবসিত হয় তখন তা আর চোখে পড়ে না। প্রাতঃসমীরণ এভাবে বয় যে, কেউ তার খবর রাখে না"।[১]

প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার উৎসাদন আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'ল তাকে পরাভূতকরণ

তরবিয়ত ও সংশোধনের ধারায় একটা বড় ভ্রান্তি এই যে, সত্যের বহু প্রার্থী ও সিদ্দীক প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার একেবারে জড়ে মূলে উৎসাদন চান এবং এটাকে তারা খুবই জরুরী মনে করেন। তারা বলেন যে, তরীকত ও মা'রিফত-পন্থীর অভ্যন্তরে প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার মূল উৎসও যেন বাকী না থাকে—। শায়খ মাখদূম (রঃ) বলেন, প্রবৃত্তির উৎসাদন আসল উদ্দেশ্য নয়—বরং পরাভূত-করণই মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইমাম গাযযালী (রঃ)ও তাঁর সুবিখ্যাত "এহ্ইয়াউল 'উলূম" নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন—যে, সংশোধন ও তরবিয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কাম ক্রোধ ইত্যাদিকে জড় থেকে উপড়ে নেয়া কিংবা কারুর প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে গুম করে দেওয়া নয়—বরং তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার

১. চতুর্থ পত্র ;

যোগ্যতা এবং তাকে পরাভূত করার শক্তি হাসিল করা। কুরআন মজীদের সূরায় তারিফের ক্ষেত্রে—و الفاقدين الغيظ (ক্রোধ উৎপাদনকারী) বলেনি, و الكاظمين الغيظ (ক্রোধ দমনকারী) বলা হয়েছে। মূলে যদি ক্রোধেরই উদ্রেক না হ'ত, তাহলে ক্রোধ দমনের কিংবা গিলে ফেলার প্রশ্ন দেখা দিত কী ভাবে? শায়খ (রঃ) অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন,—

"এটা সেই ব্যক্তির মূর্খতা ও আহম্মকী যে মনে করে যে, শরীয়তের দাবি প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা এবং মানবীয় গুণাবলী থেকে একেবারে পাক-পবিত্র হওয়া। তারা এটা চিন্তা করেনি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমিও মানুষ; কখনো আমিও রাগান্বিত হই। এবং তাঁর ক্রোধের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেতে দেখা যেত। আল্লাহ্ তা'আলার ফরমানে—و الكاظمين الغيظ (এবং ক্রোধ দমনকারী) বলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে—রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রকৃতিতে ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই বলে তাঁকে প্রশংসা করা হয় নি। আর শরীয়ত প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা থেকে মুক্তির দাবি কী করে করতে পারে যখন হুযুর (সাঃ)-এর ন'জন স্ত্রী বর্তমান ছিল। যদিও কারও প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা একদম নিঃশেষ ও নির্মূল হয়ে যায়—তবে তার চিকিৎসা করা দরকার—যেন তা পুনরায় ফিরে আসে এবং তার ভেতর তা পুনর্বপি সৃষ্টি হয়। কেননা পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি স্নেহ, জিহাদের ময়দানে কাফিরদের প্রতি ক্রোধ, সন্তান-সন্ততি তথা বংশের ধারাক্রম ও সুনাম বজায় রাখা—এসবই 'নফ্স' (প্রবৃত্তি) জাত অনুভূতি ও কামনা-বাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত। পয়গম্বরগণও (আঃ) এ আকুলতা ব্যক্ত করেছেন যেন তাদের বংশের ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু শরীয়তের দাবি এই যে, কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরাভূত রাখতে হবে, রাখতে হবে আহকামে শরীয়তের অধীন যেমনি ভাবে ঘোড়া লাগামের এবং কুকুর শিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কুকুরকেও ট্রেনিং-প্রাপ্ত হতে হবে। এমন যেন না হয়—যে, শিকারীর উপরই সে হামলা করে বসে। শিকারের জন্য ঘোড়ার আবশ্যকতাও রয়েছে। কিন্তু এমন ঘোড়ার দরকার যাকে পোষ মানানো হয়েছে,—নইলে সে স্বীয় আরোহীকে নীচে নিক্ষেপ করবে। ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয়জাত কামনা-বাসনাও ঠিক তেমনি কুকুর এবং ঘোড়ার মত। পারলৌকিক সৌভাগ্যকেও এ দু'টি বস্তু ব্যতিরেকে শিকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু শর্ত এই যে, তা হবে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে। যদি তা—প্রাধান্য পায় এবং বিজয়ী হয়—তাহলে এদু'টিই ধ্বংসের কারণ হবে। অতএব রিয়াযত ও মুজাহাদাহ্‌র আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'ল—এ দু'টি গুণাবলীকে পরাজিত ও পরাভূত করা এবং তা বাস্তবে সম্ভব।"

কারামতও (অলৌকিকতা) এক প্রকার মূর্তি

উপরে যে ভাবে বলা হ'ল যে, হযরত মাখদূম (রঃ)-এর যমানায় চারি দিকেই ছিল কারামতের চর্চা। জনসাধারণ একে বুযুর্গীর জন্য অপরিহার্য শর্ত এবং জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকভাবে গৃহীত হবার মাপকাঠি বলে মনে করতো। হযরত মাখদূম (রঃ) এই সাধারণ প্রবণতা ও প্রসিদ্ধির বিপরীতে এটাই প্রমাণ করতেন যে, কারামতও আহলুল্লাহ তথা আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তিদের জন্য একটা পর্দা—এবং আল্লাহ ব্যতিত অপর শক্তির সঙ্গে জড়িত ও লিপ্ত থাকার প্রমাণবহ। আর এদিক থেকেই এটা এক ধরনের মূর্তিও বটে যাকে অস্বীকার করা এবং এর হাত থেকে দূরে সরে থাকা কোন কোন সময় জরুরী হয়ে পড়ে।

"কারামতও এক ধরনের মূর্তি। কাফির মূর্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে—এবং এই সম্পর্ক রাখার কারণে সে আল্লাহ্র দুশমনে পরিণত হয়। যখন—মূর্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও মুক্ত থাকার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয় তখন সে আল্লাহ্র দোস্তে পরিণত হয়। 'আরিফগণের মূর্তি (বোত্) হচ্ছে কারামত। যদি কারামতের উপর কেউ তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে বঞ্চিত ও (আল্লাহ্র দরবার থেকে) বরখাস্ত হয়। আর যদি কারামতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার প্রকাশ ঘটায়, তাহলে (আল্লাহ্র) মুকার্রাব তথা নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ্গণের অন্তর্ভুক্ত হয় ও তাঁর দরবারে উপনীত হয়। একারণেই আল্লাহ পাক যখন তাঁর মকবুল বান্দাহ্গণের থেকে কারামতের প্রকাশ ঘটান তখন তাদের অন্তরে ভয়-ভক্তি ও বিনয় মিশ্রিত ভাবের আধিক্য ঘটে। দীনতা ও নম্রতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, বর্ধিত হয় তাদের ভীতি।"[১]

কাশ্ফ কারামত ও ইস্তিদরাজ

'সিদ্দীক' (সত্যবাদী বিশ্বস্ত ও আমানতদার) বান্দাহ্গণের 'কাশ্ফ' ও সঠিক দূরদৃষ্টির মাধ্যমে যে সব বিষয়ের প্রকাশ ঘটে এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য যে সব ঘটনাবলী তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, হতে পারে যে, কোন কোন লোকের বেলায় অনুরূপ বিষয়ের প্রকাশ ঘটে না। কিন্তু এর দ্বারা তাদের সম্পর্কে কোন আপত্তি উঠানো চলে না এবং তাদের কামালিয়াতের কোন ত্রুটিও এতে প্রমাণিত হয় না। আপত্তিজনক এবং ত্রুটিযুক্ত বস্তু বলতে 'ইস্তিকামত' (সুদৃঢ় ভিত্তি)-এর

১. অষ্টম পত্র;

সংকীর্ণ পথ থেকে সরে যাওয়া। 'সিদ্দীক'গণের উপর এভাবে যে সব বস্তু ও বিষয় উন্মোচিত হয়ে পড়ে তা তাদের 'একীন' বৃদ্ধির কারণ হয় এবং এর দ্বারা তাদের 'মুজাহাদাহ্'-এর মধ্যে অধিকতর পরিপক্কতা এবং তাদের সদগুণাবলী, উন্নত ও প্রশংসিত চরিত্রের মধ্যে আরও উন্নতি ঘটে। আর এ ধরনের অবস্থা যদি এমন লোকের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, যে ব্যক্তি শরীয়তের হুকুম-আহকামের পাবন্দ নয়, তাহলে সে এর পরবর্তী কারণ এবং এর ধোকা ও বোকামীর মাধ্যমে পরিণত হয়। সে এর ধোকায় পড়ে লোকদেরকে পর্যুদস্ত ও নিকৃষ্ট ভাবতে শুরু করে। কখনো এমন হয় যে, ইসলামের সম্পর্ক থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ সে আর মুসলমান থাকে না এবং সে 'আহকামে ইলাহীয়া' তথা ঐশী-বিধানের সীমারেখা এবং হালাল-হারামের অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়ে যায়। সে সুন্নতের অনুসৃতি পরিত্যাগ করে এবং 'ইলহাদ' ও 'যিন্দেকী' ভাবধারার শিকারে পরিণত হয়ে যায়।

সেবার মর্যাদা

'সালিক'-এর জন্য একটি মহান কর্ম 'খেদমত' বা সেবা। খেদমতের ভেতর সেই সমস্ত উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন 'ইবাদত ও আনুগত্যে নেই। এর একটি এই যে, সেবার কারণে 'নফ্স' (প্রবৃত্তি) মৃত হয়ে থাকে এবং তা থেকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব, অহংকার ও গর্ব বের হয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় বিনয়-নম্রতা। খেদমত তথা সেবা তাকে সভ্য ও সুজন বানিয়ে দেয়, তার চরিত্রকে সঠিকভাবে শুধরে দেয়, তাকে সুন্নত ও তরীকতের জ্ঞান শেখায়; নফসের অন্ধকার ও বিপদাপদ দূর করে দেয়। ইহা মানুষকে সূক্ষ্মদর্শী ও ক্ষীণ আত্মা বানিয়ে দেয়; তার ভেতর ও বাহির আলোকিত হয়ে যায়। এ সব উপকারিতা খেদমতের সঙ্গে নির্দিষ্ট। একজন বুযর্গকে কেউ প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছুতে কতগুলি রাস্তা রয়েছে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, অস্তিত্বশীল প্রাণী এবং দুনিয়ার মধ্যে যতগুলি অণু-পরমাণু রয়েছে, এতগুলিই রাস্তা রয়েছে আল্লাহর কাছে পৌঁছুতে। কিন্তু কোন রাস্তাই হৃদয়ের শান্তি ও তৃপ্তি দান অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও নিকটতর নয়। আমরা এই রাস্তা ধরেই আল্লাহকে পেয়েছি এবং আমাদের সাথে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে এরই ওসিয়ত করেছি।

'নফ্স' সংশোধনের তথা ইসলাহে নফস-এর মানদণ্ড

'ইসলাহে নফ্স' তথা নফ্সে সংশোধনের মানদণ্ড ঐ সব মহাত্মাগণের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উন্নত এবং মহান। বস্তুতপক্ষে এ ব্যাপারে তৃপ্তি লাভ করা খুবই

মুশকিল যে, নফ্‌স খোদায়ী দাবী থেকে পশ্চাদপসরণ এবং প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনাজাত বিষয়বস্তুর পাকড়াও থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে গেছে এবং 'তরবিয়ত' ও 'ইসলাহ্‌' (আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও সংশোধন)-এর সেই মকামে পৌঁছে গেছে যে, এখন তার উপর আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করা চলে। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (রঃ)-এর নিকট তার আলামত এই যে, সে স্বীয় খাহেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে অগ্রসর হবে না। শরীয়তের হুকুম মুতাবিক চলবে, শরীয়তের হুকুম-আহকামের তথা-বিধি বিধানের ক্ষেত্রে রুখসত কিংবা জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেবে না। যদি নফ্‌সের উপর কোন বিশেষ প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা এবং স্বভাব বিজয়ী থাকে তবে বস্তুতই সে সেই জানোয়ারের অনুরূপ, যে এই কামনা-বাসনার সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি ও প্রকাশস্থল। এক পত্রে তিনি বলেন—

"আমার ভ্রাত! মানুষের নফস বড় ধোকাবাজ ও প্রতারক। সে হামেশাই মিথ্যা দাবি ও বাগাড়ম্বর করে যে, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা আমার শাসনাধীন হয়ে গেছে। তার থেকে এর প্রমাণ চাওয়া উচিত এবং তার প্রমাণ একমাত্র এই যে, সে স্বীয় হুকুমে এক কদমও অগ্রসর হবে না, চলবে শরীয়তের নির্দেশ মাফিক। যদি সে সর্বদা শরীয়তের অনুসৃতি ও আনুগত্যে তৎপরতা প্রদর্শন করে তবে সে ঠিকই বলছে। যদি সে শরীয়তের বিধি-বিধানে নিজস্ব ইচ্ছা-অভিরুচি ও অভিপ্রায় মাফিক রুখসত ও জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চায় তবে সে হতভাগ্য,—এখন পর্যন্ত ফাঁদে পড়া বন্দী। যদি সে ক্রোধের দাস হয় তবে সে মানুষরূপী একটি কুকুর যদি সে হয় উদরের দাস অর্থাৎ পেটসর্বস্ব তবে স একটি আস্ত জানোয়ার; আর সে যদি হয় বদ প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার হাতে বন্দী, তবে সে নিকৃষ্ট শূকর; যদি সে বেশ-ভূষা ও সৌন্দর্যের গুলাম হয় তবে সে পুরুষরূপী স্ত্রীলোক। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে শরীয়তের আহকাম মাফিক সুসজ্জিত করে এবং নফসের পরীক্ষা নিতে থাকে, নিজ প্রবৃত্তির বাগডোরকে শরীয়তের হাতে তুলে দেয়, যে দিকে শরীয়ত ইংগিত করে সে দিকেই নিজ প্রবৃত্তিকে ঘুরিয়ে দেয়—কেবল তখনই বলা যায় যে, তার গুণাবলী তার শাসনাধীন ও নির্দেশানুগত হয়ে গেছে। অতএব যে সমস্ত লোককে আল্লাহ পাক দূরদৃষ্টি দান করে ছিলেন এবং যারা বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত স্বীয় নফসকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির লাগাম পরিয়ে রেখেছিলেন।" [১]

১. ৯৬ নম্বর পত্র;

দশম অধ্যায়

দ্বীনের হেফাজত ও শরীয়তের সাহায্য-সমর্থন

একটি সংস্কার ও সংশোধন-মূলক কাজ

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ)-এর সমগ্র কার্যাবলী শুধু এই নয় যে, তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদেরকে আল্লাহর রাস্তা দেখিয়েছেন, মা'রিফতে ইলাহী, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির আবশ্যকতা ও গুরুত্ব হৃদয় মূলে গেঁথে দিয়েছেন, হাযার হাযার লাখ-লাখ মানুষের অন্তরে 'ইশকে ইলাহী তথা বিভু প্রেম এবং আল্লাহকে চাইবার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, 'সলূক' ও মা'রিফতের গোপন-রহস্য ও ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বিষয়াবলী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও উচ্চতর জ্ঞানরাজির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বরং উম্মতের অন্যান্য কতিপয় সংস্কারক সংশোধক ও চুলচেরা বিশ্লেষণকারী দার্শনিকদের মত তাঁর এটাও একটা বিরাট ও আলোকোজ্জ্বল কৃতিত্ব যে, তিনি সঠিক মুহূর্তে দ্বীনের হেফাজতের পবিত্র দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানকে বিভ্রান্ত সূফীদের বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততা, 'মুলহিদ'দের বিকৃতি এবং 'বাতেনী' ও 'যিন্দীক' ফির্কার প্রভাব থেকে হেফাজত করেছেন এবং সে সব ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তিকে দিবালোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন যা বদ-'আকীদাসম্পন্ন সূফী, মূর্খ ও জাহিল পীর-বুযুর্গ এবং দর্শন ও বাতেনী ধ্যান-ধারণা প্রভাবিত প্রাচ্যবিদদের দাওয়াত ও তবলীগ দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের ন্যায় একটি বহু দূরে অবস্থিত রাষ্ট্রকে (যেখানে ইসলাম বহু ঘোরালো চড়াই-উৎরাই পার হয়ে পেঁৗছেছিল এবং কিতাব ও সুন্নত থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের উপায়-উপকরণ প্রথম থেকেই কমযোর ও সীমাবদ্ধ ছিল) মোহগ্রস্থ করে রেখেছিল। তিনি স্বীয় মকতূবাতে সে সব 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণার উপর চরম আঘাত হানেন যার প্রচ্ছন্ন ছায়ায় এখানে ইলহাদ কুফরী ও যিন্দীকী ভাবধারা বিস্তার লাভ করছিল এবং ইসলামী 'আকীদা নড়বড়ে হচ্ছিল। ইসলামের বিশুদ্ধ 'আকীদা এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি-পদ্ধতির পক্ষে তিনি অত্যন্ত প্রভাবমণ্ডিত ও শক্তিশালী ওকালতী করেন। তিনি যে হাকীকত ও মা'রিফতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত ও মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, পেঁৗছেছিলেন কাশফ, শুহূদ ও দীপ্তির উচ্চতর মকামে, রিয়াযত ও মুজাহাদার দীর্ঘ ও কঠিনতম স্তরগুলো অতিক্রম করেছিলেন

এবং রিয়াযত ও মুজাহাদাহ তথা আধ্যাত্মিকতার ময়দানে 'ইমাম' ও মুজতাহিদ-এর মরতবায় উপণীত হয়েছিলেন এব্যাপারে সবাই একমত। এজন্য এক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব রাখে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান বরং অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা বড় বড় আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে দীপ্তমান ও কাশফ-সম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। কেননা তাঁর ব্যাপার তো এই ছিল যে,

ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ
ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں -

অর্থাৎ "এই গলি-পথের প্রতিটি অণুপরমাণু সম্পর্কে আমি অবহিত আছি, কেননা বহুকাল যাবত এ পথেই আমি আনা-গোনা করেছি।"

বিলায়েতের মর্যাদা থেকে নবুওতের মর্যাদা উত্তম

দীর্ঘকাল ধরে তাসাওউফের কতিপয় মহলে এমত ধারণা প্রচার করা হচ্ছিল —যে, বিলায়েতের মকাম নবুওতের মকাম থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং তা এজন্য যে, আল্লাহর সেই মহান সত্ত্বার প্রতি মনোনিবেশ এবং সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক চ্যুতির নাম 'বিলায়েত'—আর নবুওতের বিষয়বস্তু মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত জানানো যার সম্পর্ক সৃষ্টিজগতের সঙ্গে। এজন্য ওলী সেই মহান সত্য-সত্ত্বার প্রতি নিবেদিত-প্রাণ এবং নবী সৃষ্টিজগতের কল্যাণের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ আর আল্লাহর প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হওয়া সৃষ্টিজগতের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হওয়া অপেক্ষা নিঃসন্দেহে মহান ও উত্তম। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন—তারা বলেন, সাধারণভাবে বিলায়েতের মর্যাদা নবুওতের মর্যাদা থেকে উত্তম নয়। বরং উল্লিখিত কথার মর্মার্থ এই যে, নবীদের বিলায়েত তাঁর নবুওতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। নবী যখন স্রষ্টার প্রতি মশগুল হন তখন তাঁর এই অবস্থা সৃষ্টিজগতের প্রতি তাঁর দাওয়াত জানাবার ধারাবাহিক দায়িত্ব পালনে মশগুল হবার অবস্থা থেকে উত্তম হয়ে থাকে।

কিন্তু উল্লিখিত বক্তব্যের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে অর্থই বের করা হোক না কেন এইরূপ 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা নবুওতকে অবজ্ঞা ও খাটো করে দেখার রাস্তা খুলে যায়, এর গুরুত্ব ও মর্যাদা কমে যায়, খুলে যায় ইলহাদ ও যিন্দীকী ধ্যান-ধারণা। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনায়রী (রঃ) এধরনের 'আকীদা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জোরালো ও বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নবুওতের মকাম বিলায়েতের মকাম অপেক্ষা লক্ষগুণে উন্নত

ও মহান। নবীর সমগ্র অবস্থা ও গোটা মুহূর্ত ওলীর হালত ও সময়ের চেয়ে উত্তম। শুধু তাই নয়, নবীদের একটি নিঃশ্বাস আওলিয়াগণের সারাজীবনের সাধনা অপেক্ষা ও উত্তম। এক্ষেত্রে তিনি মুহাক্কিক ও 'আরিফসুলভ অনেক কথাই লিখিছেন এবং যেহেতু তিনি নিজেই বেলায়েত ও মারেফতের উচ্চতম মরতবায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এজন্য তাঁর মতামত ব্যক্ত করা শুধু মাত্র তাঁর অপূর্ব মেধাশক্তি ও জ্ঞান শক্তির ফলশ্রুতিই নয় বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর স্থাপিত। একটিপত্রে তিনি লিখেন :—

"আমার প্রিয় ভাই শামসুদ্দীনের জানা আছে যে, তরীকতের বুযর্গ-গণের (রঃ) সম্মিলিত মতে—সকল সময় এবং সকল অবস্থাতেই আওলিয়ায়ে কিরাম আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ)-এর পদাংকানুসারী এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ) আওলিয়াকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। বিলায়েতের দ্বারা যে নৈকট্য লাভ ঘটে তা আম্বিয়াগণের হেদায়াতের তুল্য। সকল আম্বিয়া (আঃ)ই বিলায়েতের অধিকারী, কিন্তু আওলিয়াগণের কেউই নবী হন না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত এবং তরীকতের মুহাক্কিক (বিশেষজ্ঞ)গণের এই মসয়ালার ক্ষেত্রে কারুর কোনরূপ এখতেলাফ কিংবা মতভেদ নেই। অবশ্য মুলহিদদের একটি দল বলে যে, আওলিয়া—আম্বিয়া অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাবান। তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে এই দলীল পেশ করে যে, আল্লাহর ওলীগণ সব সময় আল্লাহ্‌তেই বিভোর থাকেন, আর আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ) অধিকাংশ সময়ই সৃষ্টিকূলকে দাওয়াত জানাতে ও তবলীগে মশগুল থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহতে মশগুল থাকেন সর্ব মুহূর্তে,— তিনি সেই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাবান হবেন যিনি কিছু সময় মাত্র আল্লাহ্‌তে বিভোর থাকেন। একটি দলের (যারা সূফী-দরবেশগণের সঙ্গে মুহব্বতের দা'বিদার এবং যারা তাঁদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেন ও আনুগত্য-অনুসরণের ভাণ দেখান) বক্তব্য এই যে, বিলায়েতের মকাম নবুওতের মকাম অপেক্ষা অধিক মর্যাদামণ্ডিত। কেননা—নবী ওহীর ইল্‌মের অধিকারী আর আওলিয়া গোপন-রহস্য জ্ঞানের অধিকারী। ওলীগণ এমন সব গোপন রহস্য অবগত হয়ে থাকেন, যে সম্বন্ধে নবীগণ থাকেন অনবহিত ও বেখবর। তারা ওলী-দরবেশগণের জন্য 'ইল্‌মে লাদুন্নী-র অধিকারী হওয়া প্রমাণিত করেন এবং এক্ষেত্রে (কুরআনে বর্ণিত) হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর ঘটনা দলীল হিসাবে পেশ করেন। তারা বলেন, হযরত খিযির (আঃ) ওলী ছিলেন আর হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন নবী। হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর জাহেরী ওহী আসতো।

যতক্ষণ পর্যন্ত ওহী আসতো না—তিনি কোন ঘটনার গোপন-রহস্য এবং কোন কথার অন্তর্বর্তী ভেদ অবগত হতে পারতেন না। হযরত খিযির (আঃ) 'ইলমে লাদুন্নী'র অধিকারী ছিলেন বিধায় তিনি ওহী ব্যতিরেকেই গায়েব তথা অদৃশ্য বস্তু ও জগত সম্পর্কে জেনে নিতেন। এমনকি হযরত মূসা (আঃ)কেও তাঁর অধীনে শাগরিদী (শিষ্যত্ব) করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। আর সবাই জানে যে, শাগরিদ অপেক্ষা উস্তাদ অধিকতর উত্তম ও মর্যাদাবান হয়ে থাকেন। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে, এই তরীকার নেতৃবৃন্দের---দ্বীনের ব্যাপারে যাদের উপর নির্ভর করা যায়---তারা এ ধরনের উক্তি ও 'আকীদা সম্পর্কে অত্যন্ত নাখোশ এবং তারা একথা মেনে নিতে আদৌ রাযী নন যে, কারোর মরতবা আম্বিয়ায়ে কিরামের মরতবা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত কিংবা তাঁদের সমমানের হতে পারে। রইলো হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত খিযির (আঃ)-এর ঘটনা। এর জবাব এই যে, হযরত খিযির (আঃ) আংশিক ফযীলতের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর বিশেষ ঘটনাবলীর 'ইলমে লাদুন্নী'। আর হযরত মূসা (আঃ) সাধারণ ফযীলতের অধিকারী ছিলেন। আংশিক ফযীলত ব্যাপক ও সাধারণ ফজীলতকে নাকচ করতে পারে না,—পারে না মনসূখ করতে। যেমন, হযরত মরইয়াম (আঃ) এক ধরনের ফযীলতের অধিকারিণী ছিলেন। যেহেতু তাঁর গর্ভে পুরুষের সংসর্গ ব্যতিরেকেই হযরত 'ঈসা (আঃ) পয়দা হয়েছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁর মর্যাদা ও ফযীলত হযরত 'আইশা (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর মর্যাদা ও ফযীলত অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্যের অধিকারী নয়। তাঁদের ফযীলতের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দুনিয়ার তামাম নারীকূলের উপর। মনে রেখো, আওলিয়াকুলের সকলের সব আমল ও অবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও গোটা জীবন নবীদের একটি কদমের মুকাবিলায়ও ক্ষুদ্র ও অস্তিত্বহীন দৃষ্টিগোচর হবে। আওলিয়াকূল যে বস্তুর প্রার্থী, যে বস্তুর জন্য তারা দূর্গম পথ অতিক্রম করেন,—করেন কঠোর পরিশ্রম ও মেহনত, আম্বিয়ায়ে কিরাম বহু আগেই সেখানে পেঁৗছে গিয়ে থাকেন। আম্বিয়ায়ে কিরাম তাদের দাওয়াতী কাজ আল্লাহ্‌র হুকুমেই আনজাম দিয়ে থাকেন এবং হাযার হাযার আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌কে আল্লাহপ্রাপ্ত ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের অধিকারী বানিয়ে দেন।"

আম্বিয়ায়ে কিরামের একটি নিঃশ্বাস ওলীদের সমগ্র জীবনের সাধনা থেকেও উত্তম

আম্বিয়ায়ে কিরামের একটি নিঃশ্বাস আওলিয়ায়ে কিরামের তামাম জীবন অপেক্ষা উত্তম। আর তা এজন্য যে, আওলিয়ায়ে কিরাম যখন চরম মার্গে উপনীত হন—

তখন—'মুশাহাদাহ' (পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান) এর সংবাদ দেন এবং মানবীয় অন্তরাল থেকে মুক্তি পান, যদিও সে অবস্থায়ও তাঁরা মানুষই থাকেন। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই 'মুশাহাদা'র মকামে অধিষ্ঠিত হন, যা আওলিয়াগণের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ ধাপ। অতএব আওলিয়াগণকে আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর কিয়াস করাই ঠিক নয়। হযরত খাজা বায়েযীদ বিস্তামী (রঃ) কে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, আম্বিয়াগণের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেছিলেন যে, তওবাহ্! তওবাহ্! এ ব্যাপারে (মন্তব্য প্রকাশের) কোন অধিকারই আমাদের নেই। অতএব আওলিয়াদের মরতবা সম্পর্কে অন্যান্য সৃষ্টিকুলের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং ধ্যান-ধারণা যেরূপ ক্ষীণ ও প্রচ্ছন্ন—ঠিক তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরামের মরতবাও আওলিয়াদের জ্ঞান ও উপলব্ধির উর্ধ্বে। আওলিয়াগণ আম্বিয়ায়ে কিরামের অকৃত্রিমতায় আপন গতিতে ধাবমান আর আম্বিয়ায়ে কিরাম আওলিয়াদের মুকাবিলায় উড়ন্ত গতিতে ধাবমান। আর এটা তো ঠিক যে, পায়ে চলার গতি উড়ন্ত গতির মুকাবিলা করতে পারে না।

আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ আর আওলিয়াদের আত্মা

আম্বিয়ায়ে কিরামের মাটির দেহ পাক-পবিত্রতা আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে আওলিয়ায়ে কিরামের ভেদ ও রহস্যের সমতুল্য। অতএব ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান যাদের একজনের দেহ যেখানে পৌঁছে সেখানে অন্যজনের শুধু ভেদ ও রহস্য পেঁৗছাতে পারে।[১]

শরীয়তের চিরন্তনতা ও অপরিহার্যতা

এমনি আর একটি ভ্রান্ত ধারণা কতিপয় মহলে বিস্তার লাভ করেছিল যে, শরীয়তের বাধ্য-বাধকতা ও অনুসরণের আবশ্যকতা একটি বিশেষ সময় ও বিশেষ সীমারেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ—'সালিক' যখন পর্যবেক্ষণের মকাম এবং 'একীন'-এর মরতবায় উপনীত হয়, পেঁৗছে যায় আল্লাহর সান্নিধ্যে, তখন সে শরীয়তের পাবন্দী ও শরঈ বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়। এরূপ 'আকীদা সাধারণ্যে বেশ ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বহু 'মুলহিদ-কাফির' ও বে-আমল সূফী ও অকাট মূর্খ পীর-দরবেশ-এর মাধ্যমে এক বিরাট ফেতনার সূত্রপাত করেছিল এবং এর দ্বারা কতিপয় মহলে শুধু বিশৃংখলা ও বে-আমলই নয়—'ইলহাদ ও যিন্দেকী' ভাবধারাও বিস্তার লাভ করেছিল। কতক লেখা-পড়া

১. মকতুবে রিসতম

জানা লোকও এ 'আকীদাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার স্বার্থে কুরআন মজীদের মশহূর আয়াত—واعبد ربك حتى يأتيك اليقين অর্থাৎ "এবং একীন তোমাতে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের 'ইবাদত (দাসত্ব ও গুলামী) করো"[১] দ্বারা দলীল পেশ করে এবং বলে যে, 'ইবাদত ও শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের সিলসিলা ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম থাকা দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না "একীন" হাসিল হয়। "একীন" হাসিল হয়ে গেলেই শরীয়তের কষ্টকর বিধানগুলো পালনের বাধ্যবাধকতা অপসৃত হয়ে গেল। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (রঃ) এ ধরনের অমূলক 'আকীদা ও বিভ্রান্তিকে অত্যন্ত জোরের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ বিষয়ের উপর তাঁর কতিপয় 'মকতূবাত' ও (চিঠিপত্র) রয়েছে যেখানে তিনি পূর্ণ জোশ ও শক্তির সঙ্গে এটা প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও পাবন্দী শেষ নিশ্বাস ত্যাগের প্রাগ-মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে এবং কোন অবস্থাতেই ও কোন সময়েই শরীয়তের অবশ্য পালনীয় বিধানগুলো থেকে মানুষ অব্যহতি পায় না।

শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দী সর্বাবস্থায় অপরিহার্য

এক পত্রে তিনি লিখেছেন,

"প্রিয় ভাই শামসুদ্দীন অবগত হও যে, শয়তান কখনো কখনো সূফী ও আহলে রিয়াযতের উপর এটা জাহির করে যে, পাপ পরিত্যাগের আসল উদ্দেশ্য হ'ল প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা এতে পরাভূত এবং মানবী গুণাবলীয় পর্যুদস্ত হয়ে যাবে এবং অন্য উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ তাঁর উপর বিজয়ী হবে আর দীল হবে মানবীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও যিকরে ইলাহীর প্রভাব থেকে মুক্ত। যার ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহর মা'রিফতের হাকীকত লাভ করবে। শরীয়তের পাবন্দী পরিপূর্ণ মিলনের ক'বা গৃহে পৌঁছুবার একটি রাস্তা মাত্র। যে ব্যক্তি এই কা'বাগৃহে পৌঁছে গেছে তার আবার রাস্তা, খোরাক কিংবা সওয়ারীর কি আবশ্যক থাকতে পারে? অতঃপর শয়তান এই দলকে বুঝাতে শুরু করে যে, যদি সে সালাত আদায় করে তবে তা তার জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর তা এজন্য যে, সে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছে। এ সমস্ত লোকেরা বলে যে, আমরা তো চিরন্তন মুশাহাদার মধ্যে অবস্থান করি এবং সালাত,

১. আয়াতের সঠিক তাফসীর জানতে খ্যাতনামা মুফাসসিরদের তাফসীর দেখুন। এখানে একীন অর্থ 'মৃত্যু"।

রুকূ' ও সিজদাহ্‌র আসল উদ্দেশ্য এই যে, গাফিল দীল-তথা মানুষেয় অলস অন্তর সর্বদা তার উপস্থিতিতে আবিষ্ট থাকবে। আমরা এক মুহূর্তও গাফেল হই না,— আধ্যাত্মিক জগতের সেই দৃশ্যমান বস্তু দেখি যা আম্বিয়াদের পবিত্র প্রতিবেশে দেখানো হয়।—আমাদের আবার ঐ সব 'ইবাদত-বন্দেগী ও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের কী আবশ্যকতা থাকতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এটা খোদ ইবলীসের অবস্থা ও তার ঘটনার ন্যায়। সে তার নৈকট্যের পূর্ণতা দেখেছিল এবং বলেছিল যে, আদম (আঃ)-কে সিজদাহ করে কী লাভ? আদমের মর্যাদা তার তুলনায় কম; তাকে সিজদাহ করায় আমার কী ফায়দা হবে? আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে তার ঘটনা অলীক কাহিনী কিংবা উপন্যাস হিসাবে পেশ করেন নি, বরং সেইসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় উপদেশ হিসাবে বিবৃত করেছেন যারা এধরনের শয়তানী বিভ্রান্তির শিকার। তারা যেন জানতে ও বুঝতে পারে যে, যে কোন মুকার্রাব' (নৈকট্য-প্রাপ্ত) বান্দাহ্‌র পক্ষেও শরীয়তের আনুগত্য ব্যতিরেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। যে সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, শরীয়তের অনুসরণ আল্লাহ তা'আলার পর্যন্ত পৌঁছুবার একটি সরল রাস্তা—তারা ঠিক ও সত্য কথাই বলেছেন।"

শরীয়তের স্থায়িত্বের গোপন রহস্য

শয়তান এখানে একটি বিষয় ঐ দলের দৃষ্টি বহির্ভূত রেখেছে। সে তাদের এটাই বিশ্বাস করিয়েছে যে, শরীয়তের উদ্দেশ্য হ'ল শুধু আল্লাহর হুযুরী লাভ করা। আসলে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। শরীয়তের উদ্দেশ্য এটা ব্যতিরেকে আরও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এমনই যে, যেমন কোন পরিপূর্ণ জানালায় পাঁচটি কীলক (পেরেক) মারা হয়েছে। যদি কীলকটি তা থেকে আলাদা হয়ে যায় তবে জানালাটি সম্পূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, যেমনটি খোদ ইবলীস আল্লাহর বন্দেগী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যদি কেউ বলে যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কী করে পাঁচটি কীলকের মতো হবে যা সম্পূর্ণ জানালাটি আটকে রেখেছে। তার জবাব এই যে, তা চেনা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এটা বস্তুত এমনই যে,-যেমন বিভিন্ন জিনিস ও ঔষধ-পত্রাদির মিশ্রণ। বুদ্ধি এর কারণ নিরূপণে অক্ষম যেমন চুম্বক পাথর কেন লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তা কেউ জানে না।

একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত

শরীয়তের অবশ্য পালনীয় বিধি-বিধানসমূহ ও হুকুম-আহকামের পাবন্দীর মধ্যে কি হেকমত রয়েছে এবং তা মানুষের দ্বীন ও ঈমান এবং স্বীয় স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রাখার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ জরুরী—তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,—

"এক ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় একটি প্রাসাদ (মহল) নির্মাণ করল। সেখানে সে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন কিসিমের নে'মত-সামগ্রী জমা করল। তার যখন অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল—তখন সে তার ছেলেকে ওসিয়ত করল যে, তুমি এই প্রাসাদকে সংস্কার ও সংশোধনসহ সকল উপায়ে ব্যবহারে লাগাতে পারবে। কিন্তু খোশবুদার একটি ঘাসের একটি অংশ যা আমি পেছনে ছেড়ে যাচ্ছি---সেটি যদি শুকিয়েও যায় তবুও তা বাইরে ছুড়ে ফেলবে না। পাহাড়ের চূড়ায় যখন বসন্তের মৃদু হিল্লোল দেখা দিল, যখন পাহাড় ও প্রান্তর সবুজ শ্যামলিমায় গেল ছেয়ে; বহুবিধ সতেজ ও খোশবুদার ঘাসের জন্ম হ'ল---যা সেই পুরনো ঘাসটির চেয়েও তর-তাজা। এর ভেতর থেকে অনেক ধরনের ঘাস ও ফুল সেই প্রাসাদে এল যার খোশবু সারা মহলকে সুগন্ধিময় করে তুলল এবং তার সামনে উক্ত পুরনো শুকনো ঘাসের খোশবু গেল মিইয়ে। ছেলেটি মনে করল যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এই পুরনো ঘাসটি মহলে এজন্য রেখেছিলেন যে, তার খোশবু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার দ্বারা এই জায়গাটি খোশবুময় হয়ে উঠবে। এখন এই শুকনো ঘাসটি কোন্ কাজে আসবে? সে হুকুম দিল যে, এই ঘাসটি যেন বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। যে মুহূর্তে উল্লিখিত মহলটি ঐ ঘাস থেকে মুক্ত হয়ে গেল তখনই একটি কালো সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এল এবং ছেলেটিকে কামড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এর পেছনে কারণ কী ছিল? ঘাসটির দু'টি উপকারিতা ছিল। প্রথমত, সে খোশবু দিতে; দ্বিতীয়ত, তার ভেতর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই ছিল যে, ঘাসটি যেখানেই থাকত, তার ধারে-কাছেও সাপ ঘেঁষতে সাহস পেত না। অর্থাৎ ঘাসটি ছিল সাপের প্রতিষেধক যা আর কেউ জানত না। ছেলেটি তার মেধাশক্তি ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্য ছিল গর্বিত। কিন্তু এ আয়াতের মর্মার্থ তার জানা ছিল না وما اوتيتم من العلم الا قليلا (আর তোমাদের খুব অল্পই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে)। সে তার জ্ঞান ও মেধার অহমিকায় মারা গেল। এভাবেই এই---কাশফ ও কারামতের অধিকারী দল এই বিভ্রা-

স্তির শিকার হয়েছে যে, শরীয়তের যে গোপন রহস্য ছিল তা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে এবং এইগুলো ভিন্ন শরীয়তের আর কোন গুপ্ত-রহস্য নেই। অথচ এর চেয়ে বড় ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না যা এ পথের পথিক 'সালিক'দের সামনে কখনো কখনো দেখা দেয় এবং বহু লোকই এর শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঐ সমস্ত লোকেরা শরীয়তের একটিই উদ্দেশ্য ভেবে বসে আছে। অথচ এটা বুঝতে চেষ্টা করে নি যে, এর ভেতর অন্যান্য গুপ্ত-ভেদও রয়েছে। তারা এটাও খেয়াল করে নি যে, যদি অন্যান্য হেকমত না থাকত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের এত সালাত আদায়ের কী দরকার ছিল যার কারণে তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত। তিনি একথা বলেন নি যে, এটা উম্মতের উপর ওয়াজিব—পয়গম্বরের উপর নয়।"[১]

'উলামা ও কামিল বুযর্গগণের আদর্শ

যে সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম, মাশায়িখ ও সূফী যাঁরা কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে গেছেন, তারা বুঝেছেন যে, শরীয়তের প্রত্যেকটি বাধ্য-বাধকতার ভেতরই একটি রহস্য রয়েছে যার সঙ্গে আখেরাতের মহা সৌভাগ্যও সম্পৃক্ত ও জড়িত। এমন কি ঐসব বুযুর্গ নিজেদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত শরীয়তের আদবসমূহের মধ্যকার একটি আদবও ত্যাগ করেন নাই। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রঃ)-এর একজন খাদেম তাঁকে তাঁর ইন্তিকালের সময় ওযু করাচ্ছিল। সে দাড়ি খেলাল করাতে ভুলে যায়। তিনি তার হাত চেপে ধরলেন যেন এ সুন্নতটিও ভালভাবে আদায় করা হয়। লোকেরা বলল যে, হযরত! এই মুহূর্তেও কি এতটুকু শিথিলতা উপেক্ষার যোগ্য নয়। তিনি বললেন,"—আমি আল্লাহ্ পর্যন্ত এর বরকতেই পৌছুতে পেরেছি।" কামালিয়াতের অধিকারীদের এটাই ছিল রীতি। ফেরেববাজ লোকেরা সত্বরই ধোকায় পতিত হয়। যে বস্তুকে তারা দেখতে পায় না এবং যে বিষয় তাদের বুঝে আসেনা, তাকেই তারা অস্তিত্বহীন মনে করেছে। ফজরের সালাত দু'রাকাত, জোহরের চারি রাকাত আসরের চারি রাকাত, মাগরিবের তিন এবং 'ইশার চারি রাকাত; অতঃপর প্রতিটি রাকাতেই একটি করে রুকু' ও দু'টি করে সিজদা রয়েছে। এসবের ভেতর এমন রহস্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কামালিয়াত হাসিলের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে—এবং ইন্তিকালের মুহূর্ত পর্যন্ত তা বাধ্যবাধকতা সহকারে মেনে চললে তার আছর ও প্রতিক্রিয়া জাহির হয়। যদি 'সালিক'

---

১. ১৮তম পত্র,

এসব ছেড়ে দেয় এবং দুনিয়া থেকে চলে যায় তাহলে আখেরাতে দেখতে পাবে নিজের ধ্বংস। সে সময় বলবে, হায়! আমার সে কামালিয়াতের কি হ'ল? জবাব দেওয়া হবে, সে কামালিয়াতের তক্তায় কীলক ছিল না। ফলে মরণের সময় তা মূল থেকে উপড়ে গেছে ঠিক তেমনি যেমন করে ইবলীসের তামাম কামালিয়াত একটি নাফরমানীর কারণেই মাটিতে মিশে গেছে।

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন (রঃ) এ ব্যাপারে এত দৃঢ় বিশ্বাসী ও আপোষহীন ছিলেন যে, তিনি একটি পত্রে এই 'আকীদাকে (শরীয়তের পাবন্দী বিশেষ হালতে ও মকামে জরুরী নয়) প্রত্যাখ্যান করতঃ বলেন,

"এটা ভুল এবং মুলহিদদের মাযহাব যারা বলে, যখন হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে গেছি এবং কাশ্‌ফ ও শহূদ হাসিল হয়ে গেছে তখন শরীয়তের হুকুম উঠে গেছে। এ ধরনের 'আকীদা ও মাযহাবের উপর লা'নত ও অভিশাপ।"[১]

শরীয়তের শর্ত

তিনি তামাম মুহাক্কিক সূফীর মত অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই উক্তির সমর্থক ও দাবিদার যে, সলূক ও তরীকত হাসিল করা শরীয়তের অনুসরণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এক পত্রে তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি তরীকতের ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুসারী না হবে, তরীকতের দ্বারা তার কোন ফায়দা হাসিল হবে না। এটা মুলহিদদের মাযহাব যে, এগুলো একটি অন্যটির সহযোগিতা ব্যতিরেকে চলতে পারে। তারা বলে যে, হাকীকত যখন প্রকাশ হয়ে গেছে তখন শরীয়তের আবশ্যকতা আর অবশিষ্ট রইল না। আল্লাহ্‌র লানত হোক এই 'আকীদার উপর। বাতেনী ব্যতিরেকে জাহেরী মুনাফিকী ছাড়া আর কিছুই নয়, ঠিক তেমনি জাহেরী (শরীয়ত) ব্যতিরেকে বাতেনী (তরীকত ও মা'রিফত) পরিষ্কার কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহের (শরীয়ত) বাতেন (তরীকত) ব্যতিরেকে ত্রুটিযুক্ত আর বাতেন জাহের ব্যতিরেকে এক ধরনের মস্তিষ্ক-বিকৃতির নামান্তর। জাহের সব সময়ই বাতেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং জাহের (শরীয়ত) বাতেন (তরীকত, মা'রিফত ও হাকীকত) এর সঙ্গে এমনিভাবে সম্পৃক্ত যে তা কোনক্রমেই একটি থেকে অন্যটি আলাদা হয় না।"[২]

মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই

হযরত মাখদুম (রঃ) মকতূবাতে অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে এবং অত্যন্ত

১. ২৬ তম পত্র; ২. ২৬ তম পত্র;

আস্থা ও একীনের সঙ্গে একথার তবলীগ করতেন যে, হুযূর আকরাম (সাঃ) যিনি রাব্বুল 'আলামীনের মাহবুব বান্দাও বটেন, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতিরেকে নাজাত লাভ সম্ভব নয়,—সম্ভব নয় হাকীকত পর্যন্ত উপনীত হওয়া কিংবা কামালিয়াত ও পারলৌকিক সৌভাগ্য লাভ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।"—(৩: ৩১)

ফিরদৌসিয়া সিলসিলার প্রচার এবং এর কতিপয় কেন্দ্র

হযরত মাখদুমুল মুল্ক (রঃ)এর পর ফিরদৌসিয়া সিলসিলা কতটুকু উন্নতি করেছিল তা কোন গ্রন্থেই লিখিত আকারে দৃষ্টিগোচর হয় না। অতঃপর মাওলানা মুজাফফর বলখী ('আদন' বন্দরে যিনি শায়িত) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং বিহারের খানকাহতে এই সিলসিলা জারী হয়। স্বীয় যুগে মাখদুম শাহ শু'আইব ফিরদৌসী বিন মাখদূম জালাল মুনায়রী যিনি মাখদূমুল মুলক(রঃ) এর চাচাতো ভাই মুঙ্গের জেলার শেখূপুরাতে খানকাহ কায়েম করেন। অতঃপর তার খান্দানের লোকদের দ্বারা অদ্যাবধি এই সিলসিলা সেখানে কায়েম আছে। মাখদূম শাহ শু'আইব ফিরদৌসীর একটি কিতাব (বুযর্গানে ফিরদৌসিয়ার অবস্থা বর্ণনায়) "মানাকিবুল আসফিয়া" নামে রয়েছে যা প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমান গ্রন্থ লিখতে উক্ত গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য নেয়া হয়েছে। হযরত মাখদূম (রঃ)-এর পরে 'মুনায়র' এ ফিরদৌসী সিলসিলার উন্নতি ঘটে যার ভেতর তাঁর খান্দানের মাখদূম শাহ দৌলত মুনায়রী (মৃত্যু ১০১৭ হিজরী) অত্যন্ত মশহূর বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর একজন মুরীদ ও খলীফা আমানুল্লাহ সিদ্দিকী আসী সিন্দিলা কর্তৃক উত্তর প্রদেশ থেকে এ সিলসিলা জারী হয়। সম্ভবত দশম শতাব্দীতে পাটনা জেলার মতৌহাতে ফিরদৌসিয়া সিলসিলার একটি খানকাহ কায়েম হয় এবং অদ্যাবধি এ সিলসিলা জারী রয়েছে। বিহার প্রদেশে এমন কোন খানকাহ নেই যেখানে এই সিলসিলা নেই। মহীশূর রাজ্যের মিশমার ভাটকল নামক মহল্লায়ও এই সিলসিলার খানকাহ আছে।

হযরত মাখদূম সাহেব (রঃ)-এর দোহা ও হিন্দী প্রবাদ বাক্য

বিহার ও তার আশে-পাশে হযরত মাখদূম (রঃ)-এর বহু দোহা ও হিন্দী প্রবাদ বাক্য সাধারণ্যে এখনো জনপ্রিয় এবং বহুলভাবে প্রচলিত।

নির্ঘণ্ট

নাম

অ

অরুণা, রাজা ৬

আ

আঈনুল কুযাত হামদানী ১৫৯
আওহাদুদ্দীন ১৯৩
'আকীক ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৯০
আখী মুবারক ৭৭
'আতাউল্লাহ ৮৩,
আদম (আ:) ১৭২, ২০৩ ২০৬,
২১৪, ২১৫, ২১৬
আদম বিনুরী ১৫৬
আদম হাফিজ ১৯৩
আনন্দপাল (অনঙ্গপাল) ৬
আফতাব মুলক হিন্দ ১০, ১২০
'আবিদ জাফর আযাদী ১৭৮
আবু 'আলী দাক্কাক ২১৫
আবু আহমদ চিশতী ৪
আবু ইসহাক শামী, খাজা ৪
আবু ইসহাক আস-সাবী ১৯৬
আবু বকর খাজা ১২০
আবু বকর খারিযমী ১৯৬
আবু বকর খাররাত ৩৫
আবু মুহাম্মদ চিশতী (খাজা) ৪,৫
আবুল্লায়েছ সমরকন্দী, ফকীহ ১১
আবু শুকুর সালেমী ৪৩
আবু সাঈদ আবুল খায়ের ৯০, ১১২
আবু হাইয়ান তাওহীদী ১৯৬
আবু হানিফা, ইমাম আজম ৬৭
৬৯, ৯১
আবু হাফস আওশী, মাওলানা ১১
আবুল কাসিম, মাওলানা ১৯৩
আবুল কাসিম হারিরী ১৯৬
আবুল ফযল ১০, ১৯৭
আবুল হাসান, মাওলানা ১৯৩
'আব্দুর রহীম, খাজা ৭৩
'আব্দুর রহীম রায়পুরী, হযরত
মাওলানা ২৮
'আব্দুল 'আযীয দেহলভী ১৯৭
'আব্দুল আযীয ইবনে তাম-ফকীহ
১৪৮
'আব্দুল করিম মানিকপুরী ১২৩
'আব্দুল কাদির জিলানী ১০৮
'আব্দুল কাদির, হযরত মাওলানা ২৯
'আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী ২৮, ১২৩
'আব্দুল মুকতাদির কুন্দী, কাযী
১২২, ১৩৯
'আবদুল্লাহ বিন উবাই ২০৪
'আবদুল্লাহ বিন মাহমূদ আল-হুসায়ন
'আলম ১২৩
'আব্দুল হক, মুহাদ্দিছ দেহলভী,
হযরত ২৭, ১০০
'আব্দুল হামিদ কাতিব ১৯৬

'আবদুল হাই, সায়্যিদ ১৫৬
আমানুল্লাহ সিদ্দিকী ২৩৯
আমীন খান ২০১
আমীর খসরু ৫০, ৬১, ৬২, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭২, ৯৫, ১০০, ১১৯
আমীর খোর্দ, মুবারক আলভী, কিরমানী, সায়্যিদ, মুহাম্মাদ ২৭,২৯, ৫০, ৫৮, ৭১, ৭৫, ৮৭, ৯৪, ১০৭, ১১৮
আমীর হাজী ৯৫
আমীর হাসান 'আলা সজ্‌যী ২৯, ৩৮ ৫৭, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৫, ৯০, ৯৬, ১০৭ ১২০
আমু কাযী, মিয়া ১৮২, ১৮৩
'আযাযীল ২০২, ২০৭
'আয়শা (রা:) ৩৩২
আরনল্ড, অধ্যাপক ১৩৬
'আরব, খাজা ৩৩
'আরিফ, সায়খ ২৬, ২৭
আলতামাশ, সুলতান শামসুদ্দীন ১১ ১৩, ১৪, ৩৩
'আলম আন্দসমী (ফরীদুদ্দীন)
'আলম আলা' হানাফী আন্দরপতী) ১৬০
'আলম আহমাদ, মফতী ১৮৮, ১৮৯
'আলমগীর, সম্রাট ১৯৭
'আলাউদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, ১১৪
'আলাউদ্দীন আজুদহনী ২৫
'আলাউদ্দীন 'আলী, সাবির, শায়খ হযরত ১৬, ২৭
'আলাউদ্দীন উসূলী, মাওলানা ৩৪
'আলাউদ্দীন খিলজী, সুলতান ২, ৫৮, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৯৫, ১১৪ ১১৫, ১১৭, ১২৪
'আলাউদ্দীন জুযূরী ১৫৬
'আলাউদ্দীন নীলী ১২০
'আলাউদ্দীন সিমনানী ১৫৫
'আলাউল হক পান্ডবী, শায়খ ১২২, ১৩৪, ১৯১
'আলামুদ্দীন, মাওলানা ৬৯
'আলামুল্লাহ নাখোশবন্দী, রায়বেরেলবী, হযরত শাহ ১৫৫
'আলী আসগর কনৌজী ১৪০
'আলী ইবনুশ শিহাব হামদানী কাশ্মিরী, আমীর, সায়্যিদ ১৫৫
'আলী, খাজা, ৩৩, ৩৪
'আলীমুল্লাহ্ কুচেন্দোভী, কাযী ১৪০
'আলীমুদ্দীন, শায়খ ১৯২
'আলী সাকাজ্জী ১৫
আলেকজাণ্ডার ৩,৬২
আশরাফ 'আলী থানবী, হযরত মাওলানা ২৮
আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, সায়্যিদ, ১২২, ১৩৪, ১৪০, ১৯১ ১৯২
আস'আদ লাহোরী ১২২
আহমাদ (বিন আলী) ৩৩
আহমাদ, (শায়খ শরফুদ্দীন) ১৪৫ ১৪৬
আহমাদ 'আবদুল হক রাদুলভী ২৮
আহমাদ আমু ১৯৩
আহমদ চরমপোশ ১৪৬
আহমাদ থানেশ্বরী, শায়খ ১২২, ১৩৯

আহমাদ নাসিরাবাদী, খাজা ১৫৬
আহমাদ ফারুকী, শায়খ ১৯৭
আহমাদ মিঠৌভী, ওরফে হামিদ আহমদ, মাওলানা ১৪০
আহমাদ আল-মারীকলী ৩৭
আহমাদ শহীদ, সায়্যিদ ১৫৬
আহমাদ সফীদ বাফ ১৯৩
আহমাদুল হালীম, হুসায়নী মানিক পুরী, সায়্যিদ ১২৩

ই

ইউসুফ (আঃ) ২০৩
ইউসুফ চুনদিরী ১২০
ইকবাল (কবি ইকবাল) ২১৯
ইকবাল, খাদেম ৬৩, ৭৬, ৯৫
'ইনায়েতুল্লাহ, মৌলভী ১৩৬
ইবনুল আমীন ১৯৬
ইবনে আরাবী (শায়খ মহীউদ্দীন) ১৯৬
ইবনে 'ইবাদ ১৯৬
ইবনে কাইয়িম ১৯৬
ইবনে খালদুন ১৯৬
ইবনে জওযী ১৯৬
ইবনে শাদ্দাদ ১৯৬
ইবনে হাজার হায়তামী, মক্কী ১৫৬
ইবরাহীম কাওয়াম ফারুকী, ১৪৫
ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-২০৩, ২০৬, ২১৫
ইবরাহীম, মাওলানা ১৮২, ১৮৫
ইবরাহীম শারকী ১৩৪, ১৪০
ইবলীস ২০৬
'ইমাদ হালিফী ১৯৩
'ইমাদুদ্দীন, হযরত খাজা ১২৩, ১৫৯
ইমাম গাযযালী ১৯৬, ২২৪
ইমাম শাফি'ঈ ৭০
ইমদাদুল্লাহ, মুহাজির মক্কী, হাজী ২৮, ১২৩
'ইযযুদ্দীন, মালিক ১১
ইয়াকুব (আঃ) ২০৩
ইয়াকুব শরফী কাশ্মীরি, ১৫৫
ইয়াকুব, শায়খ ১২২
ইয়াসীন বানারসী, সায়্যিদ ১৪০
ইয়াহইয়া (আঃ) ২০৩
ইয়াহইয়া মাদানী, হযরত ১২১
ইয়াহইয়া, শায়খ ১৪৫, ১৫০
ইলয়াস খান দেহলভী, হযরত মাও-লানা, মুহাম্মাদ ২৮, ২৯

ঈ

ঈশ্বরী প্রসাদ—৭
'ঈসা (আঃ) ২৩২

উ

'উমর, শায়খ ১৯৩, ২০১
'উমার ফারূক (রাঃ) ১৬, ২০২, ২০৪, ২০৭
উয়ায়েস করণী, খাজা ১৯৬

ও

ওমর ('আলাউল হক) ১২২
ওয়াজহুদ্দীন, শায়খ ১৯৩
ওয়াজীহুদ্দীন পায়েলী, মাওলানা ১২০

ওয়াহীদুদ্দীন, ১৯৩
ওয়াহীদুদ্দীন ইউসুফ, শায়খ ১২৩
ওয়াহীদুদ্দীন রিযভী, সায়্যিদ ১৯২
ওয়ালীউল্লাহ, শাহ ১৯৭

ক

করিমুদ্দীন, মাওলানা ১৯৩
করিমুদ্দীন সমরকন্দী ১২০
কলীমুল্লাহ জাহানাবাদী, ১২১, ১৩৮ ১৪০
কানিংহাম, জেনারেল ১৬২
কামাল জুনায়দী ১৫৫
কামালুদ্দীন নাগোরী ফিতানী ১২২
কামালুদ্দীন যাহিদ, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মারিকলী ৩৩, ৯৯, ১২১
কামালুদ্দীন, শায়খ ১২৩
কামরুদ্দীন, মাওলানা ১৯৩
কাযী খান, খলীল ১৮৭
কাশানী, মাওলানা ৯১
কাসিম নানূতবী, হযরত মাওলানা ২৮
কিন'আন ২০৬
কুতবুদ্দীন ১৯৩
কুতবুদ্দীন আয়বক, সুলতান ৩৩, ১৫৬
কুতুবুদ্দীন দবীর, ১২৮, ১২৯
কুতুবুদ্দীন নাকিলা, মাওলানা ৩৬
কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, হযরত, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ১৭, ১৮, ২৩, ২৯, ৫৩, ১১৬, ১৫৭, ১৫৮
কুতুবুদ্দীন মওদুদ চিশতী, খাজা ৪
কুতবুদ্দীন মুনাওয়ার ২৬, ৭৫, ১২০ ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৬৪
কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ ৬৫, ৬৬, ৬৭
কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী, শায়খুল ইসলাম ১৫৬
কুতুবুদ্দীন, শায়খ ২০১

খ

খসরু খান ৬৬, ৬৭
খলীল আহমাদ সাহারানপূরী ২৮
খলীল, শায়খ ১৭৯, ১৮৮
খলীলুদ্দীন, শায়খ ১৪৬, ১৮৯ ১৯৩
(হযরত) খলীলুল্লাহ (আ:) ১৪৫
খাওয়াজগী দেহলভী মাওলানা ১:৯,
খাজা আহমাদ ১৯৩
খাজগী ১৯৩
খানুস ইবন সাইদ কিরমানী ১০০
খালীক আহমদ নিজামী, অধ্যাপক ২৮, ১২১ ১৩৪, ১৩৮
খিযির (আ:) ২২২, ২৩১, ২৩২,
খিযির খান, যুবরাজ ৬২, ৬৫

গ

গায্যালী, ইমাম ৮৮
গাযরুনী, 'আল্লামা ১৪০
গিয়াছুদ্দীন তুগলক, সুলতান ৬৭, ৭১, ১০০, ১৬৪
গিয়াছুদ্দীন বুলবন, সুলতান ২০, ২১, ৩৬, ৫৪, ৬১, ১৪৭, ১৯৩
গিয়াছুদ্দীন মনসূর শিরাজী, মীর ১৪০

গুলাম 'আলী আযাদ, মাওলানা ৯
গুলাম হুসেন সেলিম ১৩৪,
গৌতমবুদ্ধ ১৬২

চ

চেঙ্গীয খান ২, ১২৭, ১২৮

জ

জমীরুদ্দীন আহমাদ, সায়্যিদ ১৬৪
জয়চন্দ্র, রাজা ৭
জলীলুদ্দীন, শায়খ ১৪৬, ১৫১, ১৫২ ১৮২, ১৯০
জহীরুদ্দীন, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯
জালালুদ্দীন মক্কী ১৫৫
জামালুল আওলিয়া শিবলী লোদী ১৪০
জামী, মাওলানা—৫
জালালুদ্দীন, শায়খ, খতীবে হাঁসী ১৭, ২৬, ৪৭, ১২৫
জালালুদ্দীন তাবরিযী ৩৪
জালালুদ্দীন আলুয়ালজী ৬৭, ৬৮
জালালুদ্দীন, মাওলানা ৬৯, ১১৯, ১২০
জালালুদ্দীন খিলজী ৬১, ৬২
জালালুদ্দীন, হাফিজ, মাওলানা ১৯৩
জালালুদ্দীন রুমী ১৫৯
জালালুদ্দীন হুসায়ন বোখারী (মখদুম জাহানিয়া জাহাঁগাশত)
জি, বি, স্ট্রেঞ্জ ৬
জুনায়দ বাগদাদী, হযরত শায়খ ১১৭ ২২৪, ২৩৭

ত

তকীউদ্দীন, মাওলানা ১৮৩, ১৯৩
তাজ ফকীহ, মাওলানা মুহাম্মাদ ১৪৫
তাজুদ্দীন, ইমাম ১৯৩
তাজুদ্দীন দাওরী ১২০
তাতার খান, আমীর কবীর ১৬০
তৈয়ব বেনারসী, শায়খ ১২৩
তোহরা—১৯২

দ

দলীলদেব, ডোগর রাজা ৬
দরবেশ বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম ১২৩
দৌলত মুনায়রী, মাখদুম শাহ ২৩৯

ন

নওশাই তওহীদ ১৯২
নাজমুদ্দীন কুবরা ১৫৪, ১৫৫, ২৫৬, ১৬৯
নাজমুদ্দীন রাযী ১৫৫
নাজমুদ্দীন শাইর ১৯৩
নাজমুদ্দীন সুগরা ১২, ১৫৮
নাজীবুদ্দীন ফেরদৌসী ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৯২, ১৯৩
নাজীবুদ্দীন মুতাওয়াক্কিল, খাজা শায়খ ৮৩
নাজীরুদ্দীন, শায়খ ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪
নাসিরুদ্দীন আবু য়ুসুফ, খাজা ৪
নাসিরুদ্দীন যৌনপুরী ১৮৪, ১৯৩
নাসীরুদ্দীন, মাওলানা ২৯১

নাসীরুদ্দীন মাহমুদ, চেরাগে দিল্লী, হযরত শায়খ ২৯, ৩০, ৫৬, ৭৫, ৮১, ৮৬, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৮, ১৩১, ১৩৯, ১৬৪
নাসীরুদ্দীন মাহমুদ, সুলতান ২০, ১৩৭
নাসরুদ্দীন নাসরুল্লাহ, খাজা ২৫
নিজামুদ্দীন আওরঙ্গাবাদী ১৩৯
নিজামুদ্দীন আওলিয়া, হযরত শায়খ, খাজা ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১১০ ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২২, ১২৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৯৩
নিজামুদ্দীন ইয়ামনী (নিজাম হাজী গরীবুল ইয়ামনী) ১১২
নিজামুদ্দীন বোহী, মাওলানা ১৪৫
নিজামুদ্দীন, খাজা ২৫, ৪৪, ১৮২
নিজামুদ্দীন, খানজাদা মখদুম ১৯৩
নিজামুদ্দীন দর্দনহিসারী ১৯৩
নিজামুদ্দীন, মাওলানা ১৬৩, ১৬৪, ১৮৮, ২০১
নিজামুদ্দীন মালিক ১৮৬
নিজামুদ্দীন মুজিরবারী ১২৫
নিজামুদ্দীন মোল্লা ১৪০
নিজামুদ্দীন সিরাজী ১২১
নিয়ায আহমাদ বেরেলভী, শাহ ১২১
নুর কুতুবুল আলম পাণ্ডবী, হযরত ১২২
নূর তুর্ক ১৮
নুরুদ্দীন কাযী ১৮৫, ১৯০
নুরুদ্দীন (নুর কুতুবে আলম) ১২২, ১৩৪
নুরুদ্দীন মুবারাক ২৯
নুরুদ্দীন হাসি, সাহেবযাদা ১২৫
নূর মুহাম্মাদ মাহরভী, খাজা ১২১
নূহ (আঃ) ২০৩, ২০৬
নে'মত আলী খান ১৯৭

প

পীর মুহাম্মাদ লাখনবী ১২৩, ১৪০
পীর মুহাম্মাদ সলোনী ১২৩

ফ

ফখরুদ্দীন মরোযী, মাওলানা ১২০
ফখরুদ্দীন মিরাভী ১২১
ফখরুদ্দীন, মাওলানা ৬৮, ৬৯, ১৯১
ফখরুদ্দীন যরাবী, মওলানা ৭৪, ১০২, ১২০, ১২৮, ১২৯, ১৬৪
ফতুহ (বাবুর্চী) ১৮৭

ফযলুল্লাহ, মাওলানা ১৮৭, ১৯৩
ফরীদুদ্দীন 'আত্তার ১৫৫,১৫৯,১১২
ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর, হযরত শায়খ ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪১, ৫২, ৫৩, ৭৯, ৯৯, ১১০, ১১৫, ১৩৬, ১৩৯, ১৮৯
ফরীদুল হক ওয়াদ্দীন ১১২
ফসীহুদ্দীন, মওলানা ৮০, ১২০
ফাতিমা (রাঃ) ২৩২
ফাতিমা, বিবি ২৫
ফাযিল, কাযী ১৯৬
ফিরোজ তুগলক, সুলতান ১২০, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৬০, ১৬৫, ১৭৪, ১৭৮, ২০১
ফুযায়ল বিন 'আয়ায ২০২
ফেরাউন ১৩৬

ব

বদরুদ্দীন ইসহাক ১৯, ২৬, ৪৩, ৯৭
বদরুদ্দীন জাফরাবাদী ১৯৩
বদরুদ্দীন সমরকন্দী ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮
বদরুদ্দীন সুলায়মান ২৫
বায়েযীদ বিস্তামী ২৩৩, ১১৭
বাকির ১৯২
বাল'আম বাউর ২০২, ২০৭
বাহাউদ্দীন আদহামী ১২০
বাহাউদ্দীন, মাওলানা ১৫৫
বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, হযরত শায়খ ২১, ২২, ৩৫, ৬৯, ৭৮, ১৫৮
বাহাউল হক মুলতানী ১৩৬
বীর আরয ৫০
বূ'আলী শরফুদ্দীন কলন্দর ১৫২
বুরহানুদ্দীন গরীব, মাওলানা ১২০
বুরহানুদ্দীন গরীব, শায়খ ১২২, ১৩১, ১৩২
বুরহানুদ্দীন বাকী, মাওলানা ৩৬
বুরহানুদ্দীন আল-মুরগিয়ানানী, 'আল্লামা ৩৮
ব্রহ্মা — ৭
বোগরা খান— ৫৩

ম

মরইয়াম (আঃ) ২৩২
মসনদে 'আলী খান, মুহাম্মাদ ১৩১
মুহীউদ্দীন কাশানী, কাযী ৬৮, ৭০, ১২০
মাওলানা মুহাম্মাদ ২৮, ২৯
মাখদুমুল বিহারী (শায়খ মুনায়রী) ১৪৫, ২১২, ২৩৯
মাজেদুল মুলক ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৪
মানাজির আহসান গিলানী, মাওলানা সায়্যিদ ৪৫, ৪৮, ৫৯, ৯৬
মাযদুদ্দীন বাগদাদী ১৫৫
মালিক (ফেরেশ্তা) ২১৮
মালিক কারাবেগ ৬৪
মালিক খিযির ২০১

মালিক তুগার ১১১
মালিক তুগলক, মালিক গাযী ২
মালিক নায়েব (মালিক কাফুরী) ৬৩
মাস'উদ (হযরত শায়খ ফরীদ) ১৬
মাসতুরা বিবি ২৫
মাহমুদ গযনবী, সুলতান ৩, ৫
মাহবুবে ইলাহী, হযরত ১২২
মাহমুদ সিঙ্গলী ২০১
মাহমুদ সূফী, মাওলানা ১৮৭
মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, শায়খুল হিন্দ, হযরত মাওলানা ২৮
মুইয্যুদ্দীন কায়কোবাদ ৫৩, ৬১
মুইয্যুদ্দীন, খাজা ১৮৭
মুইয্যুদ্দীন, শায়খ ১৯৩
মু'ঈনুদ্দীন চিশতী, হযরত খাজা ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৩, ৬০, ১৩৫, ১৫৮
মু'ঈন, খাজা ১৮৪,
মু'ঈনুদ্দীন কারজুবী, হযরত শাহ ১২৩
মুওয়াইদুদ্দীন আনসারী ১২১
মুওয়াইদুদ্দীন কারভী ১২০
মুওয়াইদুদ্দীন, খাজা — ১২৪
মুখলেসুল মুলক, সুলতান ১২৫
মুগিছুদ্দীন (কাযী) বিয়ানুবী ৬৪, ১২৩
মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী ১০৩, ১৫৬, ১৬৭, ১৯৫, ১৯৭, ২২১
মুজাদ্দিদ গেসূদরায ১০৯, ১২১
মুজাফফর, শায়খ—২০০
মুজাফফর বলখী, মাওলানা ১৮৪, ১৯৩, ২৩৯
মুজীবুল্লাহ কাদিরী ফুলওয়ারী, হযরত শাহ, মুহাম্মাদ ১২৩
মুনাওয়ার ১৮৮, ১৮৯
মুস্তাজিব, কাযী
মুবারক গোপামভী ১২০
মুবারক মুহাম্মাদ কিরমানী, সায়্যিদ
মুসা, খাজা ৯৭
মূসা (আঃ) হযরত ২১৫, ২৩১, ২৪২
মুহাম্মাদ (সঃ) ১৭৯, ১৮৩, ১৯০, ১৯১, ২০৩, ২৩৮
মুহাম্মাদ (নিজামুদ্দীন আওলিয়া)—৩৩
মুহাম্মাদ ইমাম, খাজা — ২৭, ৯৭
মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন 'আলী আল-বাদায়ুনী আল-বোখারী ৭৪, ৭৫
মুহাম্মাদ কাসিম ৭১
মুহাম্মাদ গেসূদরায ৫২
মুহাম্মাদ জাফরআবাদী, শায়খ ২০১
মুহাম্মাদ জারুল্লাহ্ যামাখশারী, 'আল্লামা ৯৯
মুহাম্মাদ তাহির পাটনী, 'আল্লামা, ১০০
মুহাম্মাদ তিরমিযী, শায়খ কালপভী ১৪০
মুহাম্মাদ তুগলক, সুলতান ২৫, ৭১, ৭৭, ১২৫, ১২৭, ১৩১, ১৬৪, ১৭৪
মুহাম্মাদ বিন কাসিম, ছাকাফী ৩
মুহাম্মাদ মূসা — ২৭
মুহাম্মাদ মীনা লাখনবী, হযরত শায়খ ১২৩
মুহাম্মাদ শফী, মওলবী ৩৩

মুহাম্মাদ শাহ বাহমণি ১৩১, ১৩৩
মুহাম্মাদ ছুসায়ন সুফী ১৮০
মুহিববুল্লাহ ইসলামাবাদী ২৮
মিনহাজুদ্দীন 'উছমানী, কাযী—৬
মিনহাজুদ্দীন তিরমিযী, মাওলানা ১৭
মিনহাজুদ্দীন দর্দনহিসারী ১৯৩
মীনা কাযী ১৮০

য

যয়নুদ্দীন, শায়খ ১২২, ১৩১, ১৩৪ ১৯৩
যাকারিয়া (আঃ) ২০৩
যাকারিয়া গরীব ১৯৩
যাকীউদ্দীন, শায়খ ১৫০, ১৫১, ১৯২, ১৯৩
যয়েন বদর 'আরাবী ১৬৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮১ ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯৩, ১৯৯
যাকারিয়া কানদেহলভী, শায়খুল হাদীছ, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ২৮
যাহিদ, কাযী ১৬৩, ১৮৯, ২০১
যিয়াউদ্দীন. খাজা, আবুন্নাজীব 'আবদুল কাহির সুহরাওয়ার্দী ১৫৪
যিয়াউদ্দীন বার্ণী ২, ৩৬, ৬৩, ৬৪, ৭০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১২০, ২২৭
যিয়াউদ্দীন, মাওলানা ২০১
যিয়াউদ্দীন রুমী ৬৬
যুবায়র বিন আবদুল মুত্তালিব ১৪৫

র

রফীউদ্দীন, খাজা ৮৭, ৯৭
রফীউদ্দীন, মাওলানা ১৯৩
রশীদ আহমদ গঙ্গুহী, হযরত মাওলানা ২৮
রশীদ জৌনপুরী, 'আল্লামা মুহাম্মাদ ১২৩, ১৪০
রাজা গনেশ ১৩৪
রাবিয়া বসরী ১০৬
রাযীউদ্দীন আলীলানা, শায়খ ১৫৫
রায় পাথুরা (পৃথ্বিরাজ) ৬,৭,৮
রাসূল মকবুল (সঃ) ৭৪
রাসূল করীম, নবী করীম ৮৪, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৯, ২৯২
রাসূলুল্লাহ (সঃ) ৫৯, ৯৮, ১১১, ১১৫, ২২৫
রুকন উদ্দীন, আবুল ফাত্হ ২২
রুকনুদ্দীন চিগর ৯৯
রুকুনুদ্দীন নুবায়রা, শায়খুল ইসলাম ৭৮, ২১৪
রুক্নুদ্দীন ফেরদৌসী ১৫৬, ১৫৭ ১৫৮, ১৫৯
রুক্নুদ্দীন ফিরূয শাহ, সুলতান ৩৩
রুক্নুদ্দীন, হাজী ১৮৭, ১৯৩
রুমী, মাওলানা ৯১, ২১২
রুস্তম ২১৯
রুস্তম, শায়খ ১৯৩
রিদওয়ান (ফেরেশ্তা) ২১৮

ল

লুতফ উদ্দীন ১৯৩
লুতফুল্লাহ কুদী, মাওলানা ১৪০

শ

শরফুদ্দীন (শায়খ মুনায়রী) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৯, ১৭২, ১৭৮, ১৮১, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৯, ২০১, ২০৯, ২১৩, ২২১, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৩৮
শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯
শরফুদ্দীন, কাযী ১২০, ১৯৩
শরফুদ্দীন, খাজা ৮৬
শরফুদ্দীন মাহমুদ ইবনে 'আবদুল্লাহ আল-মাযবেকানী ১৫৫
শরীফা বিবি ২৫
শরীফ জিন্দানীর, হাজী ৪
শাদী গোলাবী ৫১
শামসুদ্দীন আলতামাশ ১৪৭, ১৫৬
শামসুদ্দীন ইয়াহইয়া ১২০, ১২৮, ১৩৯, ১৭৪
শামসুদ্দীন ওয়ামেগানী, মাওলানা ৭৭
শামসুদ্দীন, কাযী ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৯০, ১৯৯, ২০১, ২৩১, ২৩৪
শামসুদ্দীন খাওয়ারিযমী ১৯৩,
শামসুদ্দীন খাওয়াহিরযাদা ১২১,
শামসুদ্দীন খারীয, মাওলানা ৩৬, ৯৯
শামসুদ্দীন পানিপথী, হযরত শায়খ ২৭
শামসুদ্দীন শারাবদার ৫১
শাহ্ আলম গুজরাটি ১২৩
শাহবীখ ১৯২
শিহাবুদ্দীন ৪৪
শিহাবুদ্দীন, আমীর
শিহাবুদ্দীন 'আলভী তুসী ১৯২
শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে 'উমর দৌলতাবাদী, শায়খ ১৩৯
শিহাবুদ্দীন, কাযী ১৩৯
শিহাবুদ্দীন জগজোত, শায়খ ১৪৬
শিহাবুদ্দীন নাগোরী ১৮৪, ১৯৩
শিহাবুদ্দীন মুলতানী, মাওলানা ১৮২ ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০
শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘূরী, সুলতান ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৩৩, ১৪৫, ১৪৬
শিহাবুদ্দীন, শায়খ ২৫
শিহাবুদ্দীন, সায়্যিদ ১৯৩
শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দী ৪৩, ১৪৬, ১৫৪
শু'আয়ব, কাযী ১৬
শু'আয়ব, শায়খ ১৯৩
শু'আয়ব ফেরদৌসী, ১৪৮, ২৩৯
শেরশাহ — ১৪৮

স

সওদাগর, শায়খ মুবারক ১৯৩
সদরুদ্দীন, কাযী ১৯৩
সদরুদ্দীন, শায়খ ৫১
সফীউদ্দীন সফীপুরী (শায়খ 'আবদুস সামাদ) ১২৩
সরহিন্দা—১৮
সা'দ কাগজী-৫১
সা'দুদ্দীন কুদওয়াই খায়রাবাদী ১২৩

সা'দুদ্দীন হামুবিয়া ১৫৫
সানাঈ, হাকিম ২১২
সা'দী, শায়খ ৯৫
সাবাহুদ্দীন রহমান, সায়্যিদ ১১৪
সায়ফুদ্দীন বাখরযী ১৫৫, ১৫৬
সায়্যিদ আহমাদ, স্যার ১০, ৫৪
সালার, খাজা ১২১
সিরাজ 'আফীফ ১২১
সিরাজুদ্দীন আখি-১০২, ১২২, ১৩৯
সুলায়মান তৌনসভী ১২১
সুলায়মান, শায়খ ১৯৩, ২০১
সোমেশ্বর—৬

হ

হান্টার, ডক্টর ১৬২
হাবীবুদ্দীন, শায়খ ১৪৬
হামীদুদ্দীন, খাজা ১৯৩
হামীদুদ্দীন নাগোরী, কাযী ১৭, ৬৮, ৯১, ১১৭
হামীদুদ্দীন, শায়খ ১৭৫
হাসান সার বুরহানা ১২৫, ১২৬
হাসান ইবন মুহাম্মাদ আসসাগানী, 'আল্লামা ৩৮, ৯৯
হাসান বাহর্দী কাওয়াল ৯৪, ৯৫
হ্যামিলটন, ডঃ বুকানিন ১৬২
হুযুর আকরাম (সঃ) ১০৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮, ২৩৯
হুমায়ুন, শাহানশাহ ৫৪
হুসায়ন আহমাদ মাদানী, হযরত মাওলানা ২৮
হুসায়ন, ইমাম ৩৩, ১৪৬
হুসায়ন কিরমানী, সায়্যিদ ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৮
হুসসামুদ্দীন ফারজান ৬৭, ৬৮
হুসসামুদ্দীন, মালিক ১৮৮
হুসায়ন মু'ঈযয শামস বলখী (নওশা তওহীদ) ১৬৬, ১৯২, ১৯৬
হুসসামুদ্দীন মুলতানী ১২০
হুসসামুদ্দীন হয়বতখানী ১৯৩
হুসসামুদ্দীন হুসসামুল হক মানিকপুরী ১২২, ১২৩
হিউয়েন সাঙ ১৬২
হেলাল ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০

স্থান

অ

অযোধ্যা ১১৯, ১২২, ১২৪, ১৮৩

আ

আউচ ২০
আওশ ১১, (মাউরাউন্নাহার)
আজমীর ৬, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৩৬
আজুদহন ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ৩৫, ৪০, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫৩
আদন ২৩৯,
আফগানিস্তান ৫
আম্বা-৫৩
আল-খালীল (শাম) ১৪৫
আহমদাবাদ ১২২, ১৩৮
আঙ্গনী ২০১

ই

ইরাক ২
ইরান ২, ৪, ৫, ৩৩, ১৪১

উ

উত্তর প্রদেশ ২৩৯

ক

কর্ডোভা ২
কণৌজ ৭
ক'বা শরীফ ১৭৬, ২০৫
কাবুল ১৭
কাপুটিকা (পাহাড়) ১৬২
কাশগড় ১৪৬
কাশ্মীর ১৫৫, ১৫৬
কাসুর ১৭
কাহীনওয়াল, ১৭, ১৮
কিলোখড়ি ১১, ৫৪, ৫৫
কুজভীন ১

খ

খাওয়ারিযম ১, ১৫৪, ১৫৫
খুরাসান ৫, ৬, ৩৩, ১২৭

গ

গযনী ৬, ১৪৬
গিয়াছপুর ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৫, ৮১, ১১৫, ১৩৭
গুলবাগ ১২১
গুলবর্গা ১২২, ১৩৩, ১৩৮, ১৪০

জ

জর্দান ১৪৫
জরনজ ৬

জ

জামে মীরি (মসজিদ) ৬৫
জাঠনী ১৪৬
জেরাহ ৬
জুনযান ১
জৌনপুর ১২৩

চ

চৌসা ১৯৯, ২০০

ত

তরাইন (তেলোওী) ৭
তুর্কিস্থান ২, ১২৭, ১৪১
তুরস্ক ৬৯

থ

থানেশ্বর ৭

দ

দাক্ষিণাত্য ১৩১, ১৩৩, ১৫৬
দেওবন্দ, দারুল 'উলুম ২৮
দেবগীর (দৌলতাবাদ) ১, ১২২, ১৩৭, ১৩২
দিল্লী ২ ৬, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ ৫১, ৫৩, ৬৪, ৭১, ৮৯, ১০২, ১১৩, ১২১, ১২২, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১ ১৫২, ১৫৬, ১৬৪, ১৭৪, ১৯১

ন

নিশাপুর ১

প

পাকপত্তন ১৮, ২৫
পাকিস্তান ১৮
পাটনা ১৪৬, ২২৯
পাঞ্জাব ১৩৬, ২০০
পাণ্ডুয়া ১০২, ১২২, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০
পূর্ব বাংলা ১০২, ১২২, ১৩৪, ১৪৬, ১৯১
পূর্ববঙ্গ ১৪৮
পুশকর ৭

ফ

ফারগানা ১১
ফুলওয়ারী শরীফ ১২৩

ব

বদায়ূন ৩৩, ৩৫, ৫০
ব্রহ্মপুত্র ১৪৮
বংশী ১২৫
বাগদাদ ১, ২, ১১, ৫৯, ১৪০
বায়তুল মুকাদ্দাস ১৭৬, ২০৫
বিরঙ্গীল ৬৩, ৬৪
বিহার ১১২, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৩ ১৬৪, ১৬৫, ১৯১, ১৯২ ২২৯
বীরজুন ১৬৪
বুখারা ১, ৩৩
বুরখানপুর ১২২
বেহয়া ১৬২

ভ

ভাতুড়িয়া ১১৪
ভারতবর্ষ ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৮, ৪৮, ৫০, ৫১, ৬০, ৬১, ৭৮, ৮৯, ১১৩, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৯৭, ২০০, ২২৯

ম

মতৌহা ২৩৯
মগধ ১৬২
মন্টোগোমারী ১৮
মঙ্কপুল ৫০
মহীশূর ২৩৯
মাখদুম কুণ্ড (ঝরণা) ১৬৩
মানসসরোবর ৭
মানিকপুর ১২২, ১৪০, ১৫৬
মণ্ডো ১২২,
মার্ভ ১
মারগটওয়াড়া
মালোয়া ১২৩
মিশর ভাটকল ২৩৯
মুনায়র ১৪৫. ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৬২, ১৯২, ২৩৪
মুলতান ৩, ১৭, ১৮, ২০
মুঙ্গের ২৩৯
মেওয়াট ১৩৭

য

যয়েনাবাদ ১২২
যাহিদান ৬

য়

য়ামান ২

র

রাজগীর ১৬২, ১৬৩, ১৬৫
রাজশাহী ১৩৪
রোহিলাখণ্ড ৩৩
রেয ১

ল

লাখনৌতি ১০২, ১২২
লাহোর ৩৩, ২০০

শ

শাম ৬৯, ১৪৫,
শাহ আবাদ (আরা) ১৬২, ১৯৯

শ

শেখপুরা ২৩৯

স

সঞ্জয ৫, ৬
সমরকন্দ ১
সফিপুর ১২২
সলোন ১২২, ১৪০
সাহারানপুর, মাজাহিরুল 'উলুম ২৮
সিজিস্তান ৫, ৬
সিরাজ ২
সিন্ধু ৩
সিরাজ বাককাল ৫১
সিস্তান ৬
সোনার গাঁও ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০
সোমনাথ ৫

হ

হামদান ১
হাঁসি ১৭, ১৮, ১২৫, ১২৬, ১২৭
হিন্দুস্তান ১৪০
হিলমন্দ ৬
হিসার আন্দরপতে ৮১

গ্রন্থ

আ

আইন-ই আকবরী ১০
'আওয়ারিফ—১১৭
'আওয়ারিফুল মা'আরিফ ৩৪, ১৫৪
আকাইদে শরফী ১৯৪
আখবারুল আখয়ার ২১, ২৬
আখয়ারুল আখবার ১৩
আছারুসসানাদীদ ৫৪
আছছাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিলহিন্দ
আজওয়াবাহ ১৯৪
আনিসুল গুরাবা ১২২
আল-মুদহিশ ১৯৬
আল-মুনকিয মিনাদ্দালাল ২৮৮
আহসানুত্তাকাসীম—৬

ই

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ৩৩
ইযালাতুল খিফা ১৯৭
ইরশাদুত্তালিবীন ১৯৪
ইশারাতে মুখখুল মাআলী ১৯৪

ও

ওফাতনামা ১৭৯, ১৮০, ১৯১

ক

কানযুল মা আনী ১৯৪
কাশফুল মাহজুব ১১৭
কাশাশাফ — ৯৯
কুওয়াতুল কুলূব ১১৭
কুরআনুল করীম ১৪৭, ১৭২

খ

খাওয়ানপুর নে'মত ১৪৮, ১৪৯, ১৮৪, ১৯৪
খানসায়ে নিজামী ১০০
খাবীনাতুল আসফিয়া ১০, ২৫, ১৫৪, ১৫৯
খায়রুল মাজালিস ২৯, ৩৪, ৫৬, ৬৭, ১০৭

গ

গঞ্জেলাইয়াখফা ১৭৫
গঞ্জেলাইয়াফনী ১৯৪

জ

জাওয়ামিউল কালাম ৫২, ১০৪

ত

তাবাকাতে নাসিরী, ৬, ৭
তাবসিরা ১৫৫
তাযকিরা ১৪৭
তাযকিরাতুর রাশীদ ১২৩
তাযকিরাতুল 'আশিকীন ২৫
তারীখ-ই-ফিরিশ্তা ৭, ১২, ৭১, ১৩০, ১৩১
তারীখে বাঙ্গালা ১৩৪
তারীখে মাশায়িখে চিশত ২৯, ১২১, ১৩৪
তারীখ-ই-ফিরোজশাহী ২, ৩, ৩৬, ৬৪, ১১১, ১১৪, ১১৭, ১২১, ১৩০, ১৩১
তুহ্ফায়ে ইছনা 'আশারিয়া ১৯৭
তুহফায়ে গারবী ১৯৪
Preaching of Islam ১৩৬ (দা'ওয়াতে ইসলাম)

ন

নাফাহাতুল উনস ৫
নুযহাতুল আসফিয়া ১৫৮
নুযহাতুল খাওয়াতির ২৬, ২৭, ৩৪, ১২২, ১৪৯, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৫, ১৯৪

ফ

ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া ১৮০
ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪৩, ৫০, ৫৩, ৫৮, ৮০ ৮২, ৮৫, ৮৯, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৭, ১৩৭
ফাওয়াইদে রুকনী ১৯৪
ফারহাঙ্গে ইবরাহীমী ১৪৫ (শরফনামা ইবরাহীমী ও শরফনামা আহমাদ মুনায়রী)

ব

বযমে সুফিয়া ২৪ ১১৪
বাহরুল মা'আনী ১৯৪
বুখারী ১০০, ১০১

ম

মকতুবাত ১৬৮, ১৭২, ১৭৫, ১৯৫, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২১২, ২১৩, ২২১, ২৩৪, ২৩৮
মকতুবাতে 'আয়নুল কুযাত ১১৭
মকতুবাত জওয়াবী ২০০
মকতূবাত ও মকতূবাত সাহ-সদী ৯৪, ১৯৯, ২০০
মাআছারুল কিরাম ৮৯
মাকাতীব কা মাজমূ'আ ১২২
মাকামাত হারীরী ৩৭
মানাকিবুল আসফিয়া ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১ ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৯৪, ২৩৯
মালফূজাত ১৯৪,
মাশারিকুল আনওয়ার ৩৭, ৩৮, ৯৯, ১০০
মাসাদির ১৪৭
মি'দানুল মা'আনী, ১৪৭, ১৬৭, ১৯৪
মিফতাহুল্লুগাত ১৪৭
মিরসাদুল 'ইবাদ ১১৭, ১৫৫
মিশকাত শরীফ ১০০
মিসবাহুল হিদায়াত ৯২
মু'জামুল বুলদান ১১
মু'নিসুল কুলুব ১৭৪
মুনিসুল ফুকারা ১২২
মু'নিসুল মুরীদীন ১৯৩
মুনতাখাবুত্তাওয়ারীখ ২, ৭
মুফাসসাল ৯৯
মুসলিম ১০০, ১০১

য

যাদে সফর ১৯৪

র

রাহাতুল কুলূব ১৭
রিয়াযুস সালাতীন ১৩৪
রিসালা কুশায়রী ১১৭
রিসালায়ে দর তলবে তালিবান ১৯৪
রিসালায়ে মাক্কীয়া ১৯৪,
রুকআত ১৯৭

ল

লাওয়ায়িহ ও লাওয়ামিহ ১১৭
লাতাইফে আশরাফী ১৯১, ১৯২
লাতাইফুল মা'আনী ১৯৪

শ

শরাহ আদাবুল মুরিদীন ১৯৪
শরাহ কাফিয়া (শরাহ হিন্দী)
শরাহ তা'আররুফ ১১৭

স

সাফারুল মুজাফফার ১৯৪
সাইদুল খাতির ১৯৬,
সিয়ারুল আওলিয়া ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৭০, ৭২, ৭৪,

৭৫, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৭ ১১০, ১১৩, ১১৮, ১১৯, ১২৭, ১২৯
সিয়ারুল আকতাব ১০, ৯১
সিয়ারুল 'আরিফীন ২৪, ৬, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৬, ১০২
সিরজুল মাজালিস ২৯, ৩৪, ৫৬
সিরাজে 'আফীফ ১৩০
সিহাহ সিত্তা ১০০
সীরতুাশ শারফ ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪

হ

হাসরতনামা ৭০, ১১৩,
হিন্দুস্তান মে মুসমানো কা-নিজামে তা'লীম ও তরবিয়ত ৪৫, ৫৯, ৬৬, ৬৯
হেদায়া-৯৯
ইহয়াউল 'উলুম ১১৭, ২২৪

জাতি-গোত্র-সম্প্রদায়

হিন্দু-৭
মুসলমান ৯
চৌহান ৬
তাতার ২, ১১, ১৫৫
মোগল ২, ৬৪, ১১৫
মেওয়াটি ১৩৮
কুরায়শ ১৪৫
হাশিমী (গোত্র) ১৪৪

মুদ্রা

সুলতানী ২৪
জিতল (চিতল) তংকা ১২৭

প্রতিষ্ঠান

দারুল মুসান্নিফীন ১১৪
খানকায়ে রশীদিয়া ১২৩
খানকায়ে মুজীবি ১৪৩
পাণ্ডুয়া খানকাহ ১৩৯
নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০
ইসলামী কুতুবখানা ২০০

তরীকা ও সিলসিলা

সুহরাওয়ার্দিয়া ৩, ২১, ১৪৬, ১৫৪
কাদিরিয়া ৩
নকশবন্দীয়া ৩
চিশতিয়া ৩, ৪, ৯, ১০, ১৫, ১৬, ২৩, ২৮, ২৯, ৬০, ৮৯, ৯৯, ৯৬, ১০২, ১২১, ১২৩, ১২৯, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪১
চিশতিয়া সিলসিলা ৪, ১৩৮, ১৫৭, ১৯১
সাবিরিয়া চিশতিয়া ২৮
চিশতিয়া নিজামিয়া ১০২, ১২২, ১২৩, ১৩৮
নিজামিয়া সিলসিলা ১২৩
শতত্তারিয়া 'ইশকিয়া ১৫৭, ১৫৮
ওয়াহদাতুশশহূদ (তওহীদে শহূদী) ২২১